

3/138

2/254

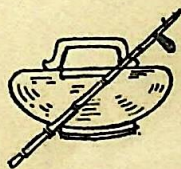
1.3

1/138

सुगम साधन-पन्था ।

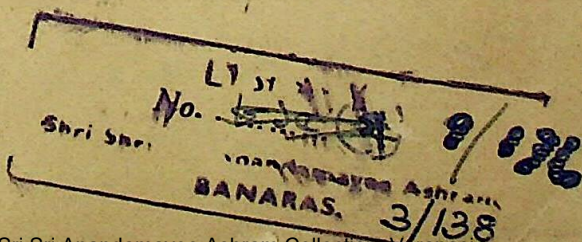
चतुर्थ खण्ड ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।



करे च दण्डः शोभित कमण्डलुः,
तं कर्णधारं श्रीगुरुमानतो हसि ।

दण्डि-स्वामी शिवानन्द सरस्वती ।



LIBRARY

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/138

Book should be returned by date (last) noted below
or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise
daily shall have to be paid.

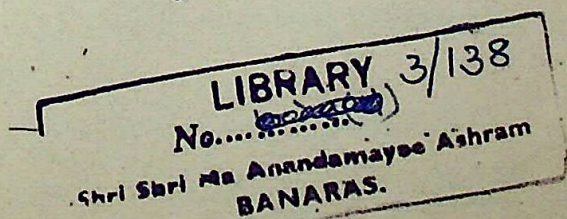
सूगम साधन-पत्र ।

चतुर्थ खण्ड ।

महाजनो येन गतः स पथाः ।

श्री१०८ परमहंस परिव्राजकाचार्य—
श्रीमन् दण्डि-स्वामी शिवानन्द सरस्वती ।
प्रणीत

मूल्य १७/- द्वि टाका ।



প্রকাশক—

শ্রীঅনিল কুমার মাইতি ।

শ্রীঅমল কুমার মাইতি ।

শ্রীনির্মল কুমার মাইতি ।

শ্রীঅনন্ত কুমার মাইতি ।

ছোটবাজার, মেদিনীপুর ।

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ।

প্রথম সংস্করণ ।

দি নিউ সুলভ প্রেস, মেদিনীপুর

হইতে মুদ্রিত ।

৮৭ শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ

গুহ্যরম্য

১৭।৮।৩৪

সুগম সাধন-পন্থা ।

পূজ্যপাদ শ্রী ১০৮ দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী বাবা তাঁর লিখিত সুগম সাধন-পন্থার চতুর্থ খণ্ডে প্রথম পরিচ্ছেদে নামাপরাধ ১০টির উল্লেখ করেছেন।

প্রথম হইতে একাদশ পরিচ্ছেদে বিস্তৃত ভাবে বহু শাস্ত্র প্রমাণসহ নামাপরাধের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায় না। দ্বাদশে ভব সাগরের বিবরণ, ত্রয়োদশে ভক্তের আকাঙ্ক্ষিত পরম পদ বৈকুণ্ঠধামের কথা বিস্তার পূর্বক বলিয়াছেন। চতুর্দশে—পরম পদে উপনীত মানবের পুনরাবৃত্তি কেন হয় না, শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা কথিত হইয়াছে। পঞ্চদশে নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ গমনের অধিকারী কে শাস্ত্র প্রমাণাদির দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন।

ষোড়শে—ভীম ভবার্ণব পার হইবার আশ্রয় কি :—এই পরিচ্ছেদে পূজ্যপাদ শাস্ত্র প্রমাণ দিয়াছেন—

জিহ্বাগ্রে বর্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষর দ্বয়ম্।

সংসার-সাগরং তীৰ্ণ্য সগচ্ছেদ বৈষ্ণবং পদম্ ॥

যাঁর জিহ্বাগ্রে “হরি” এই অক্ষর দুটি বর্তমান তিনি সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরমপদে গমন করেন।

ভব সাগর তরণের উপায় সর্বদা হরিনাম-কীর্তন। নিরন্তর হরিনাম কীর্তনে শরীরস্থ অণু পরমাণু শুদ্ধ হয়, কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হন, নাদ লাভ হয়। অনন্তর তিনি সহস্রারে পরম শিবে সম্মিলিতা হইয়া যান ; সাধক জীবনুদ্ভূত হন।

গুরোঃ কুপায় বিশেষভাবে গুরু কুপার বর্ণনা করিয়াছেন।

মোট কথা যাঁরা সংসার সাগর পার হইতে চান তাঁহাদের পক্ষে এই

LIBRARY
No. 3/138

“সুগম-সাধন-পন্থা” গ্রন্থ-রত্ন খানি মহাপোত। এখানি আশ্রয় করিলে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত জানিবার কিছু বাকি থাকিবে না এবং কি ভাবে হরিনামের দ্বারা মুক্তি-লাভ হয় তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবেন।

শাস্ত্র পাঠী সকলেই অবগত আছেন যে সমস্ত শ্রুতি পরাপর ব্রহ্ম ওঙ্কারকেই পরম-তত্ত্ব বলিয়াছেন। জপ, তপ, যজ্ঞ, সাধন-ভজন, তপস্যা সমস্তই ওঙ্কার লাভের জন্য। ওঙ্কার লাভ করিলেই মানুষ কৃতার্থ হয়। অ উ ম ওঙ্কারের তিনটি পাদ। তৃতীয় মকার পাদটী নাদময়। এই নাদ হইতে কি শব্দ-জগৎ, কি দৃশ্য-জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা বহু গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। পরম কাম্য ওঙ্কারও নাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে কথিত হইয়াছে,—সমাহিত প্রজাপতি ব্রহ্মার হৃদয়ে নাদ উৎপন্ন হন। নাদ হইতে ওঙ্কার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নাদই সাধক মাত্রের পরম ও চরম কাম্য। নির্জনে সংযত ভাবে মন্ত্র-জপাদি করত জাপক শেষে নাদ প্রাপ্ত হন। হঠযোগী প্রাণায়ামের দ্বারা নাড়ী শুদ্ধি হইলে নাদ প্রাপ্ত হন, সেই নাদই সম্বল হয়। লয়-যোগী যট্চক্রাদি ভাবনা করিতে করিতে গুরু কৃপায় কুণ্ডলিনী শক্তি যখন জাগরিতা হন তখন নাদ লাভ করেন। রাজ-যোগী গুরু উপদিষ্ট মন্ত্র বা ওঙ্কার জপ করিতে করিতে নাদ প্রাপ্ত হন। সেই নাদ শুনিতে শুনিতে মন ও বায়ু পরমাণ্বায় লীন হয়।

সকল সাধন পথে নাদই কাম্য। শাস্ত্র, পূর্বতন বৈষ্ণবমণ্ডলী ও শ্রীমদ্ভাগবত নামের মহিমা যথেষ্ট বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন কিন্তু নামের দ্বারা মানুষ কি ভাবে কৃতার্থ হয় তাহা বলেন নাই। তাহার কারণ সকলে সে পরম তত্ত্বের অধিকারী নহে। পূজাপাদ স্বামিজী মহারাজ “জপ করিতে করিতে শরীর শুদ্ধ হইলে নাদের আবির্ভাব হয়। তখন সাধক নাদ অবলম্বনে কৃতার্থ হন” এ রহস্য সুস্পষ্ট ভাবে ষোড়শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন।

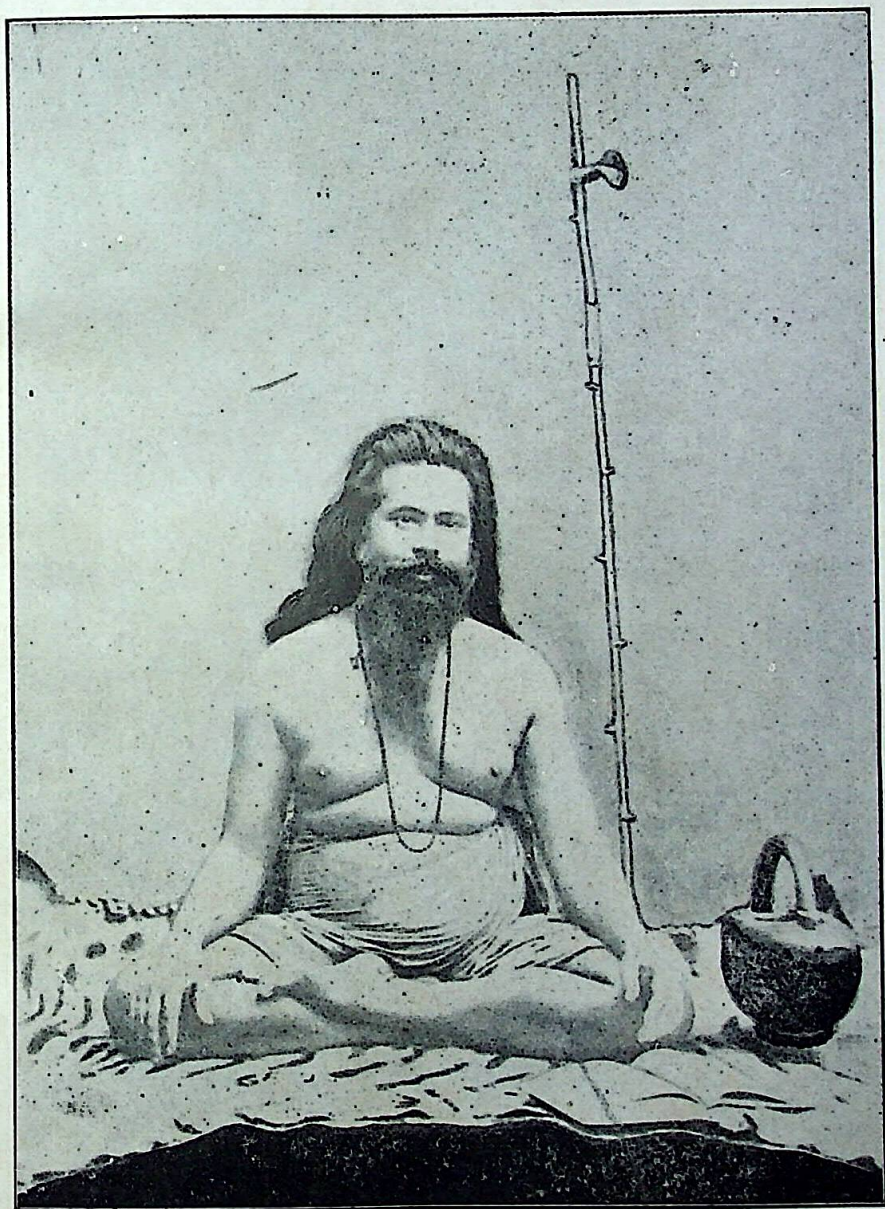
স্বামিজী মহারাজের এই চারিখণ্ড “সুগম সাধন-পন্থা” যেমন সাগরের উপমা সাগর, আকাশের উপমা আকাশ তদ্রূপ সুগম সাধন-পন্থার উপমা সুগম সাধন-পন্থা। এ মহাগ্রন্থ শান্তিকামী যে কেহ আশ্রয় করিবেন তিনি কৃতার্থ হইবেন সীতারামের এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। প্রণাম স্বামিজী মহারাজের পবিত্র চরণ কমলে।

শ্রীভগবদানন্দদাস
শ্রীসীতারামদাস ঠাকুরনাথ।

সূচী পত্র ।

প্রথম পরিচ্ছেদ	...	নামাপরাধ	...	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	...	সাধুনিদা	...	৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	...	হরি ও হরে ভেদজ্ঞান	...	২৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	...	গুরুর প্রতি অবজ্ঞা	...	৩৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	...	প্রতিশাস্ত্র নিন্দা	...	৫১
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	...	নামে অর্থবাদ-কল্পনা	...	৬০
সপ্তম পরিচ্ছেদ	...	নামের আবরণে পাপের আচরণ	...	৬২
অষ্টম পরিচ্ছেদ	...	ধর্ম-যাজনে ও নাম-সাধনে সমতা জ্ঞান	...	৮৪
নবম পরিচ্ছেদ	...	প্রমাদ	...	৮২
দশম পরিচ্ছেদ	...	নামে অপব্যবহার	...	১০২
একাদশ পরিচ্ছেদ	...	সংসারে রতি ও নাম মাহাত্ম্যে অরতি	...	১০২
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	...	ভব সাগর	...	১৫২
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	...	পরমপদ বৈকুণ্ঠধাম	...	১৫৬
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	...	পরমপদে উপনীত মানবের		
		পুনরাবৃতি হয় না কেন ?	...	১৭১
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	...	নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে কে উপনীত		
		হইতে পারে ?	...	১৯১
ষোড়শ পরিচ্ছেদ	...	ভীম-ভবার্ণব পার হইবার আশ্রয় কি?	...	১৯৭
গুরোঃকৃপা	...	...	...	২১৫

1. १०० वि०



শ্রী ১০৮ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য—
শ্রীমৎ দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী ।

৩৭ শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ ।

3/138

৪/১৭৬

নিবেদন ।

— • —

“বচোহমৃতৈর্ধস্য জনস্য সত্ত্বরং,

প্রয়াতি তাপত্রয়মেব সংক্ষয়ম্ ।

পরোপকারৈকপরায়ণং মুদা,

তং কর্ণধারং শ্রীগুরুমানতোহস্মি ॥”

পরম করুণাময় শ্রীভগবানের কৃপায় মদীয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব বিরচিত ‘সুগম সাধন-পন্থা’ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডটি বিশ্ববাসীর নিকট প্রকাশিত হইল। পূজ্যপাদ বাবার শ্রীমুখ হইতে তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে শুনিয়াছি যে,—“আমার লিখিত প্রত্যেকটি বাক্যই অনুভূতিলব্ধ এবং সত্য বলিয়া জানিবে।” এই অমৃতোপম গ্রন্থখানির প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া বিশিষ্ট সাধু, পণ্ডিত ও ভক্তমণ্ডলী তাঁহাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণী মস্তকস্পর্শিণী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রকন্যাগণ! আপনারা বর্তমান জড়বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে জ্ঞানগ্রহণ করিয়াও যদি নাস্তিকা-বুদ্ধি বিসর্জন পূর্বক এই গ্রন্থের উল্লিখিত উপায়ে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া সর্বদা অমৃতময় সুধাসিক্ত শ্রীভগবানের নাম-কীর্তনে নিরত হন; তবে, নামীর কৃপায় অচিরকাল মধ্যে অমৃতত্বের আনন্দ লাভে জীবন ধন্য ও জন্ম সার্থক জ্ঞান করিবেন।

শ্রীভগবানই প্রত্যক্ষরূপে শ্রীগুরুদেব এবং মহৎব্যক্তিতে সেই শ্রীগুরুদেবেরই বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্য শ্রীভগবানের কৃপা, শ্রীগুরুদেবের এবং মহৎব্যক্তির কৃপা—এক কথা। এখন সেই কৃপালাভের উপায় কি? এই প্রশ্নে পরমারাধ্য আত্মশক্তিস্বরূপিণি বিশ্বাতিহারিণি

পরম করুণাময়ী শ্রী ১০৮ যুক্তেশ্বরী মাতা আনন্দময়ী ঠাকুরাণীর যে ছইটি বাণী প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই এখানে উল্লিখিত হইল। শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে পরম পূজনীয়া শ্রীযুক্তা গুরুপ্রিয়া দেবী গত ইং ৩০।৩।৫৫ তারিখে একটি পত্র লিখিয়া জানান,—“মা বলিলেন,—ভগবানের কৃপা সব সময় বর্ষণ হচ্ছে। সেইটি বুঝবার জন্য নিজেকে উন্মুখ রাখ।” এবং গত ইং ২২।১।৫৬ তারিখে পরম প্রীতিভাজন শ্রীপরমানন্দ ভাইজী চন্দ্রলোক ‘শ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম’, নূতন দিল্লী হইতে লিখিয়াছেন,—“মা বলেন,—তিনি যাহা করেন সব মঙ্গলের জন্য। যখন যেমন যোগাযোগ হয়ে যায়। সর্বদা কেবল তাঁহার চরণ স্মরণ।”

চাই শুধু শরণাগতি ও দৃঢ় অধ্যবসায়। শাস্ত্রের কথা,—‘ন ঋতে শান্তস্য সন্ধ্যায় দেবা’ এবং ‘তথা পুরুষকারণে বিনা দৈবং ন সিক্তি।’ অপিচ,—‘তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধি-যোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে॥’ সর্বদা নাম কীর্তনরূপ সাধন অভ্যাস করিলে সাধুসঙ্গলাভ এবং তৎফলে শ্রীনামের উপর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বর্ধিত হইতে থাকে। এই শ্রীনামের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া পূজ্যপাদ বাবা শান্তসাগর মহন করিয়া সাধনার বিভিন্ন স্তরের অনুভূতিগুলির কথা গুরুগম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া কলিপাবন মহাজন বিরাগ-রসিক নাইমক-সম্বল প্রেমাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী বাবা ওঙ্কারেশ্বর হইতে ১৩৬১ সালে মোনী অবস্থায় যে মন্তব্যটি কৃপাপূর্বক লিখিয়া কিঙ্কর শ্রীগোবিন্দদাসজীর মারফত পাঠাইয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

“৮৭শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ। ওঙ্কার মঠ ২৭।৯।৬১। পূজ্যপাদ শ্রী ১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত ‘সুগম সাধন-পন্থা’ তিন খণ্ড পড়িলাম। সুন্দর গ্রন্থ, ভাব ভাষা চমৎকার। পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ সাধক ও পণ্ডিত ছিলেন। শাস্ত্রসম্মত যে পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—সংসার দীর্ঘপথ ভ্রমণে শান্ত-কান্ত যে কেহ এই পথ অবলম্বন করিবেন, তিনি অবশ্যই শান্তিলাভে সমর্থ হইবেন।

কলিযুগের পথ নাম কীর্তন সর্বশাস্ত্রই ঘোষণা করিয়াছেন, পূজ্যপাদ বহু শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পথত্রান্ত পথিক এই পন্থা অবলম্বন করিয়া কৃতার্থ হউন - এই প্রার্থনা।”

পরম ভাগবত শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম-এ, পি-এইচ-ডি, ডি-লিট, মহোদয় এই গ্রন্থের তিন খণ্ড পাঠ করিয়া কৃপা-পূর্বক লিখিয়া জানাইয়াছেন, “মনের আনন্দে আত্মোপাস্ত দেখিয়াছি। মনে হইল, জীবন ভরিয়া পড়িবার মত গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নামে দণ্ডি-স্বামী বিশেষণ দেখিয়া মনে হইয়াছিল গ্রন্থে জ্ঞানযোগ রাজযোগের কথাই বিশেষভাবে আছে। কিন্তু পরাভক্তির সাগর সঙ্গমে গ্রন্থের পরিণতি দেখিয়া বিস্ময়াগ্নিত হইয়াছি। গ্রন্থে “কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ং” সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছে। নাম ও নামীর অভিন্নতার তত্ত্ব অতি নিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মঙ্গলময় হরিনাম সঙ্কীর্ণনের কথা প্রাণের ভাষায় কথিত হইয়াছে। সাধন পথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় সমূহ সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে। কল্যাণময় কথা প্রসন্ন-গম্ভীর ভাষায় পরম চিত্তাকর্ষী হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বামিজী একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁহার কৃপায় বহু পথভ্রষ্ট নরনারী শান্তি-রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছে। গ্রন্থখানি তাঁহার সাধনলব্ধ পরম সম্পদ। পরাভক্তিমার্গে, শ্রীকৃষ্ণভজনরহস্যে গ্রন্থের অনুপ্রবেশ সত্যসত্যই চমৎকারী। জ্ঞানপথের পথিকদের ভক্তি সমুদ্রে অবগাহন দৃশ্য বড়ই জীবন-রসায়ন। তৃতীয় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদ “ক্রন্দনে আনন্দ” পাঠ করিলে পাষণ্ডের নমনও সিক্ত হইয়া উঠে। লেখার মধ্যে লেখককে জীবন্ত দেখা যায়। যাহারা সাধন পথের পথিক এই গ্রন্থ পাঠে তাঁহারা পরম উপকৃত ও কৃতকৃতার্থ হইবেন। সার্থকতপা স্বামিজীর করুণাশীর্ষে সাধন সরণি স্নগম হইয়া উঠিবে।”

শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে বৈষ্ণবশিরোমণি পূজ্যপাদ শ্রীল অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজ বাং ৩১.০৬.১ তারিখে একটি পত্রে লিখেন,—“আপনার প্রেরিত ‘স্নগম সাধন-পন্থা’ গ্রন্থখানি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।”

এই গ্রন্থখানি শ্রদ্ধার সহিত পঠন ও মনন করিলে সাধুসঙ্গ ও

শাস্ত্রপাঠের ফল সত্তরেই অনুভূত হইবে। এই বৃহৎকার্যবিশিষ্ট পুস্তক-
খানি প্রকাশের ভার শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক ও প্রিয় শিষ্য
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র মাইতি এম-এ, বি-এল মহাশয়ের প্রতি অর্পণ
করেন। বিশেষ অনুরাগ ও অধ্যবসায়ের সহিত প্রভাত দাদা তিন
খণ্ড পুস্তকের মুদ্রণ কার্যের সম্পাদনা করতঃ ভক্ত ও সাধুসমুল্লী
আশীর্বাদ ভাজন হইয়াছিলেন। পূজ্যপাদ বাবার দেহরক্ষার পর
ইং ১৯৪১ সালে শ্রীশ্রীশিবানন্দ সেবক-সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। প্রভাত দাদা
মৃত্যুর পূর্বদিন পর্য্যন্ত ঐ সঙ্ঘের সম্পাদকরূপে পূজ্যপাদের স্মৃতি রক্ষার্থ
শ্রীগুরুমন্দির ও প্রতিমূর্তি স্থাপন, নিয়মিত পূজা ও প্রতি পূর্ণিমায়
বিশেষ পূজা, হোম ও নাম কীর্তনাদির ব্যাপারে শ্রীযুক্ত শ্রীপতি দাদা
এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া
গিয়াছেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় বাদ্য-
যন্ত্রসহযোগে গুরুভাতাগণ সমভিব্যাহারে গুরুস্তোত্র ও নাম কীর্তনাদির
অনুষ্ঠান করিতেন। সংসারিক কর্তব্য সমূহ সম্পাদন করিবার পর
প্রভাত দাদাকে পূজ্যপাদ বাবার ধর্মপুস্তক সমূহ প্রকাশের কার্যে একা-
গ্রচিত্তে আত্মনিয়োগ করিতে দেখা যাইত। পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীঠাকুর
সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী বাবা মেদিনীপুরে আমাদের বাড়ীতে
গুভাগমন করিলে প্রভাত দাদা তাঁহার শ্রীচরণযুগলে প্রণত হইয়া
পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের ধর্মগ্রন্থগুলি যাহাতে সত্তর প্রকাশিত হয়
তজ্জগৎ আন্তরিক প্রার্থনা জানান। শ্রীশ্রীঠাকুর শুভাশীর্বাদ করতঃ
প্রভাত দাদাকে প্রেমালিঙ্গন দান করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভ
প্রসঙ্গে প্রভাত দাদা একদিন আমাদের বলেন,—“সাধুসঙ্গে যে কত
আনন্দ ও শান্তিলাভ হয় তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।
শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাস্পর্শ লাভ করিয়া আমি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের
স্নেহস্পর্শ অনুভব করিয়াছি।”

আলোচ্য চতুর্থ খণ্ডের মুদ্রণ কার্য আরম্ভ করিয়া গত ১৮৮৬৩২
তারিখে কলিকাতায় স্বীয় পুত্রের বাসায় একটি মাসিক অনুরাগে
যোগদান করিতে গিয়া প্রভাত দাদা হঠাৎ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন এবং

স্বীয় শয্যার উপরিভাগে তুলসী বৃক্ষ ও শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রতিমূর্তি রাখিয়া করতালি সহযোগে 'জয়গুরু' নাম কীর্তন করিতে করিতে সজ্জানে স্থলদেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণযুগলে মিলিত হন। প্রভাত দাদার ইহলোক ত্যাগের সংবাদ পাইয়া গোপালপুর, শ্রীমোপাল মঠ হইতে ২৫।৬।৬২ তারিখের একটি পত্রে পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীঠাকুর লিপেন,—“৬প্রভাত বাবার পরলোক গমনে মেদিনীপুরের ভক্তবৃন্দের যথেষ্ট ক্ষতি হ'ল। তাঁর স্বর্গীয় আত্মা শান্তিলাভ করুক ; —গুরুরূপায় তিনি ধন্য হয়েছেন।”

স্বর্গীয় প্রভাত দাদার সহিত পরম পূজাপাদ শ্রীগুরুজী মহারাজের প্রথম পরিচয়ের কাহিনী বড়ই চিত্তাকর্ষক। মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া যুবক প্রভাত দাদা তখন সবেমাত্র আলদাতে একালতি ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। ভবিষ্যত অনিশ্চিতের গর্ভে নিহিত। সহরে একজন বিশিষ্ট সাধু শুভাগমন করিয়াছেন শুনিয়া তিনি একদিন পূজাপাদের শ্রীচরণে গিয়া প্রণত হইলেন। প্রণাম করিয়া উঠিতেই পূজাপাদ করুণাপূর্ণ নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এখানে কি জন্ম আসিয়াছ ?” উত্তর হইল,—“সাধু দর্শন করিতে আসিয়াছি।” “সাধুকে প্রণাম করিলে কিছু দক্ষিণা দিতে হয় জান ?”—পূজাপাদের দৃষ্টি অর্থপূর্ণ। প্রভাত দাদা সপ্রতিভ ভাবে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত পুরিলেন দেখিয়া পরমারাধ্য বাবার আনন্দ-গৌরোবজ্জল স্মৃচাক বদনমণ্ডল সরস-মধুর হাস্যমণ্ডিত হইয়া উঠিল। তিনি আবেগ-মধুর আদর-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—“আমি অর্থ দক্ষিণা চাহি না। আমি যা চাই,—তা কি তুমি দিতে পারিবে ?” অতীব বিস্ময়ান্বিত হইয়া প্রভাত দাদা সম্মতি জ্ঞাপন করিলে পূজাপাদ বাবা দৃষ্টকণ্ঠে কহিলেন—“তোমার সাধন পথের বিষমরূপ এই যে কু-অভ্যাস আছে তাহা আমাকে প্রদান কর।” প্রভাত দাদা তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধ্যামী মহাপুরুষের শ্রীচরণযুগলে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইল। পূজাপাদ বাবার অমোঘ আশীর্বাদে তাঁহার হৃদয় বিমল জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হওয়ায় তিনি ইহলোকে

অভ্যুদয় ও পরলোকে নিঃশ্রেয়সোলাভে ধন্য হইয়াছেন।

ধর্মপ্রাণ প্রভাতদাদার স্নযোগ্য গিত্তভক্ত পুত্রগণ এই চতুর্থ খণ্ডটি প্রকাশের সমুদয় ব্যয়ভার সানন্দে বহন করিয়াছেন। এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের ধর্মগ্রন্থ সমূহের পুনর্মুদ্রণ ও প্রচার কার্যাদি চলিবে। মাদৃশ অবিদ্যাক্ষ মুঢ় ব্যক্তির ণাস্ত্রানভিজ্ঞতা হেতু ও নানা অনিবাধ্য কারণবশত এই গ্রন্থে যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি রহিয়া গেল তাহা সহৃদয় ভক্ত পাঠকবৃন্দ ক্ষমাকরতঃ ইহার আত্মোপাস্ত অবলোকনপূর্বক গুণগ্রহণ করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

নমস্তভ্যং ভগবতে বিশ্বক জ্ঞান মূর্তয়ে।

আত্মারামায় রামায় সীতারামায় বেধসে ॥

মহালয়া, বঙ্গাব্দ ১৩৬৯

শ্রীগুরু-মন্দির,

স্বামীশিবানন্দ রোড,

মোদিনীপুর।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত—

কিষ্কর শ্রীকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

3/138

১/১৭৬

জুগম সাধন-পন্থা ।

চতুর্থ খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

নামাপরাধ ।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, পূর্বে বলিয়াছেন যে,—‘অন্ধ-আতুর, অনাথ-নিরাশ্রয়, পাপী-তাপী দ্বা ও অন্ত্যজজাতি প্রভৃতি, যে কেহই ছউক না কেন, ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরির অমৃতময় সুধাসিক্ত কলিপাবন নামাশ্রয় হইলে, নামের প্রভাবে পাপ হইতে পরিত্রাণ পায় । কিন্তু আবার, সেই নামের অপরাধে নিশ্চয়ই অধঃপাতে যায় ।’ অতএব, সেই নামাপরাধ কি ?

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে,
যতঃ খ্যাতিং যাস্তুং কথমুপসহতে তদ্বিগরহাম্ ।
শিবস্ত্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং,
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥

পদ্মপুরাণ । স্বর্গ । ৪৮

নামাপরাধ অসংখ্য থাকিলেও, তন্মধ্যে দশটি প্রধান । যথা,—
প্রথম নামাপরাধ সাধুনিন্দা অর্থাৎ সাধুনিন্দা সুধাসিক্ত ভগবন্নাম কীর্তনের অন্তরায়-স্বরূপ ; কেন না, সজ্জন নিন্দাই পরম অপরাধ বিস্তার করে, যাহা দ্বারা নামের মহিমা খ্যাতিপ্রাপ্ত হয়, তাহার গর্হণ অর্থাৎ নিন্দা ভক্ত-বৎসল ভগবান্ সাহিবেন কিরূপে ?—দ্বিতীয় নামাপরাধ, এই জীবলোকে যে ব্যক্তি সর্বনিয়ন্তা পরম পিতা পরম-কারুণিক পরমেশ্বর ভূতভাবন মহেশ্বর এবং জগন্নিয়ন্তা পরমপিতা পরম-কারুণিক বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ বিরাট পুরুষ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর

২

সুগম সাধন-পন্থা ।

গুণ-নামাদি ভিন্ন বুদ্ধিতে দর্শন করে অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু হইতে ভূতভাবন মহেশ্বরের নাম, গুণ ও লীলাদি পৃথক্ বলিয়া মনে করে অথবা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নামাদি হইতে ভগবান্ শিব-নামাদি ভিন্ন বলিয়া মনে করে, তাহাও নাম কীর্তনের অহিতকর অর্থাৎ অন্তরায়-স্বরূপ । অপিচ,—

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং,
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্ ।
নান্নো বলাদ্ যশ্চ হি পাপবুদ্ধি—
র্ন ভিद्यতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥

পদ্মপুরাণ । স্বর্গ । ৪৮

তৃতীয় নামাপরাধ, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা অর্থাৎ ভবকর্ণধার অবতার শ্রীগুরুকে অবজ্ঞা করাও নাম কীর্তনের অহিতকর অর্থাৎ অন্তরায়-স্বরূপ । চতুর্থ নামাপরাধ, শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা অর্থাৎ বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা করা, ইহাও নাম কীর্তনের অহিতকর অর্থাৎ অন্তরায়-স্বরূপ । পঞ্চম নামাপরাধ, সঞ্জীবনী-শক্তি-সম্পন্ন সর্বপাপ-নাশন অমৃতময় সুধাসিক্ত হরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ নাম-মাহাত্ম্য অর্থবাদ মনে করা, ইহাও নাম-কীর্তনের অহিতকর অর্থাৎ অন্তরায়-স্বরূপ । ষষ্ঠ নামাপরাধ, নামের ভরসায় পাপে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থাৎ এক্ষণে পাপকার্য্য করা যাউক্, পরে সর্বপাপনাশন হরিনাম কীর্তন করিয়া, সে পাপ কালন করা যাইবে, এইরূপ স্থির করিয়া পাপাচরণ করা, ইহাও নাম কীর্তনের অহিতকর অর্থাৎ অন্তরায়-স্বরূপ ; এইরূপ অর্থবাদ ও নামের ভরসায় পাপাচরণ হইতে যে পাপীর নামবলে পাপাচল ভিন্ন না হয়, বমালয়ে বম-বাতনা দ্বারাই তাহার শুদ্ধি হয় । অপিচ,—

ধর্ম্মব্রতত্যাগহতাতিসর্ব —
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ ।
অশ্রদ্ধধানো বিমুখোহপ্যশৃণুন্,
যশ্চোপদেশঃ স নামাপরাধঃ ॥

পদ্মপুরাণ । স্বর্গ । ৪৮

[৪র্থ খণ্ড]

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

১৩

সপ্তম নামাপরাধ, ধর্ম, ব্রত, দান, হোমাদি সর্ব শুভক্রিয়ার
সাম্য থাকিলেও ধর্ম, ব্রত, দান, হোম প্রভৃতি শুভকার্যের
সহিত নাম-বাজনকে সমান মনে করা, ইহাও নাম কীর্তনের অহিতকর
অর্থাৎ অন্তরায়-স্বরূপ। অষ্টম নামাপরাধ, প্রমাদ অর্থাৎ নাম কীর্তন
করিলে পাপক্ষয় হইবে কি না, নামের পাপ-ক্ষালন-শক্তি আছে কি না
ইত্যাদি-রূপ অনবধানতা অর্থাৎ ভ্রম করা, ইহাও নাম কীর্তনের
অহিতকর অর্থাৎ অন্তরায়-স্বরূপ। নবম নামাপরাধ, নাম-সাধনে
শ্রদ্ধাহীন অর্থাৎ বিমুখ অথবা যে শুনিয়াও শুনে না, এমন ব্যক্তি,
আর, তাহাকে যে উপদেশ প্রদান করে অর্থাৎ বিমুগ্ধ অনধিকারী
জনকে নাম সাধনের উপদেশ দাওয়া, তাহাদিগের এইরূপ আচরণও
নাম কীর্তনের অহিতকর অর্থাৎ অন্তরায়-স্বরূপ নামাপরাধ। অপিচ,—

ঋত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোহধমঃ ।

অহম্মাদি পরমো নাস্তি সোহপ্যপরাধকৃৎ ॥

পদ্মপুরাণ । সর্গ । ৪৮

দশম নামাপরাধ, নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও, তাহাতে প্রীতি না
করিয়া, অহঙ্কার মমকারে মত্ত থাকা অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভক্ত সাধু
মহাত্মার নিকট নামের অপার মহিমা, অতুলনীয় ক্ষমতা, অনির্বচনীয়
আনন্দ, আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় শুনিয়াও, ধন-জন-যৌবনের অভিমানে
প্রভুত্ব-মহত্ত্ব-বিচার অহঙ্কারে, ঐশ্বর্য্য ও স্বকীয় কৃতিত্বের গর্বে গর্বিত
হইয়া, নামের প্রতি অবহেলা করিয়া, আপনাকে সর্বশক্তিমান্ ভাবিয়া,
আত্মপূজায় সতত নিরত থাকে ; সেই অহং মমতাদিতে আসক্ত-চিন্ত
ব্যক্তি অর্থাৎ যে অধম, নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও, নামে প্রীতি-রহিত হইয়া
থাকে, তাহার এইরূপ আচরণই নামাপরাধ অর্থাৎ সেও নামে
পরম অপরাধী। পদ্মাবলী গ্রন্থে উক্ত আছে যে,—

অর্চোষু শিলাধীশু ক্রযু চ নরমতি বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ,

বিষ্ণুর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্ণেহল্পবুদ্ধিঃ ।

শ্রীবিষ্ণুর্নাস্তিমন্ত্রে, সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি—

বিষ্ণৌ সর্বৈশ্বরেশে তদিতরসমধী যন্ত বা নারকী সঃ ॥

পদ্মাবলী

যে ব্যক্তি অর্চনীয় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর শিলাময়ী, ধাতুময়ী, দারুময়ী বা মৃন্ময়ী প্রতিমা বা বিষ্ণুচক্র শালগ্রাম শিলামূর্ত্তিকে চিন্ময়ী জ্ঞান না করিয়া, উক্ত মূর্ত্তি সকলে সামান্য মূর্ত্তিকা, ধাতু, দারু ও শিলাবুদ্ধি সংস্থাপন করে ; ভবকর্ণধার অবতার পরমারাধ্য প্রাণের দেবতা শ্রীগুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি অর্থাৎ গুরুকে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞান করে ; জীব-জগতে যাঁহারা সর্বদা পরের উপকার করেন, পরের কুশলে আপনার কুশল মনে করেন, পরদুঃখে কাতর হইয়া, কেবল পরের ভাবনাই ভাবেন ; যাঁহারা পরের সম্পদকে পাষণ বা লোষ্ট্রখণ্ড জ্ঞান করেন, তাদৃশ দয়াবান্ সদাশয় ভগবদ্গতচিন্তা বিষ্ণু-পরায়ণ বৈষ্ণবে জ্ঞতিবুদ্ধি অর্থাৎ “চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ” চণ্ডালও যদি ভক্তি-পরায়ণ বৈষ্ণব হয়, তিনিও সকলের পূজ্য ; যে ব্যক্তি তাঁহাতে জ্ঞতিবুদ্ধি করে অর্থাৎ তাঁহাকে চণ্ডাল জ্ঞতি মনে করিয়া, তাঁহার অনাদর করে ; সর্বপাপনাশক ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পাদোদকে বা তদীয় পরমভক্ত বৈষ্ণবগণের কলিমল-বিনাশক পাদ-প্রকালন-সলিলে সামান্য জল-বুদ্ধি অর্থাৎ সাধারণ জল জ্ঞান করা ; ভবপারাবারের কাণ্ডারী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নিখিল-কলুষ-নাশক রাম-কৃষ্ণ-বামনাদি পবিত্র নামে ও অক্ষরাদি-বিষ্ণুমন্ত্রে ‘ঘট-পটাদিবৎ’ শব্দ-সামান্য বুদ্ধি অর্থাৎ ‘ঘট, পট’ যেমন সাধারণ শব্দ, তেমনই ভগবান্ ও ভগবান্নাদিও সামান্য অক্ষর এবং সাধারণ শব্দ মাত্র, এইরূপ জ্ঞান করা ; আর, সর্বেশ্বর সর্বরূপ সর্ব-স্বরূপ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে এবং সেই শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত সমতা-বুদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদিগকে এবং সর্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে সমান জ্ঞান করা ; যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে, সে ব্যক্তি নারকী । এইরূপ দশবিধ নামাপরাধ বলিয়া কথিত হইয়াছে ; এই নামাপরাধে অপরাধী হইলে, মানবকে অধঃপাতে অর্থাৎ মনুষ্যযোনি হইতে ধাপের পর ধাপ নামিয়া আসিয়া, তির্য্যগ্‌যোনিতে শূকরাদি পশু-পক্ষী-রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ।

—•—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

সাধুনিন্দা ।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি অধুনা বলিলেন যে,—‘সাধুনিন্দা করাও নামাপরাধ ।’ যদি কোন সাধু, পাপকর্মে বা গৃহকর্মে নিরত হইয়া, অপকর্ম করিতে থাকেন, তদর্শনে তাঁহাকে নিন্দা করিলেও কি নামাপরাধ হইবে? এমন ত আজ কাল সংসারে অনেকে আছেন, সাধুবেশ ধরিয়া, গৃহস্থ অপেক্ষাও অপকর্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করিলে, নামাপরাধ হইবে কেন ?

জ্ঞানী কশ্চিৎপ্রবৃত্তঃ প্রবিরতবিষয়ন্ত্যক্তভোগা নিরাশঃ,
কশ্চিদ্ভোগী প্রসিক্তো বিচরতি বিষয়ে ভোগরাগপ্রসক্তঃ ।
প্রারব্ধস্তত্র হেতুর্জনয়তি বিবিধা বাসনাঃ কর্মযোগাৎ,
প্রারব্ধে যন্ত ভোগঃ স যততি বিভবে ভোগহীনো বিরক্তঃ ॥

শাস্তিগীতা । ৬

তদুৎপত্তিভূত ভগবন্তুক্ত তদ্বজ্র পুরুষকে সহজে চিনিতে পারা যায় না ; কেন না, কোন তদ্বজ্র পুরুষ বিরক্ত, কোন তদ্বজ্র পুরুষ বিষয়ভোগে নিরত, কোন তদ্বজ্র পুরুষ ভোগত্যাগী এবং কোন তদ্বজ্র পুরুষ সর্বভোগী হইয়া, আশাশূন্য হয়েন । আবার, কেহ বা ভোগী, ভোগে অনুরক্ত ও স্ত্রী-পুত্র ধনৈশ্বর্য্য প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া, সংসারে বিচরণ করেন । ভগবদুৎপত্তিভূত তদ্বজ্র পুরুষের এই প্রকার পৃথক্ পৃথক্ ভাব-বিষয়ে প্রারব্ধই হেতু । এই প্রকার প্রারব্ধ কর্মই বিবিধ বাসনা উৎপাদন করে । যাঁহার ভোগের প্রারব্ধ, তিনি বিভবে যত্ন করেন ও বিষয়ভোগে অনুরক্ত হয়েন ; আর যাঁহার ভোগহীন প্রারব্ধ, তিনি বিরক্ত অর্থাৎ বিষয়-ভোগ-ত্যাগী হন । প্রারব্ধ কর্ম এত বলবান্ যে, তাহার ভোগ ব্যতীত আত্মকলুষ পর্যাণ্ত কেহই তাহা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না । শ্রুতি কহিয়াছেন,—“প্রারব্ধ ভোগাদেব ক্লীয়তে ” প্রারব্ধ ভোগ হইলেই ক্লয় প্রাপ্ত হয় । প্রারব্ধ বশতই মানবগণের

৬

সুগম সাধন-পন্থা ।

বাসনা, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি জন্মে ; সুতরাং প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বিষয়ে
সর্ববৃত্তোভাবে প্ররন্ধেরই প্রভুত্ব। দেখ,—

জাতঃ সূর্য্যকূলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণ্ডীভুজামগ্রণীঃ,
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্থানুজো লক্ষ্মণঃ ।

দোদীপ্তেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষুঃ স্বয়ং,
রামো যেন বিড়ম্বিতোহপি বিধিনা চাণ্ডে জনে কা কথা ॥

সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার ।

রঘুকুলসূর্য্য ভগবান্ রামচন্দ্র, দোদীপ্তপ্রতাপশালী সূর্য্যকূলে জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাহাতে আবার, তাঁহার পিতা পৃথিবীজয়ী
সসাগরা ধরার অধীশ্বর দোদীপ্ত প্রতাপশালী মহারাজা দশরথ । আর,
সসাগরা ধরা আপনার করতলগত আপনার আয়ত্তাধীনে সমগ্র
পৃথিবীর মানব-দানব সকলেই আয়ত্তীকৃত ; সত্য-পরায়ণা সতী সাধবী
সীতা, যিনি জগল্লক্ষ্মী, যাঁহার প্রণয়িনী অর্থাৎ অর্দ্ধাঙ্গিনী ; প্রবল
পরাক্রম অর্থাৎ উর্দ্ধরেতাঃ মহাবলশালী,—এমন বীর বোধ হয়, একাল
পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এমন বীর-পুরুষ লক্ষ্মণ যাঁহার
অনুজ ; আর, তিনি স্বয়ং ত্রিভুবনের অধীশ্বর জগন্নিয়ন্তা পরমেশ্বর
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ পূর্ব্বদ্বন্দ্ব ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, তিনিও যখন প্রারন্ধ কর্ম্মের
অধীন হইয়া, কত প্রকারে কত সময়ে কতই না বিড়ম্বিত হইয়া,
প্রারন্ধবশতঃ বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছেন ; তখন—“ অণ্ডে জনে কা
কথা । ” প্রারন্ধ-বিষয়ে অপরের কথা আর বল্লেখ কি ? অতএব,
ভগবন্ত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ লোকতঃ ভোগে বা গৃহাদি কর্ম্মে আসক্ত
থাকিলেও, তিনি নিন্দাই নহেন, কেন না,—

বিচরতি গৃহকার্য্যে ত্যক্তদেহাভিমানো—

বিহরতি জনসঙ্গে লোকযাত্রানুরূপম্ ।

পবনসমবিহারী রাগসঙ্গপ্রমুক্তো —

বিলসতি নিজরূপে তদ্বিবিদ্যন্তলিঙ্গঃ ॥

শাস্তিগীতা । ৬

[৪র্থ খণ্ড]

ধিতায় পারচ্ছেদ ।

৭

ভগবন্তুক্ত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ দেহাভিমানরহিত হইয়া, গৃহকার্য্যে
বিচরণ করেন ; লোকযাত্রানুরূপ লোক-সঙ্গে বিহার করেন । আসক্তি
ও সঙ্গরহিত পবনের ন্যায়, তাঁহাদের বিহার । ভগবন্তুক্ত তত্ত্ববিৎ
পুরুষ বাহ্য-বিষয়ে লোক-দৃষ্টিতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়নিধান পাঞ্চভৌতিক
শরীরধারী হইলেও, নির্বিবকার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ স্বীয় আত্মাতে
অবস্থিতি করেন । অতএব, তাঁহারা দৃশ্যতঃ ভোগে বা গৃহকর্মে আসক্ত
হইয়া, গৃহীর ন্যায় কর্ম্ম বা ভোগ-পরায়ণ হইলেও, নিন্দার নহেন ;
কেন না,—

স্বক্টং স্বক্টং পুনরপি পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং,
ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনঃ স্বাত্ত্ব চৈবেক্ষুকাণ্ডম্ ।
দন্ধং দন্ধং পুনরপি পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণং,
ন শ্রাণান্তে প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে চোত্তমানাম্ ॥
সুভাবিতরত্নভাণ্ডাগার ।

যে প্রকার চন্দন-কাষ্ঠকে পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করিলে, সুচারু গন্ধই
নির্গত হয়, কদাপি তাহার সুগন্ধ ঘর্ষণজনিত বিকৃত হয় না
অর্থাৎ তাহার প্রকৃত বিকৃতি হয় না তদ্রূপ, তত্ত্ববিৎ পুরুষ
সংসারের ভোগ-সুখে আসক্ত হইলেও, তাঁহার স্বভাব অর্থাৎ
আত্মনিষ্ঠা বিকৃত হয় না, তিনি প্রারব্ধশতঃ বারংবার ভোগে
লিপ্ত হইয়াও, অনাসক্তভাবে ভোগ করিয়া, আত্মাতেই অবস্থিতি
করেন । যে প্রকার ইক্ষুদণ্ডকে পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ভিন্ন করিলেও, তাহার
আপন স্বভাব মধুরতা সে কদাপি পরিত্যাগ না করিয়াই সুস্বাদু থাকে,
তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ প্রারব্ধশতঃ বারংবার জন্ম-মৃত্যুর উত্থান-পতনের
বিবর্তনে পড়িলেও, তাঁহার ভাবের কদাপি বিপর্য্যয় ঘটে না, তিনি এক-
ভাবে থাকিয়াই, জন্ম-মৃত্যুর যজ্ঞা অনায়াসেই ভোগ করিয়া থাকেন ।
যে প্রকার স্ববর্ণকে পুনঃ পুনঃ দন্ধ করিলেও, তাহার স্বভাবজ বর্ণ
পরিত্যাগ করে না, সে আরও উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় ; তদ্রূপ, তত্ত্বজ্ঞ

পুরুষ প্রারদ্ধবশতঃ ভোগ-স্বথে লিপ্ত হইয়া, ভোগের পরিণাম—আধি-
 ব্যাধি শোক-তাপে পুনঃ পুনঃ মুহমান হইয়াও, আত্মাতেই অবস্থিত
 থাকেন, কদাপি তাঁহার প্রকৃতি-বিকৃতি হয় না, তিনি নিজ স্বভাব
 প্রাণান্তেও কখন পরিত্যাগ করেন না। দুর্জ্ঞান কর্তৃক তাঁহারা
 উৎপীড়িত হইয়াও, আপন স্বভাব পরিত্যাগ করেন না, অর্থাৎ
 দুর্জ্ঞান তাঁহাদের উপর অত্যাচার কিম্বা তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন
 করিলেও, তাঁহারা তাহাতে ব্যথিত না হইয়া, বরং আনন্দিত হইয়া,
 দুর্জ্ঞানের প্রশংসা করিতে করিতে, তাহার সংকারেই প্রবৃত্ত হইয়া
 থাকেন ।

সৌজন্যামৃতসিদ্ধবঃ পরহিতপ্রারদ্ধবীরত্বতা,
 বাচালাঃ পরবর্ণনে নিজগুণালাপে চ মৌনব্রতাঃ ।
 আপৎস্বপ্যবিমুপ্তৈধৈর্য্যনিচয়াঃ সম্পৎস্বনুৎসেকিনো—
 মাভুবন্ খলবন্ত নিগতবিষজ্বালাততাঃ সজ্জনাঃ ॥

সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার ।

সুজনতামৃত-সমুদ্র-স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, পরহিতের জন্ত ধন, জীবন
 উৎসর্গ করিয়া, সতত পরের হিতসাধনই করিয়া থাকেন; আর,
 তাঁহারা প্রারদ্ধের উপর নির্ভর করিয়া, প্রারদ্ধ কর্তৃক ভোগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
 হন, প্রারদ্ধ ব্যতীত অণু কোন প্রকার ভোগের বাসনা করেন না।
 পরগুণবর্ণনে তাঁহারা বাচালতা প্রকাশ করেন; কিন্তু, নিজগুণালাপের
 বেলায় তাঁহারা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। আর, প্রারদ্ধবশতঃ
 তাঁহাদের আপৎকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহারা দৃঢ়তর ধৈর্য্য ধারণ
 করিয়া, অবাধে আপৎ ভোগ করিয়া থাকেন এবং প্রারদ্ধবশতঃ সম্পৎ
 উপস্থিত হইলে, গর্বাভিমানরহিত হইয়া, তাহাও ভোগ করিয়া
 থাকেন। আর, কোন কারণে বা অকারণে দুর্জ্ঞান-কর্তৃক অবপীড়িত
 হইলেও, অকাতরে তাহা সহ করিয়া থাকেন। এই সকল লক্ষণে
 লক্ষণাঙ্কিত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ জড়ভরত ছিলেন। জড়ভরত জনৈক ব্রাহ্মণ,
 জন্মান্তরে ইনি রাজর্ষি ভরত ছিলেন। মৃত্যুকালে মূগের বিষয় চিন্তা

[চতুর্থ খণ্ড]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

৯

করিতে করিতে, প্রাণত্যাগ করায়, পরজন্মে কালঞ্জর পর্বতে জাতিস্মর যুগরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তৎপরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন । এ জন্মেও তিনি জাতিস্মর ছিলেন বলিয়া, পূর্ব পূর্ব জন্ম-বৃত্তান্ত তাঁহার স্মৃতি-পটে উদিত হইত । সে কারণ ইনি সঙ্গ-পরিহার-বাসনায় সর্বদা জড়ৎ অবস্থান করিতেন । তাহাতেই ইনি জড় ভরত নামে খ্যাত হন । ইঁহার নয়জন ভ্রাতা, ইনি সকলের কনিষ্ঠ ছিলেন । অগ্ন্যাগ্ন ভ্রাতাগণ সকলেই পণ্ডিত ; কিন্তু, ইনি লিখা-পড়া কিছুই শিখেন নাই । ইঁহার পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ ঘটিলে, ভ্রাতারা ইঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন । প্রাকৃত দ্বিপদ পশুগণ, তাঁহাকে জড় বা মুক অথবা বধির বলিয়া, তাঁহার সহিত যেরূপ বাক্যালাপ করিত, তিনিও সেইরূপ করিতেন । যে ব্যক্তি যে কৰ্ম করাইত, তিনি তাহারই ইচ্ছানুরূপ সেই কৰ্মই করিতেন । লোকে বিনামূল্যে কাজ করাইবার জগ্ন, তাঁহাকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গেলে, তিনি যে কিছু খাওয়াদ্রব্য পাইতেন, কিম্বা বেতন, যাচঞা বা যদৃচ্ছালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ কুংসিত অন্ন যাহা হস্তগত হইত, কেবল তাহাই ভোজন করিতেন । কিন্তু, তাহাতে যে ইন্দ্রিয়ের প্রীতি হইবে, ইহা মনেও করিতেন না । কারণ, উৎপাদকশূণ্য ও অভিব্যঞ্জক-রহিত বিশুদ্ধ অনুভব-স্বরূপ আনন্দময় আত্মাতেই ইনি সন্তুষ্ট থাকিতেন । আত্মা ঐ রূপ,—তাঁহার এই জ্ঞানই হইয়াছিল । মান-অপমান-রূপ দ্বন্দ্ব-জনিত সুখ ও দুঃখে, তাঁহার দেহাভিমান ছিল না । তিনি শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষাদিতে অনাবৃত দেহে বিচরণ করিতেন । ভূমি-শয়ন, তৈল-মর্দনাব্যাব এবং অস্নান-হেতু সর্বদা গাত্র ধূলায় ধূসরিত থাকিত ; তাহাতে ব্রহ্মতেজ মহামণির দ্বায় অপ্রকাশিত থাকিত । যাহারা তাঁহার তত্ত্ব জানিত না, তাহারা তাঁহাকে কেহ ‘এটা কুংসিৎ ব্রাহ্মণ’ কেহ ‘ব্রহ্মবন্ধু’ বলিয়া অবজ্ঞা করিত । যখন তিনি কাহারও কৰ্ম করিয়া দিয়া, বেতন-স্বরূপে

কেবল আহার পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন, তখন তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে আহারের লোভ দেখাইয়া শালিক্ষেত্রের কর্দম-মর্দনাদি কার্যে নিযুক্ত করিত ; ভরত তাহাও করিতেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ ক্ষুদ্র, খইল, তুষ, কীট-দূষিত কলায় এবং স্থালীলগ্ন দণ্ড অনাদি বাহ্য কিছু দিত, তিনি তাহাই অমৃত-বোধে ভোজন করিতেন।

একদা কোন চৌররাজ অপত্য-কামনায় ভদ্রকালীর প্রীতি-সম্পাদনার্থ নরপশু বলিদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার সেই নর-পশু হঠাৎ বন্ধনমুক্ত হইয়া পলায়ন করে। তখন তাহার অনুচরেরা সেই পশুর অন্বেষণ করিবার জন্য চতুর্দিকে ধাবমান হইল ; কিন্তু, কুত্রাপি তাহাকে প্রাপ্ত হইল না। ভ্রমণ করিতে করিতে তাহারা অন্ধকার-রাত্রিতে ক্ষেত্রের দিকে গমন করিল। সেখানে দেখিল,— ভরত অদ্ভুত প্রকারে উদ্ভিধে থাকিয়া, ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন। তাহারা তাঁহাকে স্নলক্ষণ পশু বিবেচনা করিয়া, পরস্পর বলিতে লাগিল,—‘ইহার দ্বারাই আমাদের প্রভুর কার্য্য হইতে পারে।’ তাহারা এই বলিয়া, হর্ষোৎফুল্ল-বদনে ভরতকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া, চণ্ডিকা-গৃহে লইয়া গেল। অনন্তর ঐ চৌররাজ নিজ বিধিমতে তাঁহাকে স্নান করাইয়া, বসন পরিধান করাইল এবং গন্ধ-মাল্য দিয়া তিলক দ্বারা অলঙ্কৃত করিল। তাহার পর দেবীর পূজাপূর্বক উচ্চ গীত-স্তুতি করিয়া এবং মৃদঙ্গ-পণবাদি সুমহৎ বাজ্য বাজাইয়া, তাঁহাকে ভদ্রকালীর অগ্রে আনয়ন করিল ও অধোমুখে বসাইল। তৎপরে যে চৌর, তক্ষর-রাজের পৌরহিত্য-কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল, সে ঐ পুরুষ-পশুর রক্তাসবে ভদ্রকালীর অর্চনা করিবার জন্য, ভদ্রকালীর মস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া, ভয়ানক শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিল। তখন ভদ্রকালী তাহা অনর্থ বিবেচনায়, অগ্রেই প্রতিমা পরিত্যাগ করিয়া, বহির্নির্গতা হইলেন। যিনি ব্রহ্মর্ষি-সন্তান এবং নিজেও ব্রহ্ম স্বরূপ, বাঁহার কাহারও সহিত শত্রুতা নাই, যিনি সর্ববজীবের সুহৃদ, আপৎ-

কালে লৌকিকী হিংসাতেও, যাঁহার প্রাণবধ অনুমোদিত হইতে পারে না, তাঁহার শিরশ্ছেদন কামনায় দেবী-সমক্ষে বলিদানের উদ্যোগ হইতেছে ;—ইহাতে দেবীর দেহ দুর্বিষহ ব্রহ্মতেজে দহমান হইতে লাগিল । তিনি পাপাত্মা দুই তস্করদিগের উপরে লক্ষ প্রদান করিয়া, ভূপাতিত করিয়া, তাহাদেরই খড্গে তাহাদেরই মস্তক ছেদন করিলেন ।

একদা কৰ্ম্মবীর পুরুষ-প্রধান অৰ্জ্জুনের মনে বড়ই সন্দেহ উপস্থিত হইল, তিনি কাতরভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভগবন্ ! কৃপা করিয়া বলিয়া দেন, আপনার যাঁহারা ভক্ত, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, তাঁহাদিগকে চিনিবার উপায় কি ? তাঁহাদের লক্ষণ কি ? কিরূপেই বা আমরা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহাদের সেবা করিয়া, সঙ্গ লাভ করিতে পারিব ?’ তখন ভগবান্ ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—‘তুমি আমার একান্ত ভক্ত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদিগের বিশেষ লক্ষণ কি জিজ্ঞাসা করিলে, অধিক আর কি কহিব, যিনি স্বভাবতঃ বিলক্ষণ, তাঁহার আবার লক্ষণ কি কহিব ? উপাধিতেই লক্ষণালক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । নিরস্ত-উপাধি সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের কোনই লক্ষণ নাই । তবে যে তটস্থ লক্ষণ এবং স্বরূপ লক্ষণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল লক্ষ্য বস্তুকে প্রবোধন করাইবার নিমিত্ত । নতুবা অলক্ষ্যের লক্ষণ ও ভাবাতীতের ভাব কিছুই সম্ভব হয় নাই ।

বিহরেদ্বিবিধৈর্ভাবৈর্ভাবাভাববিবৰ্জিতঃ ।

সৰ্ব্বাচারানতীতঃ স নানাচারৈশ্চরেদ্ যতিঃ ॥

প্রারকৈর্নীয়তে দেহঃ কণ্ঠকং পবনৈর্যথা ।

ভোগে নিযোজ্যতে কালে যথাযোগ্যাং শরীরকম্ ॥

নানাবেশধরো যোগী বিমুক্তঃ সৰ্ববেশতঃ ।

কচিস্তিস্কুঃ কচিন্নগ্নো ভোগে মগ্নমনাঃ কচিৎ ॥

শৈলুষসদৃশো বেষ্টে নানাক্রপধরঃ সদা ।

ভিক্ষাচাররতঃ কশ্চিৎ কশ্চিত্ত্ব রাজবৈভবঃ ॥
 কশ্চিত্তোগরতঃ কামী কশ্চিদৈরাগ্যমাশ্রিতঃ ।
 দিব্যবাসাশ্চীরাচ্ছন্ন দিগ্বাসা বন্ধমেখলঃ ॥
 শান্তিগীতা । ৬

তিনি পরমার্থতঃ ভাবাভাব-বিবর্জিত, পরন্তু উপাধি-দৃষ্টিতে নানা-
 ভাবে বিচরণ করেন। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ পরমার্থতঃ, সৰ্ব্বাচারের অতীত
 হইয়াও, উপাধি-দৃষ্টিতে নানাচারে বিচরণ করেন। যেমন পবন
 দ্বারা কণ্ডুক অর্থাৎ সর্পহক বিচলিত হয়, সেই প্রকার প্রারন্ধ কৰ্ম্মবশে
 তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের শরীরও পরিচালিত হয় অর্থাৎ প্রারন্ধ কৰ্ম্ম যথাযোগ্য
 ভোগকালে শরীরকে নিয়োগ করে। তত্ত্বজ্ঞ স্বরূপ-দৃষ্টিতে সৰ্ব্ববিশেষ-
 বিনিৰ্ম্মুক্ত হইয়াও, উপাধি-দৃষ্টিতে নানাবেশধারী হয়েন। কখন
 ভিক্ষুবেশধারী, কখন - নগ্ন, কখন বা ভোগে মগ্ন থাকেন।
 বহুরূপীর ন্যায় সৰ্ব্বদা তাঁহারা নানারূপ ও নানাবেশ ধারণ করেন।
 কেহ ভিক্ষাচারে রত, কেহ বা রাজ-রাজেশ্বর সাজিয়া, রাজ-রাজেশ্বরের
 সুখাধিবলিত আকাশভেদী সুরমা হর্ম্যাবলীতে বসবাস করিয়া, অতুল
 ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইয়া রাজরিভব-যুক্ত, কেহ বা কামিনী-কাঞ্চে
 আসক্ত হইয়া, কামভোগে রত, কেহ বা পুত্র-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন,
 বিভব-বৈভব, গৃহ, সুখৈশ্বর্য পরিত্যাগপূর্বক বৈরাগ্যকে আশ্রয়
 করিয়া, সংসার-কোলাহল গণ্ডগোলের অন্তরালে অবস্থিত। কেহ
 দিব্য বসনাদিতে বিভূষিত, কেহ চীরবাসধারী, কেহ বা উলঙ্গ, কেহ বা
 বন্ধমেখল। আবার কেহ বা চন্দনাদি দিব্য সুগন্ধি দ্রব্যাদিতে
 বিলিপ্ত, কেহ ভস্ম-বিলিপ্ত-কলেবর। এইরূপে বিবিধভাবে, বিবিধ-
 রূপে ও বিবিধবশে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করেন।
 স্বরূপতঃ অব্যক্ত হইয়াও, লোক-দৃষ্টিতে, তাঁহারা ব্যক্তরূপ দেহাদি
 উপাধিধারীর ন্যায় ভ্রমবর্জিত হইয়া, পরিভ্রমণ করেন; তাঁহাদিগের
 বাহ্য-লক্ষণ দেখিয়া, তাঁহাদিগকে কখন জানিতে বা চিনিতে পারা

যায় না । দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ লোক বাহু-লক্ষণই দৃষ্টি করিয়া থাকে, পরন্তু, বাহু-লক্ষণের দ্বারা কখন অন্তর্ভাব জানিতে পারা যায় না ।

অতএব, সাধু যেমনই হউন, তাঁহার নিন্দা করিও না, তাঁহার অন্তরের দেবভাব—দয়া-দাক্ষিণ্য, মৈত্রী-করুণাদি সদ্বৃত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই তোমার লাভ ; আর, তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে বহু-জন্মার্জিত জন্ম-জন্মান্তর-সংস্কারলব্ধ সম্পত্তি পশুবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে, তোমার ক্ষতি । লোকে কথায় বলে,—‘যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ ।’ একারণে সাধুনিন্দা করিতে নাই, তিনি যেমনই হউন, সাধুপথে ত দাঁড়াইয়া আছেন !—লোককে ত সংপথে চলিতে, সৎকর্ম করিতে, তাঁহারা পরামর্শ দিয়া থাকেন ; সাধুবেশ ধরিয়া কৈ কোন সাধু ত কখন কাহাকেও বলেন না যে,—‘তুমি চুরি কর, পাপ কর, অন্যায় কর ও অসংপথে চল,’ ইত্যাদি । তাঁহারা মন্দ হউন, তোমার তাহাতে ক্ষতি কি ? কাপড় যতই ময়লা হউক, লজ্জা ত রাখিবেই । অতএব, মহতের নিন্দা কখন করিও না এবং শূনিবেও না ; কারণ, মহতের যে শুধু নিন্দা করে, তাহারই পাপ হয়, তাহা নহে । শাস্ত্র বলেন,—“ন কেবলং যো মহতোপভাষতে, শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্ ।” যে ব্যক্তি মহতের নিন্দা শুনে, সেও পাপে লিপ্ত হয় । সুতরাং মহতের নিন্দা শূনিবে না ; মহতের নিন্দা সত্য এবং প্রত্যক্ষ হইলেও, তাহা অশ্রাব্য । একটু অনুধাবন করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে যে,—“জগত্যাং ন কিমপ্যস্তি ন নির্দোষং ন নিগুণম্ ।” জগতে এমন কিছু বস্তু বা এমন কেহ নাই, যাহাতে বা যাহার একটুমাত্রও দোষ নাই বা গুণ নাই । কেবল এ জগতের কথা বলি কেন ? ত্রিজগতের মধ্যেও কিছু বা কেহ নিগুণ নাই ।

খ্যাতঃ শক্ৰো ভগাঙ্কো বিধুরপি মলিনো মাধবো গোপজাতো
বেশ্যাপুল্লো বসিষ্ঠো রতিপতিরতনুঃ সর্বভক্ষী হতাশঃ ।
ব্যাসো মৎস্তোদরীয়ো লবণজলনিধিঃ পাণ্ডবা জারজাতা—
রুদ্র প্রেতাশ্বধারী ত্রিভুবনবিষয়ে কশ্য দোষো ন চাস্তি ॥

সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার ।

দোষ কাহার নাই? কেবল এই মর-জগতের কথা বলিতে চাহি না,—স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালেও কেহ নির্দোষ আছেন, একথা বিশ্বাস করিতে পারি না ; সকলের মধ্যেই একটা কিছু না কিছু দোষ লাগিয়াই আছে। কেবল মানুষ নহে, দেবগণের মধ্যেও নির্দোষ কহাকেও দেখিতে পাইবে না ; দেবতাদিগের মধ্যেও কেহই নির্দোষ নাই। দেখ,—প্রদীপ্ত অপাপবিন্ধ দেবলোকে দেবরাজ ইন্দের আপাদমস্তক সর্ববশরীরেই ঘৃণিত 'ভগ-ছিহ'। অনন্ত আকাশে জ্যোতিষ্কগণে জ্যোতির জ্যোতিঃ—উজ্জ্বলতার কৌস্তভমণি—আলোকের পবিত্র-রশ্মি আলোক-রূপী ভগবান্ কারুণ্যপ্রাণ করুণা-নিদান চন্দ্রেও 'মলিনতা' বিद्यমান। আর, যিনি ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরি জীবের ত্রিতাপ-হারী,—“গতিৰ্ভৰ্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সূহৃৎ” যিনি তেত্রিশকোটি দেবতারও পরম-দেবতা, স্বেয়ং পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ; তিনিও গোপকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পরাংপর পরিপূর্ণ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কুলগুরু মহামতি মহর্ষি বসিষ্ঠদেব, বেশ্যাগর্ভজাত। সৌন্দর্য্য-শ্রষ্টার সর্ব-সৌন্দর্য্য-সম্পদ-সম্পত্তি রূপময়ী সৌন্দর্য্যময়ী রস-সৌন্দর্য্যের আধারভূতা প্রকৃতি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী রতির প্রিয়তম পতি মদন, অবয়বহীন অর্থাৎ অঙ্গহীন। তেত্রিশকোটি দেবতার পরম প্রিয়পাত্র হব্যবাহ পরম পবিত্র অগ্নিদেব, সর্বভক্ষী। জ্ঞানাবতার সর্বজ্ঞ ত্রিকালদর্শী ব্রহ্মতেজে তেজিয়ান্ ভগবান্ ব্যাসদেব শুদ্ধকণ্ঠা মৎস্তোদরীর গর্ভজাত। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব-জীবের জীবন-স্বরূপ পরমাদরণীয় নয়ন-মনোরঞ্জক অনন্ত-বীচি-বিক্ষুব্ধ শোভন-সৌন্দর্য্যময় নীলাম্বুনিধি মহান্ সমুদ্র, সকলের মনাকর্ষক ও ন পূজ্য হইয়াও, লবণ-দোষে দূষিত হইয়া, দেব-দানব-পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ সকলের নিকট হেয় ও পরিত্যক্ত হইয়াছেন। পরমধার্মিক পরমোদার-

[৪র্থ খণ্ড]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

১৫

চরিত পরমারাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম-স্নেহে লালিত-পালিত-
পোষিত ধর্ম-নন্দন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডব, মর্ত্যলোকবাসী জ্ঞানী-
মানী-ধনী সকলেরই প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াও, জারজ-দোষে দূষিত বলিয়া,
আবার সকলের নিকট অপূজ্য হইয়াছেন । আরও দেখ, যিনি স্বাবর-
জঙ্গমাশ্রম সর্বজীবের অধীশ্বর, ভূতভাবন ভরানী-পতি শঙ্কর, যিনি
মুক্তজীবের মুক্তি-দাতা—দেবগণের পরিত্রাতা, জীবগণের গতিভর্তা—
জগতের সংহারকর্তা, সর্ব-শক্তি-সম্পন্ন মহাশক্তিমান—সর্ব-সম্পদের
—সর্ব ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠান, তিনি কি না—মানব-দানব সকলের হেয়,
অস্পৃশ্য প্রেতাশ্বি-মালায় গলায় ধারণ করিয়া, কিস্তৃত কিমাকারে
নর-কপাল করে লইয়া, ভিক্ষাটনে পরিভ্রমণ করিতেছেন । অতএব,
ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, অভিমানী—অহঙ্কারী মস্তককে অমনত
করিয়া, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি,—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল,—এই
ত্রিভুবনের মধ্যে কাহার দোষ নাই ? কেই বা নির্দোষ আছেন ?
সুতরাং, বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে,—“জগত্যাং ন
কিমপ্যস্তি ন নির্দোষঃ ন নিগুণম্ ।” জগতে এমন কেহই নাই, যিনি
একেবারে নির্দোষ বা একেবারে নিগুণ হইতে পারেন । তবে সাধু-
মহাত্মারা ত জগৎছাড়া নহেন ! সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কণামাত্র
সাধু ও মহত্ব থাকিলেই, তাঁহারা সাধু ও মহান্ আত্মা বলিয়া, জগতে
সকলের নিকট পূজ্য ও সমাদৃত হইতে পারেন । সুতরাং সাধুনিন্দা
করিও না, সাধুনিন্দা মহাপাপ ! পাপ করিলে, পাপের পরিণাম
যে রূপ অশেষ ক্লেশভোগ ঘটিয়া থাকে, সাধুনিন্দা মহাপাপে লিপ্ত
হইলেও, মানুষ ততোধিক ক্লেশ-কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হয় সংশয়
নাই । মহামতি সোমদত্তকে সৌদাস কহিতেছেন,—

“জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি অবজ্ঞাঃ কুরুতে তু যঃ ।

মহৎসু তস্ম ন শান্তি শ্রেয়োহপত্যধনক্রিয়াঃ ॥

শুশ্রূষাং কুরুতে যন্ত মহতাং সাদরং নরঃ ।
তস্য সম্পদ্ববেৎ সাধ্বা ইতি প্রাহুর্বিপশ্চিতঃ ॥”

বৃহন্নারদপুরাণ । ৯

‘হে ভূপ ! জ্ঞানপূর্বকই হউক আর, অজ্ঞানপূর্বকই হউক, যাহারা মহতের অমাননা বা নিন্দা করে, তাহাদের সন্তান, সম্পত্তি এবং সমুদয় কার্য্যই বিনষ্ট হইয়া থাকে ; কোন বিষয়েই তাহাদের মঙ্গল হয় না । পণ্ডিতগণ বলেন,—যে মানব মহতের সেবা করে, সে পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে ।’

অতএব, মহতের কি অদ্ভুত চরিত্র ! কি অদ্ভুত মহিমা ! মহল্লোক সকলকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাহাদের নিকট আত্ম-পর বিচার নাই, শত্রু-মিত্র ভেদ নাই ; কুমুদবান্ধবের বিমল কৌমুদী, কি রাজ-রাজেশ্বরের সুধা-ধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্যাবলীতে, কি দরিদ্রের জীর্ণ-শীর্ণ পলালাবশেষ ভগ্ন পর্ণ-কুটীরে, সর্বত্র যেমন উদার ভাবে সুধার বর্ষণ করে, সুধাময় সুধাকরের সুধাবর্ষণে সমুদয় জগৎ আনন্দিত হয়, সেইরূপ মহল্লোকের সমদৃষ্টিসকলের প্রতি সমান-ভাৱে পতিত হয় । মহতের সেবা করিলে, সংসার-তাপতপ্ত জ্ঞানী-মানী-ধনী দরিদ্র সকলেরই মঙ্গল হইয়া থাকে ; কেন না, মহতের সেবা করিলে মহল্লোক উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন ; মহতের অমৃতময় উপদেশ বাণীর সুস্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়ী বিভায়, তাহাদের অন্ধকারময় হৃদয়-কন্দরে অজ্ঞান-তমোরাশি নাশ পাইয়া, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে হৃদয়ে স্তন্যনোদয় হইলে, ইহ-পরলোকে মানুষের পরম সুখোচ্ছ্রায় পরিবর্তিত হয় । অতএব, মহৎ-সঙ্গ জীবের সর্বমঙ্গল-বিধায়ক । মহল্লোকের এমন অসীম শক্তি আছে যে, তাহারা জগতের দুঃসাধ্যকে সুসাধ করিতে পারেন, বোবাকে কথা বলাইতে পারেন, পশুকে পথে চলাইতে পারেন, অন্ধকে রূপদর্শন করাইতে পারেন, বধিরকে শব্দ শুনাইতে পারেন ;—এমন কি, বনের পশুপক্ষীকেও ভগবন্তজনে নিরত করিতে পারেন । অহো !—

কান্তারভূমিরুহমৌলিনিবাসশীলাঃ ,

প্রায়ঃ পলায়নপরা জনবীক্ষণেন ।

কুজন্তি তেহপি হি শুকাঃ খলু রামনাম,

সঙ্গঃ স্বভাবপরিবর্তবিধৌ নিদানম্ ॥

সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার ।

কান্তার অর্থাৎ মহারণের বৃক্ষসকলের উচ্চ-শিখরে মানবের দুর্গম স্থানে নিবাসশীল পক্ষী, যে কি না মানবকে দেখিতে পাইলেই, পলায়নপর হয়, সেই পক্ষীও যাঁহার সমীপে নির্ভয়ে আসিয়া, স্বীয় জাতীয়তা ভুলিয়া, যাঁহার কৃপায় 'রাম নাম' কীর্তন করিয়া, মানব-দানব-দেবতাদিগেরও দুর্লভ মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে; সেই মহতের নিন্দা করিলে, মানবের শান্তিলাভের আর উপায় কোথায়? শ্রীমন্তাগবতে ঋষভদেব কহিয়াছেন,—

“মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিবমুক্তে—

স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্ ।

মহাস্তুস্তে সমচিন্তাঃ প্রশান্তাঃ

বিমন্তবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥”

শ্রীমন্তাগবত । ৫। ৫

‘মহতের সেবা মুক্তির দ্বার এবং যোষিৎসঙ্গীদিগের সঙ্গ সংসারের কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাঁহার সকলের সুহৃৎ, প্রশান্ত, অক্রোধ, সদাচারী এবং যাঁহার সর্বপ্রাণীকেই সমান দেখেন, তাঁহারাই মহৎ ।’ অহো ! মহতের চরিত্র কি পবিত্র ! মহতের স্বভাব কি উদার ! মহতের জীবন কি মহান ! মহাত্মারা আপন সুখ-শান্তি ভুলিয়া, এমন কি,—আপন কায়ার মায়া পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, নিঃস্বার্থভাবে সরলান্তঃকরণে,—পরের সুখের জন্য—পরের

জীবনের জন্ম, স্বীয় প্রিয় প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়া থাকেন । এমনভাবে সরলান্তঃকরণে—সরল-প্রাণে পরের জন্ম কে প্রাণ দিতে পারে ? মহাত্মা মুনিসত্তম মহদুত্তম দধীচি পারেন ; মহত্বের গৌরবে মহিমাম্বিত হইয়া, মহতের পরিচয় দিয়া, পরের নিমিত্ত স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন । তিনি মহত্বের বিত্তবে প্রভাবাম্বিত হইয়া, পরোপকারের নিমিত্ত ভাবিয়াছিলেন,—“ধনানি জীবিতকৈব পরার্থে প্রাপ্ত উৎসৃজেৎ । সন্নিমিত্তে বয়ং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥ ” যে কালে অপাপবিন্দু দেবারাধ্য স্বর্গলোকের দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণসহ বৃত্রাসুর কর্তৃক স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া, দেবরাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন ; স্বর্গরাজ্য হইতে দেবতার বিতাড়িত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, মুনিসত্তম মহদুত্তম দধীচির অশ্বিনী-নির্ম্মিত অস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রে বৃত্রাসুর নাশ হইবে না । তখন দেবরাজ সন্দিগ্ধ-হৃদয়ে দেবগণসহ মুনিসত্তম মহদুত্তম দধীচির নিকট উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ জানাইলে, মুনিবর অকুণ্ঠিত-চিত্তে পরোপকারার্থে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং মহত্বের পরিচয় দিয়া, আত্ম-জীবন দানে স্থির সঙ্কল্প করিয়া কহিলেন,—‘দেবরাজ !—“ মাভৈঃ । ” এই পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহের পঞ্জরাস্থি লোক-হিতার্থে, বিশেষতঃ দেবকার্য্যে নিয়োগ করা অপেক্ষা জীবের পক্ষে অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ? অতএব, আমি এক্ষণেই যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিতেছি, আপনার যাহা আবশ্যক, এই দেহ হইতে, তাহাই গ্রহণ করুন ।’ এই বলিয়া মুনিসত্তম মহদুত্তম দধীচি যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলেন । অতঃপর দেবরাজ, তাঁহার পবিত্র পঞ্জরাস্থি দ্বারা বজ্রাস্ত্র নির্মাণ করিয়া, সেই অস্ত্রাঘাতে প্রবল পরাক্রান্ত বৃত্রাসুরকে নিধন করিয়া, স্বর্গ-সিংহাসন অধিকারপূর্ব্বক, আবার নিকটকে স্বর্গরাজ্য পালন করিতে লাগিলেন ।

অতএব,—“পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ” মহতের প্রাণ পরের জগুই উৎসর্গীকৃত,—মহতের যাবতীয় বিভূতি পরের জগুই স্মৃষ্ট । অহো, মহতের কি অদ্ভুত পরোপকারিতা !—এমন ভাবে পরের তরে, আপন প্রাণ কে উৎসর্গ করিতে পারে ? যিনি পারেন, তিনিই ‘মহৎ ;’ —“স দেবো ন তু মানুষ্যঃ ।” বাস্তবিক, এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট, শোক-তাপ-সঙ্কুল, জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ,—বিপদ-আপদ-সমাকুল—সংসার-শ্মশান-প্রান্তরে, তাপতপ্ত জীবকে সংসার হইতে পরিত্রাণের সমাচার দিয়া, জীবকে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া, কে আর বল এমন উপকার করিয়া থাকেন ? তাই বলি,—ধন-জন-সম্পত্তি-গর্বিত মানব ! তুমি তুচ্ছ ধন-জন-সম্পত্তির মদ পানে উন্মত্ত হইয়া, মনে করিতেছ,—‘ধন-জন-সম্পত্তিহীন ধূলায় ধূসরিতাঙ্গ ভিক্ষুক, তাহার পদে মস্তক নত করিয়া, আপনার মান-সম্মানের অনাদর ? ইহা কিছুতেই করিতে পারিব না ।’ এরূপ ভাবা তোমার ভুল, মহাভুল ! —কেন না, আমাদের পরমারাধ্য ঋষিগণ বলিয়াছেন,—“সকল-ভুবনমধ্যে নিধনাস্চাতিথন্যাঃ, নিবসতি হৃদি যেষাং শ্রীহরে-র্ভক্তিরেকা ।” মহতের হৃদয়মধ্যে একমাত্র সর্ববরত্নের শিরোমণি হরিভক্তি বিরাজমান ; সুতরাং মহদ্যক্তি অখিলভুবনমধ্যে নিধন হইলেও তিনি অতিথন । কেন না,—“হরিরপি নিজলোকং সত্ত্বরং সংবিহায়, প্রবিশতি হৃদি যেষাং প্রেমসূত্রাপিনদ্ধঃ ॥” সেই সর্ববরত্নের আকর, অসাধ্য সাধনার ধন, অমূল্য রতন, ভগবান্ শ্রীহরি চির-সুখ-শান্তিময় নিজধাম পরিত্যাগপূর্বক, প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, তথাবিধ মহতের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন । অতএব, মহৎ কদাপি নিধন নহেন, মহৎ রাজার রাজা,—বিশ্ব-সম্রাটের প্রজা, তিনি কি তোমার ন্যায় তুচ্ছ ধনে ধনী ?—তোমার তুচ্ছ-ধন-গর্বিত চক্ষুর সামনে তিনি নিধন বটে ; কিন্তু, আত্ম-অহঙ্কার—আত্ম-গরিমা-বিবর্জিত চক্ষুস্বান্ মানবের চক্ষুর সমীপে, তিনি অতুল্য ধনের অধীশ্বর । কেন না,—

করে শ্লাঘ্যস্ত্যাগঃ শিরসি গুরুপাদপ্রণয়িতা,
 মুখে সত্যা বাণী বিজয়ি ভুজয়োর্বীৰ্য্যমতুলম্ ।
 হৃদি স্বস্থা বৃত্তিঃ শ্রুতমধিগতৈকব্রতফলং,
 বিনাপৈশ্বর্য্যেণ প্রকৃতিমহতাং মণ্ডনমিদম্ ॥

সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার ।

তাঁহার ঞ্চায় দাতা, জগতে কে আছেন ? তাঁহার দান-শৌণ্ডিকতা
 জগতে কে দেখাইতে পারেন ? তাঁহার হস্তে ত্যাগরূপ দান
 বিद्यমান, তাহা প্রশংসনীয় ; তাঁহার মস্তক গুরুপাদপদ্মরূপ মুকুটে
 শোভিত, তাহা সকলেরই প্রীতিপ্রদ ; তাঁহার বদনারবিন্দ সত্য
 বাণীতে ভূষিত, তাহা সুরাসুর মানব-দানব সকলেরই অতীপ্সিত ;
 তাঁহার ভুজদ্বয় ত্রৈলোক্য-বিজয়ি মুক্তি-রূপ কনকাজ্ঞদ-পরিশোভিত,
 তাহা সকলেরই অভিপ্রেত ; শ্রুতিশাস্ত্রাধিগত ব্রতফল-স্বরূপ
 সদ্ভূতিরাজি তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত হইয়া, তাঁহাকে শান্তি-সুখে
 রাখিয়াছেন । অতএব, বল দেখি,—এই সকল উৎকৃষ্ট ভূষণ অপেক্ষা
 তোমার নিকট এমন কি শ্রেষ্ঠ ভূষণ আছে যে, তাহার মোহে মোহিত
 হইয়া, তুমি রাজার রাজা, লৌকিক সম্রাটেরও সম্রাট্ মহদ্ব্যক্তিকে
 তুচ্ছাদপিতুচ্ছজ্ঞানে হেয় করিতে উদ্যত হইয়াছ ?—তোমার বিছা
 বা ধন অভিমানের মহান্ বোঝা—অহঙ্কারের বিশাল পর্বত !—শাস্ত্র
 বলিয়াছেন,—

“ বিছা বিবাদায় ধনং মদায়,

শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায় ।

খলস্র সাধোর্বিপরীতমেতজ্,—

জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায় ॥ ”

সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার ।

যাহারা খল-স্বভাব-সম্পন্ন, তাহারা যদি বিদ্বান্ হয়, তবে তাহাদের
 বিছা-শিক্ষা পরের সহিত বিবাদ করিবার নিমিত্ত জানিবে ; আর,

তাহারা যদি ধনবান্ হয়, তবে তাহাদের ধন-সঞ্চয় কেবল আত্ম-অহঙ্কার—আত্মাভিমানের জগু বুঝিতে হইবে । আর, তাহারা যদি শক্তি-সম্পন্ন হয়, তবে তাহার কথাই নাই, সে শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া, আপনাকে সর্বশক্তিমান্ ভাবিয়া, পরপীড়নে নিরত হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহাদের শক্তি কেবল পর-পীড়ন জগুই বুঝিতে হইবে । কিন্তু যদি সাধু-পুরুষ মহদ্যক্তি বিদ্বান্ হন, তবে তাহার বিদ্বাজ্জন জ্ঞানের নিমিত্ত ; যদি তিনি ধনবান্ হন, তাহার ধন-সঞ্চয় দানের নিমিত্ত ; আর, যদি তিনি শক্তিমান্ হন, তবে সে শক্তি জগতের—জীবের রক্ষার নিমিত্ত বুঝিতে হইবে । সুতরাং জানা গেল যে, সাধু-পুরুষ মহদ্যক্তির সহিত খল-স্বভাব দুর্জনের লোকের আচরণ সম্পূর্ণরূপে বিপরীত ।

অতএব, কদাপি সাধুনিন্দা করিও না, তাহারা সাধুনিন্দা করে, তাহাদের হৃদয় মরুভূমি-তুল্য, অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি উত্তপ্ত বালুকারাশিতে সদাই ধু—ধু করিতেছে । সর্বমঙ্গলবিধায়ক দৈত্যের স্তব্ধ সে হৃদয়ের পাশ দিয়াও ঘেঁসে না,—নিষ্কণ্ঠতার চন্দনতরু, সে হৃদয়ে কলনায়ও আসে না,—বিশ্বাসের পুত প্রস্রবণ—প্রেমের বিমল মন্দাকিনী—ভক্তির স্বচ্ছ গঙ্গাস্রোত ভ্রমেও সে পথে বহে না ; শান্তির স্বর্গীয় সুসমা সে হৃদয়ের শত যোজন মধ্যেও রহে না,—ঐ শ্রেণীর ব্যর্থ বাগাড়ম্বর হইতে নিস্তার পাইলেই, ভগবন্তুক্ত, সুস্থ হন । যে স্থান সাধুনিন্দা-রূপ পাশ-ভয়ে কলুষিত, সে স্থান ভগবন্তুক্তের কাছে শাসন-সদৃশ । ভগবন্তুক্ত, সদা সাধু-সঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গে নাম-কীর্তন-রঙ্গে সময় কাটাইতে ভালবাসেন, সাধু-নিন্দা তিনি ভাল বাসেন না । সাধু-নিন্দা-রূপ গরল-লেপ জিহ্বায় লাগিলে, জিহ্বা জলিয়া পুড়িয়া অসাড় হইয়া যায়, তখন আর তাহা সহজে 'হরিনাম-সুখাস্বাদ' গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না ; সুতরাং কেবলমাত্র সাধু-নিন্দা দ্বারা প্রকারান্তরে সুখা-ভোগেই বাধা পড়ে । এই জগুই

ভগবন্তত্ত্বের সাধু-নিন্দা—পর-নিন্দা হইতে দূরে অবস্থান করেন, এবং কেহ নিন্দা করিলে, তৎপ্রতি ক্রক্ষেপও করেন না, আপনমনে হরিনাম-গুণ-গানে সদা মত্ত থাকেন।

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তবন্তু,
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অষ্টৈব বা মরণমন্তু যুগান্তরে বা,
ত্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥
ভর্তৃহরি।

নীতি-নিপুণ মানবগণ, তাঁহাদের নিন্দাই করুক অথবা তাঁহাদের হৃদয় আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত স্তুতিবাদই করুক, ধনাদির সমাগম হউক অথবা ধন-বিস্ত স্তুতৈশ্বর্য্য যথেষ্ট গমনই করুক, অথ মৃত্যু হউক অথবা যুগান্তরেই মৃত্যু হউক ; তাঁহারা সে বিষয়ে ক্রক্ষেপই করেন না, ভক্তি-পথে থাকিয়া, সদা হরিনাম কীর্তনে মত্ত হইয়া অণুকোনও বিষয়ের চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দেন না। তাঁহারা ঐ সকলের অন্তরালে থাকিয়া, হরিনামামৃত-পানে মত্ত হইয়া, অটল অচলভাবে স্থিত হইয়া, অহর্নিশ হরিকথায় জীবন যাপন করেন।

অতএব, এমন পরলোকের পরম মিত্র, ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র অমূল্য রতন ভগবন্তত্ত্ব সাধুজনের নিন্দা করিলে, ভগবান্ সহিবেন কি প্রকারে ?—সুতরাং কদাপি সাধুনিন্দা করিও না এবং শুনিও না ; কেন না, সাধু-নিন্দা সাধনের পরম শত্রু। প্রথমতঃ পরনিন্দাই কুর্কম, তাহার পর আবার সাধু-নিন্দা, সে ত অপকর্ম্মের অগ্রগণ্য। যাহারা বাক্যের সংঘর্ষে অক্ষম, তাহাদের সিদ্ধির আশা খুবই কম। নিন্দার মূলে নরকের দৃশ্য,—প্রায়ই সেখানে হিংসা-ক্রোধ, ঈর্ষ্যা-দ্বেষ্টা পূরীষ, আত্মাভিমানের পূতিগন্ধ, আত্মস্তরিতার বীভৎস ব্যাপার এবং নীচতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন হইয়া থাকে। অতএব, যত্ন-সহকারে পরনিন্দা—সাধু-নিন্দা পরিত্যাগ করিয়া, সদা ভগবন্নাম কীর্তনে নিরত

[৪র্থ খণ্ড]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

২৩

থাকিবে । যিনি সংসারের যাবতীয় বস্তুর আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, নাম ঝাঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন,—নাম যাঁহার সর্বস্ব ধন, নামই যাঁহার চির-অবলম্বন, তাঁহাকে নিন্দা করিলে, সে নিন্দা নামেই পৌঁছে । কারণ ? দেবর্ষি নারদ বলেন,—

“তস্মিন্ তজ্জনে ভেদাভাবাৎ ।”

নারদসূত্র ।৫।৮

‘ভগবানে ও ভগবদনুগত সদা নাম-কীৰ্ত্তনে নিরত ভক্ত-জনে প্রভেদ নাই । উভয়েই সহধর্ম, উভয়েরই সহকর্ম, উভয়ের অভেদাত্ম্য অবিচল সখ্যতা ; সুতরাং ভগবান্ ও ভগবদ্বক্ত উভয়ে অভেদ—অভিন্ন । ভগবান্ ও ভগবন্নাম-কীৰ্ত্তনে সদা নিরতচিত্ত ভগবদ্বক্তজন—এই দুইই এক, একই দুই ।’ তাঁহার নিন্দা করা ত অপরাধই, তাহাতে আবার, তাঁহার নিন্দা শুনিলেও পাপী হইতে হয় । ভগবানের নিন্দা কিম্বা ভগবানের নাম, গুণ, লীলাদিতে অনুরক্ত-চিত্ত ভক্তের নিন্দা শুনিয়া যে ব্যক্তি সে স্থান পরিত্যাগ না করে, সেও অধোগতি প্রাপ্ত হয় । অতএব নিন্দাকারী যে নরকে যায়, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? নিন্দার ফলে নিন্দক নিজেই আপন অধঃপাতের পথ পরিষ্কার করিয়া নিজেই নিম্নগামী হয় । আর, নিন্দিত নাম-সাধক শত অপরাধ করিয়াও মাত্র নামের বলে, গোলোকের পথ পরিষ্কার করিয়া, অন্তিমে গোলোকের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন । কেন না, পরম ভাগবত বলিরাজা কহিয়াছেন,—

“জিহ্বাশ্রে বর্ততে যশ্চ হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ।

বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃন্তিবর্জিতঃ ॥

গোবিন্দেতি সদা ধ্যায়ৈদ্যন্ত রাগাদিবর্জিতঃ ।

স যাতি বিষ্ণুভবনমিতি প্রাহুর্শ্রনীষিণঃ ।”

বৃহন্নারদপুরাণ । ১১

‘যে ব্যক্তি রসনাগ্রে ‘হরি’ এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করে, সে বিষ্ণু-লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; পুনরায় তাহাকে মর্ত্যলোকে নামিয়া আসিয়া, জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না । ‘মনীষিগণ বলিয়াছেন,—‘যে মানব রাগাদিশূন্য হইয়া, সতত ‘গোবিন্দ’ এই নাম স্মরণ ও কীর্তন করে, সে প্রদীপ্ত অপাপবিন্ধ দেবারাধ্য বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে ।’ অর্থাৎ যে ব্যক্তি সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, ভগবান্ শ্রীহরির নাম কীর্তনে নিরত হইয়াছেন, তিনি নিন্দা-স্তুতি উভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া, আপনাকে সংসার হইতে নিস্তার করিতে পারিয়াছেন। কারণ, হরিনাম কীর্তন করিলে, ভগবান্ শ্রীহরি নাম-কীর্তন-নিরত ভক্তের পাপরাশি নাশ করিয়া, অভয় দানে তাঁহাকে দুরন্ত কৃতান্তের শাসনদণ্ড দুর্ব্বিসহ নরকানল হইতে প্রাণে বাঁচাইয়া, তাঁহার পরম সহায় হইয়া, মুক্তিপথের উপায় দেখাইয়া, তাঁহাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া কৰ্ম-বেষ্টনী ভেদ করিয়া, তাঁহার মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া,—‘সার্বত্রিহস্তপরিমিত গণ্ডী’ পার করিয়া, চরম-সুখ চির-শান্তি স্থায়ী-আনন্দের লীলা-নিকেতন প্রদীপ্ত গোলোকধামে লইয়া যান। অতএব, ইহলোকে যাঁহাদের—

বাঙ্গা সজ্জনসঙ্গমে পরগুণে প্রীতি গুরৌ নম্রতা,
বিচায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতির্লোকাপবাদান্তয়ম্ ।
ভক্তিঃ শূলিনি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে—
ষেতে যেষু বসন্তি নির্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ ।

সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার ।

বাসনা সতত সজ্জন-সঙ্গমে নিরত থাকে ; পরনিন্দা পরিত্যাগ করিয়া, যাঁহারা সতত পরগুণ কীর্তনে প্রীতি স্থাপন করেন গুরুজনের নিকট সর্বদা নম্রভাবে থাকিয়া, নম্রতার সহিত তাঁহাদের সহিত কথা কহিয়া, নম্রভাবে তাঁহাদের সেবায় নিরত থাকেন যাঁহারা বিড়ালভাষে ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া, সতত জ্ঞানার্জন করেন।

[৪র্থ খণ্ড]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

২৫

যাঁহারা পরদার পরিত্যাগ করিয়া, স্বদারে গমন করেন ; যাঁহারা লোকাপবাদকে সতত ভয় করিয়া, বাহাতে লোকাপবাদ শুনিতে না হয়, এমন কার্য্য করেন ; যাঁহারা হরি-হরে ভক্তি স্থাপন করিয়া, অহর্নিশ তাঁহাদের নাম কীর্ত্তনে নিরত থাকেন ; যাঁহারা শরীরস্থ দুর্জয় কাম-ক্ৰোধাদি রিপু ও দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিতে আত্মশক্তি নিয়োগ করেন এবং দুর্জন-সংসর্গ হইতে সদা দূরে থাকিয়া, দুর্জন-সঙ্গ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন ; যে সকল নিশ্চল-মতি পুরুষ সকলে, এই নিশ্চল গুণরাশি বিত্তমান, তাঁহারা এই নরাবাস ধরাধামে নরাকারে পরমদেবতা ; অতএব, তাঁহাদিগকে নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার !

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

হরি ও হর ভেদজ্ঞান ।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপমি পূর্বের বলিয়াছেন যে,—
‘মঙ্গলময় ভগবান্ শ্রীহরিতে ও মঙ্গলময় ভগবান্ শ্রীহরে ভেদ-ভাব
স্থাপন করা, নাম কীর্তনের দ্বিতীয় অপরাধ।’ কিন্তু, বৈষ্ণব-সমাজে
যাঁহারা আদর্শ-রূপে বিরাজমান, তাঁহারা শিবকে দেখিলে,
নাসিকা কুঞ্জন করেন বা শিবভক্তকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন কেন?
তাহাতে কি তাঁহাদের অপরাধ হয় ?

হরিরূপধরং লিঙ্গং লিঙ্গরূপধরো হরিঃ

ঈষদপ্যন্তরং নাস্তি ভেদকৃৎ পাপমশ্রুতে ।

অনাদিনিধনে দেবে হরিশঙ্করসংজ্ঞাতে

অজ্ঞানসাগরে মগ্না ভেদং কুর্বন্তি পাপিনঃ ।

বৃহন্নারদপুরাণ । ৬

নিশ্চয়ই তাহাতে তাঁহাদের অপরাধ হয় । কেন না, কলিপাবন
পরমবৈষ্ণব মহাজ্ঞানী দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—‘হর—হরি-
রূপধারী, হরি—হর-রূপধারী ; সুতরাং এতদুভয়ের কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ
নাই । হরি ও হর—এই নামদ্বয়ের প্রকৃতি “হ্” ধাতু হইতে উৎপন্ন,
কেবলমাত্র ‘ই’ ও ‘অ’ প্রত্যয়ের ভেদেই দুইটি পৃথক্ রূপ অর্থাৎ ‘হরি’
ও ‘হর’ ঘটিয়াছে । অর্থাৎ—‘হ্’ ধাতুর উত্তর ‘ই’ প্রত্যয় করিলে, ‘হরি’
এই পদ নিষ্পন্ন হয় এবং ‘হ্’ ধাতুর উত্তর ‘অ’ প্রত্যয় করিলে, ‘হর’ এই
শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । ‘হ্’ ধাতুর অর্থ হরণ ; সুতরাং ‘হরি’ ও ‘হর’
উভয় শব্দের অর্থ এক । সাধকের ভাব-ভেদে—রুচি-ভেদে সাধনীয়
দেবতার ভেদ হয় । মূলে কিন্তু একই । সেই—“একমেবাদ্বিতীয়ম্”
সচ্চিদানন্দময় পরিপূর্ণ ভগবান্‌ই নানাভাবে, নানানামে, নানাকারে,
নানাধারে প্রকাশ পান । সাধকের যাঁহার ষেরূপ অভিরুচি, তিনি

তদনুসারে তাঁহাকে নানা-আকারে, নানা-প্রকারে ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত, সতত চেষ্টা করিতেছেন । অতএব, সর্বদেবময় ভগবান্ শ্রীহরি, কোন দেবতা হইতে যথার্থতঃ ভিন্ন নহেন । হরিও যাঁহার নাম, হরও তাঁহারই নাম ; স্তবরাং হরি-হর অভিন্ন । যে ব্যক্তি ভেদজ্ঞান করে, সে পাপগ্রস্ত হয় । অনাদি-নিধন হরি-হর দেবতা-বিষয়ে ভেদ-বুদ্ধি অজ্ঞান-সাগরে মগ্ন পাপী লোকেই করিয়া থাকে । যে দেব ত্রিজগতের পতি, অবিনাশী ও কারণ-সমুদয়ের কারণ, প্রলয়-কালে তিনিই রুদ্র-মূর্তি ধরিয়া, রুদ্র-তাণ্ডবে অখিল-জগৎ সংহার করেন ; রুদ্র বিষ্ণু-রূপে পালন করেন ; বিষ্ণু ব্রহ্মা-রূপে সৃজন করেন ; আবার, স্বয়ং তাহা সংহার করেন । অতএব,—

হরিশঙ্করয়োর্মধ্যে ব্রহ্মণশ্চাপি যো নরঃ ।

ভেদকৃন্নরকং ভুঙ্ক্তে যাবদাচন্দ্রতারকম্ ॥

হরং হরিং বিধাতারং যঃ পশ্যেদেকরূপিণম্ ।

স যাতি পরমানন্দং শাস্ত্রাণামেষ নির্ণয়ঃ ॥

বৃহন্নারদপুরাণ । ৬

‘যে ব্যক্তি এই হরি-হর-বিরিঞ্চি-বিষয়ে ভেদ-জ্ঞান করে, সে যাবৎ চন্দ্র তারা বিচ্যমান, তাবৎ নরক ভোগ করে । হরি, হর ও বিধাতাকে যে ব্যক্তি অভিন্নভাবে দেখে, সে পরমানন্দ লাভ করে;— ইহাই সর্ব-শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত ।’

অতএব, হরি ও হরের অভেদে অবিশ্বাস হইলে, সর্বনাশেরই পথ পরিষ্কার হয় । কেন না, হরি ও হরের ভেদ-বুদ্ধি থাকিলে, কেবল পাপের বুদ্ধি হয় । সংসারের সকল দোষের মূলে ভেদজ্ঞান রিণ্যমান । দর্শন-শাস্ত্রকার বলেন,—‘ভেদ-দর্শন অজ্ঞানেরই কার্য ।’ সেই জন্ত, জ্ঞানী বৈষ্ণব মহাজন বলিয়াছেন,—“হরিহরয়োর্ভেদং পশ্যতি কশ্চিন্মূঢ়ো বিনাশাস্ত্রমুভয়োঃ প্রকৃতিস্বেকা প্রত্যয়ভেদাস্তিন্নবদ্ব্যতি ।” অর্থাৎ কোন কোন মুঢ়জন শাস্ত্রের মর্ম্ম না জানিয়া, হরি-হরের ভেদ-দর্শন করে । কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে হরি ও হরের একই প্রকৃতি অর্থাৎ

একই পরম-তত্ত্ব, একভাবে হরি ও অণ্ডভাবে হর । সাধকের প্রত্যয়, ভাবানুবন্ধ বা গুণাশ্রয়ের ভেদে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হন । সুতরাং যাহারা তত্বভয়ে ভেদজ্ঞান করেন, তাঁহারা কদাপি বৈষ্ণবত্ব লাভ করিতে পারেন না ; কেন না, যথায় অজ্ঞান-রূপ তমসচ্ছন্ন, তথায় জ্ঞানালোকের বিকাশ হয় কি ? যাহাদের হৃদয়ে ভেদভাব বিद्यমান, তাহাদের হৃদয়ে ভক্তির স্থান কোথায় ?—আর, প্রেমের বিমলালোকে যে হৃদয় আলোকিত, সে হৃদয়ে ভেদজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞান থাকিতে পারে না,—প্রকৃত ভগবন্তক্তের হৃদয়ে ভেদজ্ঞান নাই ; কেন না, ভক্তির উদয় হইলে, অজ্ঞান তিষ্ঠিতে পারে না । যে হৃদয় ভেদজ্ঞানের আবাসভূমি, ভগবান্ তাহা হইতে “দূরাৎ সুদূরে” সরিয়া যান ; আর, প্রকৃত ভক্তের হৃদয় ভেদজ্ঞান-রহিত, অভেদ-ভাব-বিকশিত, সেই জগৎ ভগবান্—“তদিহাস্তিকে চ” তাঁহার সর্বদিকে ও দিগন্তুরালে—এমন কি, সে ভক্তকে ছাড়িয়া, তিনি ক্ষণকাল কোথাও তিষ্ঠিতে পারেন না, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বিচরণ করেন । অতএব, হরি-হরে ভেদভাব ও ভেদজ্ঞানকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, অতিদূরে নিক্ষেপ করিবে ; কেন না, ভেদজ্ঞানীকে ভগবান্ বড় ঘৃণা করেন । ভাবিবে,—ভগবান্ শ্রীহরিতে, ভগবান্ হর অধিষ্ঠিত এবং ভগবান্ হরে ভগবান্ শ্রীহরি প্রতিষ্ঠিত,—উভয়ে ওতঃপ্রোতভাবে এক হইয়া অবস্থিত ;—“গান্ধ্যামুনযোগেন তুল্যং হারিহরং বপুঃ ।” এ নিত্য সম্বন্ধ, এ হরি-হর-মিলন ভাবুকের কাছে—ভক্তের কাছে—সাধকের কাছে কত সুন্দর, কত মনোহর ও কত মধুর !—তাহা বুঝাইবার নয় ; শুধু নিজেই বুঝিবার জিনিষ । এই অভিন্ন, অবিচ্ছিন্ন নিত্যযুগলে, যাহাদের চিত্ত তৃপ্ত নয়, কেবল ভেদদর্শনেই লিপ্ত, তাহাদের দুর্ভাগ্যের সীমা নাই ভাবিলে, অন্তরাঙ্গা চমকিয়া উঠে । ভগবান্ হরি—হর-রূপ-ধারী ; আর, ভগবান্ হর—হরি-রূপধারী—এতদুয়ের কিঞ্চিদ্ভিন্ন প্রভেদ নাই ; এইরূপ হরি ও হরের অভেদই বৈষ্ণব-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত ।

[৪র্থ খণ্ড]

তৃতীয় পবিচ্ছেদ ।

২৫

যে সকল অভক্ত অভাজন ভাবে—‘হর,—হরিভক্ত ; আর, হস্তি
 লীলাকারী ভগবান্ জগন্নিয়ন্তা,—এই দুই কি কখন এক হইতে
 পারে ?’ তাহারা বুঝিয়া রাখুক, হরিতে হরের এবং হরেই হরির
 বিকাশ ; আর, হরেই হরির বিলাস,—এই হরি-হর মিলন যাহারা
 দিব্যচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা হরি-হরের স্তুতি করিয়াছেন । একদা
 দেবগণ ভগবান্ কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘হে কেশব !
 মহাদেব কোথায় বিরাজ করিতেছেন ? আমরা ক্ষীরাদি স্নানোপকরণে
 তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সমাধা করিব ।’ বিষ্ণু তদুত্তরে দেবগণকে
 কহিলেন,—‘মহাদেব আমার দেহে বিরাজমান ; তিনি যোগবলে
 মদীয় দেহে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাকে দেখিতে
 পাইতেছ না ?’ দেবগণ বলিলেন,—‘আমরা ত্রিপুর-হস্তাকে দেখিতে
 পাইতেছি না । হে সুরেশ ! সত্য করিয়া বলুন, মহেশ্বর কোথায়
 রহিয়াছেন ।’ তখন অব্যয় পুরুষ ভগবান্ শ্রীহরি স্বীয় হৃৎ-পঙ্কজশায়ী
 ঐশান-লিঙ্গ দর্শন করাইলেন । অমরার অমরগণ তখন যথাক্রমে উত্তম
 ক্ষীরাদি দ্বারা সেই শাখত অবিচল ক্ষয়োদয়হীন ঐশ্বরলিঙ্গ স্নান
 করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহারা প্রথমে গোরোচনা ও সুরভি
 চন্দনে লিপ্ত করিয়া, অনন্তর বিষ্ণু-পত্র ও পদ্ম দ্বারা ভগবান্ লিঙ্গ-রূপ-
 ধর হরের পূজা করিতে লাগিলেন । অতঃপর ভক্তিভরে ধূপ ও দিব্য
 ওষধি সকল নিবেদন করিয়া, তদীয় অষ্টোত্তরশত নাম জপ ও
 প্রণিপাত করিলেন । দেবগণ এইরূপে তাঁহার পূজাদি করিলে, সেই
 সঙ্ঘ ও তমোগুণসম্পন্ন হরি-হর পরস্পর কি এক অদ্ভুত, অথচ, সৌম্য
 শান্ত মূর্তি ধারণ করিলেন । তাঁহার ঐ মূর্তি সর্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন,
 সর্ববায়ুধযুত ও অব্যয় ; তাঁহার দেহ—ত্রিনয়ন, কুণ্ডল, জটা, গুড়াকেশ,
 গরুড়, বৃষভ, এবং হার ও ভূজঙ্গ দ্বারা ভূষিত ; কটিদেশ শীতবসন ও
 অজিনে সমাচ্ছন্ন । তদীয় হস্তে চক্র, অসি, হল, শাস্ত্র, পিনাক, শূল,
 আজগব ধনু, কপর্দ, খট্টিঙ্গ, কপাল, ঘণ্টা ও শঙ্খ বিরাজমান ।

৩৩

সুগম সাধন-পন্থা।

দৃষ্টেব দেবা হরিশঙ্করং তং,
নমোহস্ত তে সর্বগতাব্যেতি ।
প্রোক্ত প্রণামঃ কমলাসনাচ্চা—
শচক্রমতিথৈকতরাং নিযুজ্য ॥

বামনপুরাণ । ৬২

দেবগণ সেই হরি-হর মূর্তি দর্শন করিয়া কহিলেন,—‘হে অব্যয় পুরুষ ! তোমাকে আমরা নমস্কার করি ।’ এই বলিয়া, কমলাসন সহ সকলেই প্রণত হইলেন। তাঁহাদিগের চিত্ত তৎকালে হরি-হরে একনিষ্ঠ হইল, দেবেশ শ্রীহরি তাঁহাদিগের চিত্তের একাগ্রতা জানিতে পারিয়া, সত্ত্বর তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, স্বীয়াশ্রমে গমন করিলেন ।

ফলতঃ এই একত্ব সিদ্ধান্তে যাঁহারা পৌঁছিতে পারেন নাই, তাঁহারা সর্বদা গৌপীচন্দন মণ্ডিত করিয়া, দুৰ্ব্বাহ তুলিয়া, হরিনাম-সঙ্কীৰ্তনে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদুন, উদাম-ভাণ্ডবে নাচুন অথবা ভক্তিবরে উচ্চৈঃস্বরে গুণগান করুন ; সে ক্রন্দন-নর্তন-কীৰ্তন ভ্রমে যত্নহতির ন্যায় নিষ্ফল। যে কীৰ্তনে,—যে নর্তনে,—যে ক্রন্দনে হরি-হরে ভেদজ্ঞান বিद्यমান, হরের প্রতি বিশ্বাস নাই, সে ক্রন্দনের,—সে নর্তনের,—সে কীৰ্তনের প্রাণ নাই। সে ক্রন্দন,—সে নর্তন,—সে কীৰ্তন কখনই ভগবান্ শ্রীহরির কাণে পৌঁছে না,—আকাশ-গহবরে বায়ুর সাগরে মিশিয়া যায়। একদা ভগবান্ শঙ্করের মনে সংশয় উপস্থিত হইল, তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—‘বিধাতা ব্রহ্মা, আমার অংশ কিরূপে ? এই অগ্রবর্তী বিধাতা, প্রত্যক্ষই আমা হইতে ভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হইতেছে ; সুতরাং এ কি, কখন আমার অংশ হইতে পারে ? যাহাই হউক, একবার ভগবান্ শ্রীহরিকে জিজ্ঞাসা করি, ইনি কি বলেন, দেখা যাউক ।’ এই বলিয়া, শঙ্কর ভগবান্ শ্রীহরির নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন ভগবান্ গুরুডম্বজ—মহাদেবের সন্তোষ সাধনকরতঃ হাস্য করিয়া কহিলেন;—

[৪র্থ খণ্ড]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

৩১

“ন ব্রহ্মা ভবতোভিন্নো ন শাস্ত্রব্রহ্মণস্তথা ।
 ন চাহং যুবয়োভিন্নোহভিন্নত্বং সদায়তনম্ ॥
 প্রধানস্তাপ্রধানস্তা ভাগাভাগস্বরূপিণঃ ।
 জ্যোতিষ্ময়স্তা ভাগো মে যুবামেকোহহমংশকঃ ।
 কত্বং কেহিহক কো ব্রহ্মা মমৈব পরমাত্মনঃ ॥
 অংশত্রয়মিদং ভিন্নং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ ॥
 চিস্তয় স্বাত্মনাত্মানং সংস্তুবং কুরু চাত্মনি ।
 একত্বং ব্রহ্মবৈকুণ্ঠশাস্ত্রনাং হৃদগতং কুরু ॥
 শিরোগ্রীবাদিভেদেন যথৈকশ্চৈব ধর্ম্মিণঃ ।
 অঙ্গানি মে তথৈকশ্চ ভাগত্রয়মিদং হর ॥”

কালিকাপুরাণ । ১১

‘হে হর ! ব্রহ্মা তোমা হইতে ভিন্ন নহেন,—তুমিও ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন নহ,—আমিও তোমাদের উভয় হইতে ভিন্ন নহি; আমরাদিগের তিনের আত্মা চিরদিন অভিন্ন । প্রধান—অপ্রধান, খণ্ড—অখণ্ড ও সাকার-জ্যোতিষ্ময়-নিরাকার-স্বরূপে অবস্থিত আমারই দুইভাগ তোমরা দুইজন; আর, আমি একভাগ । তুমিই বা কে ? আমিই বা কে ? আর ব্রহ্মাই বা কে ?—পরমাত্ম-স্বরূপী আমারই এই বিভিন্ন তিন অংশ; এই অখণ্ড-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের সৃষ্টির নিমিত্ত আমিই ব্রহ্মা-রূপে সৃষ্টি করিয়াছি; বিষ্ণু-রূপ ধারণ করিয়া, চরাচরকে পালন করিতেছি, অস্তে প্রলয়-কালে আবার, রুদ্র-রূপ ধারণ করিয়া, চরাচর সংহার করিব; স্তবরাং আমারই এই বিভিন্ন তিন অংশ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ বলিয়া জানিবে । তুমি মহাযোগী মহেশ্বর, তুমি আপন মনে সমাধিস্থ হইয়া, আত্মচিন্তা কর,—মনে কর, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত; আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্ন ভাব হৃদয়ে গাঢ় প্রতিষ্ঠা কর । হে হর ! যেমন এক ব্যক্তিরই মস্তক ও গ্রীবাদি ভেদে অনেক অঙ্গ; সেইরূপ আমারও ব্রহ্মা, বিষ্ণু

মহেশ্বর,—এই তিন অংশ বা অঙ্গ বলিয়া জানিবে ; তোমরা দুইজন আমাতেই অবস্থিত আছ, তোমরা আমা হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক নহ ।

“ষড্জ্যোতিরিত্র্যং স্বপরাপ্রকাশং,

কূটস্থমব্যক্তমনস্তরূপম্

নিত্যঞ্চ দীর্ঘাদি বিশেষণাচ্চৈ—

হীনং পরং তচ্চ বয়ং ন ভিন্নাঃ ॥”

কালিকাপুরাণ । ১১

যে আত্মা স্বপ্রকাশক, কূটস্থ, অব্যক্ত, অনন্ত, নিত্য, দীর্ঘ-ঐশ্বাদি বিশেষণ-বর্জিত, পরাংপর পরম জ্যোতিঃ পরব্রহ্ম,—তাহাই আমরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-রূপে তিনজন অভিন্ন ; সুতরাং আমরা ভিন্ন নহি ।’ দেবাদিদেব মহাদেব, ভগবান্ গুরুভূষাজের এই কথা শুনিয়া, বিমোহিত হইলেন ; তিনি এই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নতা অবগত থাকিলেও, অগ্ৰ চিন্তায় তাহা বিস্মৃত হওয়াতে, বিভিন্ন-রূপে প্রতীয়মান ত্রিমূর্তির বিভিন্নতা এবং একরূপ দেবত্রয়ের বিশেষণ-ভেদের কথা স বিশেষ কহিয়া, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ, শঙ্করকে দেবত্রয়ের অভিন্নতা—একত্ব ভাব প্রদর্শন করিলেন । অতএব, ভক্তিতরে করযোড়ে বল,—

“রজো জুষে জগ্মনি সত্ত্ববৃত্তয়ে,

স্থিতৌ প্রজানাং প্রলয়ে তমঃস্পৃশে ।

অজায় সর্গস্থিতিনাশহেতবে,

ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মনে নমঃ ॥”

পরাংপর সচ্চিদানন্দময় অনাদি অনন্ত সর্বজীবের প্রভু ভগবান্ নারায়ণই—এই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি ত্রিভাগে বিভক্ত হইয়া, স্বয়ং তিন শরীরে বিরাজ করিতেছেন । এক, অধিতীয় পরমেশ্বরই বিশেষ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার—এই তিন কার্য্য করাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—এইরূপে পৃথক পৃথক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন । অতএব,—

[৪র্থ খণ্ড]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

৩৩

“যঃ শিবঃ স হরিঃ প্রোক্তঃ যো হরিঃ স হরঃ স্মৃতঃ।” যিনি শিব, তিনিই হরি, যিনি হরি, তিনিই হর, হরি-হরে ভেদ নাই। স্মৃতরাং, যিনি হরিভক্ত, তিনি যদি হরি হইতে হরকে ভিন্ন ভাবেন, তবে তিনি হরির কাছেও অপরাধী হইবেন এবং যিনি শিবভক্ত, তিনি যদি শিব হইতে হরিকে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে, তিনিও শিবের নিকট অপরাধী হইবেন ; সংশয় নাই। সাধক মাত্রকেই এই অভিন্ন ভাব হৃদয়ে স্বর্ণাকরে অঙ্কিত করিয়া, ভাবিতে হইবে যে,—

শিব এব হরিঃ সাক্ষাদ্রিরেব শিবঃ স্বয়ম্।

তয়োরন্তরকৃৎবাতি নরকান্ কোটিকোটিশঃ ॥

বৃহন্নারদপুরাণ । ১৪

ভগবান্ শিবই সাক্ষাৎ বিষ্ণু, ভগবান্ বিষ্ণুই সাক্ষাৎ শিব;—
এতদুভয়ের ভেদবুদ্ধি যে করে, সে কোটি কোটির নরকে গমন করে। অতএব, হরি-হরে কদাপি ভেদজ্ঞান করিও না,—অভেদজ্ঞানে তদুভয়কে ভক্তি করিবে। তদুভয়ে ভেদজ্ঞান করিলে, নামাপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। অতএব,—

যে কীর্ত্তয়ন্তি মনুজাঃ পরমেশ্বরন্ত,

মাহাত্ম্যমেতদথ কর্ণপুটেঃ পিবন্তি।

তে জন্মকোটিকৃতপাপগণৈর্বিমুক্তাঃ,

শান্তাঃ প্রয়ান্তি পরমং পদমিন্দুমৌলেঃ ॥

স্কন্দপুরাণ । ব্রহ্ম — উঃ । ২১

যে সকল মানব, পরমেশ্বর হরি-হরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও কর্ণে শ্রবণ করে, তাহারা কোটিজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, অন্তিমে শিখিমৌলি ও চন্দ্রমৌলি হরি-হরের পদ লাভ করিয়া থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

গুরুর প্রতি অবজ্ঞা

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি পূর্বের বলিয়াছেন যে,—‘তৃতীয় নামাপরাধ—গুরুর প্রতি অবজ্ঞা করা; সুতরাং গুরু ভগবানের প্রতিকূপ ভাবিয়া, ভক্তিভাবে গুরুর পূজা করিবে।’ সত্য কথা; কিন্তু, আজকাল বাঁহারা গুরুগিরি করেন, তাঁহাদিগকে ভক্তি করা ত দূরের কথা, বিশ্বাস করিতেও সাহস হয় না; বিশেষতঃ কুলগুরু যদি বয়ঃকনিষ্ঠ বা মূর্থ হয়; তবে কি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলে অপরাধ হইবে?

বালস্ত বা বিষয়ভোগরতস্ত বাপি,
মূর্থস্ত সেবকজনস্ত গৃহস্থিতস্ত ।
এতদগুরোঃ কিমপি নৈব ন চিন্তনীয়ং,
রত্নং কথং ত্যজতি কোহপ্যশুচৌ প্রবিন্দম্ ॥
নৈবাত্র কাব্যগুণ এব তু চিন্তনীয়ো—
গ্রাহঃ পরং গুণবতা খলু সার এব ।
সিন্দূরচিত্ররহিতা ভুবি রূপশূচ্য,
পারং ন কিং নয়তি নোরিহ গন্তকামান্ ॥

অবধূত গীতা । ২

ইনি বালক, বিষয়-ভোগে রত, মূর্থ, সেবক-জন বা গৃহস্থ, গুরুর সম্বন্ধে এই প্রকার বিচার বা চিন্তা করিতে নাই; অশুদ্ধ অপবিত্র স্থানে পতিত রত্নকে কোন্ ব্যক্তি ত্যাগ করিয়া থাকে? গুরুর সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য-গুণ কি কোন প্রকার দোষ বিচার করিতে নাই, গুণবান ব্যক্তির সারই গ্রহণ করিয়া থাকেন; দেখ,—সিন্দূর-চিত্র-রহিত কুরূপ নৌকা কি পরপার-গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে পারে লইয়া যায় না? গুরু যেমনই হউন, তাঁহার প্রতি ভক্তি করিবে, শ্রদ্ধা করিবে, বিশ্বাস

[৪র্থ খণ্ড]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

৩৫

করিবে; কেন না, গুরুকে অবজ্ঞা করিলে, নামাপরাধ ঘটে। বিশেষতঃ সাধন ও গুরু-কৃপা,—এই দুইটিই ভগবৎ-সন্নিকর্ষ-লাভে প্রয়োজন হইয়া থাকে; গুরু কৃপা করিয়া, ভগবন্তের প্রবেশাধিকার দান না করিলে, ভগবন্তের স্মৃতি হয় না। সাধন-পথ স্বভারতই দুর্গম; সুতরাং সঙ্গ পথ-প্রদর্শক চাই। সংসার-কুহেলিকার অন্ধকারময় পথে যখন প্রতিপদে সাধকের পদ-স্থলন ঘটিবে, সেই সময় কাহার স্নেহ-কোমল হস্ত তাকে ধরিয়া রাখিবে? যখন ভগবানের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মোহিনী মায়া আসিয়া, সাধকে সাধন-পথ হইতে বিচ্যুত করিবার নিমিত্ত, সাধকের সর্বনাশের আয়োজন করিবে, তখন কে তাহার নয়নের মায়া-আবরণ ফুটাইয়া, মায়াভেদী দিব্যদৃষ্টি দান করিয়া, মায়ার বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন-পূর্বক মায়ার গন্তী পার করিবেন? যখন সাধন-পথে লোভ-মোহ আদি দম্যগণ আসিয়া, সাধকের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইবে অথবা কাম-ক্রোধ, হিংসা-দ্বেষ, অভিমান-অহঙ্কার, দর্প-গর্ব, ঈর্ষ্যা-অসূয়া, অবিশ্বাস-অশ্রদ্ধা প্রভৃতি স্থাপদকুলের আক্রমণে সাধক কাতর হইয়া পড়িবে, তখন কে তাকে অক্ষয়-কবচে ঢাকিয়া রাখিয়া বলিবে,—“মাতৈঃ”? ‘গুরু’। অতএব, গুরুকে কদাপি অবজ্ঞা করিও না, তিনি যেমনই হউন, তাঁহাকে ভক্তি করিবে, শ্রদ্ধা করিবে, বিশ্বাস করিবে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে, আমাদের প্রাচীন ত্রিকালজ্ঞ মহাজ্ঞানী তত্ত্বদর্শী মুনি-ঋষিগণ, গুরুগন্তীর ওজস্বিনী ভাষায় কহিয়াছেন,—

“দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরো।

যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিক্কির্ভবতি তাদৃশী ॥”

‘দেবতাতে, তীর্থজলে, ব্রাহ্মণে, মন্ত্রে, দৈবজ্ঞে, ঔষধে ও গুরুতে,— এই কয়েকটিতে যিনি যেরূপ চিন্তা বা বিশ্বাস করিবেন, তিনি সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হইবেন।’ তাৎপর্য্য এই যে, ইঁহাদিগকে যে যেমন কামনা করিয়া, চিন্তা করে, সে তেমনই ফল পায়। মোটের

উপর গুরুর প্রতি বিশ্বাসই মূলধার। এই বিষয়ে একটি গল্প বলি শুন!—নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য, অদ্বিতীয় ধানুকী এবং আদর্শ গুরুভক্ত ছিলেন। ইনি দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষার্থ গমন করিলে, নিষাদ-পুত্র বলিয়া, দ্রোণাচার্য ঘৃণা করিয়া ইঁহাকে শিক্ষা দিতে অসম্মত হইলেন। অতঃপর একলব্য জন-সমাগম-শূন্য বনে গমন করিয়া, দ্রোণাচার্যের কার্ঠময় প্রতিমূর্তি স্থাপন করিলেন এবং অনন্যমনে ভক্তি-সহকারে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গুরুভক্তি-প্রসাদে ইনি যোগবলে ও তপোবলে অল্প দিনের মধ্যে ধনুর্বিদ্যায় সর্বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। একদা দ্রোণাচার্য অর্জুনাदि পরাক্রমশালী শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সুগমার্থ একলব্য-স্থিত বনে উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদিগের একটি কুকুর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, জটা-বন্ধল-ধারী একলব্যকে দেখিয়া, ভীষণ শব্দ করিতে থাকে, সেই চীৎকারে একলব্যের তপোবিল হওয়ায়, তিনি এককালে সাতটি শব্দ-ভেদী শর কুকুরের মুখ-বিবরে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে কুকুরের শব্দশক্তি তিরোহিত হইল। কুকুর সেই অবস্থায় অর্জুনাदिर নিকট ফিরিয়া আসিলে, সকলে আশ্চর্য্য হইয়া, শরক্ষেপকারীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে, একলব্যের নিকট উপস্থিত হইয়া, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, একলব্য আপনাকে নিষাদ-পুত্র ও দ্রোণাচার্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন। তখন অর্জুন সমুদয় বৃত্তান্ত দ্রোণাচার্যকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, অতি দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন,—‘আপনি বরাবর বলিয়া আসিতেছেন, আমরা অপেক্ষা আপনার প্রিয়তর শিষ্য আর কেহ নাই, তবে নিষাদ-পুত্র কিরূপে এমন উত্তম শিক্ষা লাভ করিল? এবং প্রকার শরক্ষেপ-বিদ্যা আপনি ত আমাকে শিক্ষা দেন নাই। এক্ষণে বুঝা গেল, জগতে আমরা অপেক্ষা ও আপনার প্রিয়তর শিষ্য আছে।’ অর্জুন এই প্রকার খেদ প্রকাশ করিলে, দ্রোণাচার্য তাঁহাকে লইয়া একলব্য-সমীপে গমন

[৪র্থ খণ্ড]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

৩৭

করিয়া, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পূর্ববৎ আপনাকে
 জোণাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া, পরিচয় প্রদান করিলেন । তখন জোণাচার্য্য
 হল করিয়া, তাঁহার নিকট গুরু-দক্ষিণা-স্বরূপ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের
 বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রার্থনা করিলে, একলব্য অম্লান-বদনে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান
 করিলেন । অতএব, গুরু যেমনই হউন, তাঁহার প্রতি ভক্তি করিয়া,
 সাধনায় নিরত হইলেই, গুরু-কৃপায় সিদ্ধিলাভ অবশ্যজ্ঞাবী ; সংশয়
 নাই । গুরুভক্তি থাকিলে গুরু যদি মূর্থও হন, তাঁহার হৃদয়ে স্বয়ং
 ভগবান্ প্রবেশ-পূর্বক যথোপযোগী উপদেশ প্রদান করিয়া, শিষ্যকে
 উদ্ধার করিয়া থাকেন । মহাযোগী মহেশ্বর কহিয়াছেন,—

“ অধুনা কথয়িষ্যামি ক্ষিপ্ৰং যোগস্ম সিদ্ধয়ে ।
 যজ্জ্ঞান্ধা নাবসীদন্তি যোগিনো যোগসাধনে ॥
 ভবেদ্বীৰ্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্তৃসমুদ্ভবা ।
 অথথা ফলহীনা শ্রান্নির্বীৰ্য্যা চাতিদুঃখদা ॥
 গুরুং সন্তোষ্য যত্নেন যো বৈ বিদ্যামুপাসতে ।
 অবিলম্বেন বিদ্যায়ান্তস্থাঃ ফলমবাগ্নুয়াৎ ॥

শিবসংহিতা । ৩

‘সম্প্রতি কি উপায়ে আশু যোগসিদ্ধি হয়, তাহা বলিতেছি ।
 ইহা জ্ঞাত হইলে, যোগীরা যোগ-সাধন-বিষয়ে অবসাদ প্রাপ্ত হয়েন
 না । এই যোগবিদ্যা গুরুর মুখ হইতে লাভ করিলে বীৰ্য্যবতী হয়,
 গুরুপদেশ ব্যতীত যোগ-সাধনে নিযুক্ত হইলে, তাহা নির্বীৰ্য্যা ও দুঃখ-
 প্রদায়িনী হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহাতে কোন ফলই হয় না । যিনি
 যত্নবান্ হইয়া, গুরুকে প্রীত করতঃ তাঁহার উপদেশ অনুসারে যোগ-
 সাধন অর্থাৎ সাধন-ভজন করেন, তিনি আশু সেই সাধনার ফল লাভ
 করেন ।’ যোগারাজ ঘেরণ্ড কহিয়াছেন,—

“বিদ্যা প্রতীতিঃ স্বগুরুপ্রতীতি—

রাত্নপ্রতীতির্মনসঃ প্রবোধঃ ।

দিনে দিনে যন্ত ভবেৎ স যোগী,

সুশোভনাভ্যাসমুপৈতি সতঃ ॥ ”

ঘেরগুসংহিতা । ৭

‘গুরুর কৃপা ও প্রসন্নতা হইলে এবং তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি থাকিলেই, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় । দিন দিন বিদ্যা, গুরু এবং আত্মার প্রতি যাঁহার প্রতীতি জন্মে ও দিন দিন যাঁহার মনের প্রবোধ হইতে থাকে, সমাধি-যোগ-সাধনের সেই যোগী-পুরুষই প্রকৃত অধিকারী হইয়া থাকেন ।’

অতএব কুলগুরু, বিদ্বান্‌ই হউন অথবা বিদ্যাহীনই হউন, গুরুদেব জনার্দন-স্বরূপ এবং তিনি সুপথে থাকুন অথবা কুপথগামী হউন, নিরন্তর গুরুদেবই একমাত্র গতি । তোমার কুলগুরু মূর্খ হউন, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি ? তিনি মূর্খ হইয়াও, তোমার কুল-দেবতার বিষয় যে রূপে বিশিষ্টভাবে অবগত আছেন, একজন নবাগত পুরুষ কি সেরূপভাবে তোমার ইচ্ছা দেবতার বিষয় অবগত হইয়া, তোমার আত্মার পরিতৃপ্তি-সাধন করিতে পারিবেন ? কুলগুরু বিপাদে-সম্পদে, সুখে-দুঃখে সকল সময়ে তোমার সহায়ক ; কিন্তু, এরূপ অবস্থায় গৃহত্যাগী অনেকেত পুরুষ গুরু হইলে, যাঁহার আশ্রমের কোন স্থিরতা নাই, তেমন লোককে গুরু করিলে, অপকার ভিন্ন উপকার নাই ; পরন্তু, সেরূপ কার্যে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় । তোমার হৃদয়ে ভাব-ভক্তি-বিশ্বাস থাকিলেই, পণ্ডিত গুরু অপেক্ষা অজ্ঞ মূর্খ গুরুর প্রসাদেই অতীকলাভ করিতে পারিবে ; সন্দেহ নাই । সাধন-ভজনের বিষয়ে ভগবৎ-প্রেম আনিবার অধিকার একজন পণ্ডিত অপেক্ষা মূর্খের খুব বেশী আছে ; পণ্ডিত যাহা বহুশাস্ত্র-গবেষণা দ্বারা, বহু তর্ক-বিতর্ক করিয়াও, যে ভাব আনয়ন করিতে পারেন না, মূর্খ সরল-বিশ্বাসে হৃদয়ের ভক্তি-প্রবণতায় তাহা অপেক্ষা শতগুণে সমর্থ হয় । আর, সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারের জন্ত তোমাকে স্বয়ং প্রস্তুত হইতে হইবে, সরলভাবে

[ঊর্ধ্ব খণ্ড]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

৩৯

নিজেই সে পথের অনুসরণ করিতে হইবে ; নতুবা, কেবল গুরুর সাধ্য নাই যে, তিনি অতীব কুকর্ষ-নিরত শিষ্যকে নিজ ক্ষমতা-বলে স্বর্গের সোপানে তুলিয়া দিয়া, এত সহজে ইচ্ছা-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করাইতে পারেন । অতএব, সাধন-বিষয়ে নিজেই অগ্রসর হইতে হইবে, গুরু অবলম্বন, গুরু উপদেশ দিয়া, সাধন-পথে কিছুদূর অগ্রসর করাইয়া দেন মাত্র । এ বিষয়ে একটি গল্প বলি শুন ।

কোন গ্রামে এক সাধারণ পণ্ডিত প্রতিদিন ‘যেন কেন প্রকারেণ’ ভাগবত পাঠ করিতেন. একটি দশ-বর্ষীয় বালক তথায় প্রতিদিন আসিয়া, ভাগবত শ্রবণ করিত । একদিন ভাগবতের দশম স্কন্ধে রাসলীলা পাঠ করিতে করিতে পণ্ডিত বলিলেন যে,—‘এখনও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, প্রত্যহ রাসলীলা করিয়া থাকেন ।’ ভাগবত-পাঠ শেষ হইলে, সকলে চলিয়া গেল ; কিন্তু বালক উঠিল না । নির্জ্ঞান পাইয়া, বালক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসিল—‘পণ্ডিতজী ! আপনি যে কৃষ্ণের এত মহিমা বর্ণন করিলেন, তিনি বর্তমান কোথায় থাকেন ?’ পণ্ডিত কহিলেন,—‘তিনি শ্রীবৃন্দাবনে থাকেন ।’ একদিন রাত্রিকালে বালক মাতা-পিতা সকলের অভ্যাসসারে বৃন্দাবন যাত্রা করিল ; কিন্তু, বৃন্দাবন যে কোথায় বা কতদূর, তাহা পণ্ডিতের নিকট জানিয়া লইতে তুলিয়া গিয়াছে,—তাহা আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া, চলিতে আরম্ভ করিল, বালকের ধারণা বৃন্দাবন অল্পদূরেই হইবে । দিন যায়, রাত্রি আসে, এইরূপে চলিতে চলিতে, বালক বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল এবং এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল,—‘ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোথায় থাকেন ?’ বৃদ্ধ বালকের ভাব কথঞ্চিৎ বুঝিয়া উত্তর করিলেন,—‘মন্দিরে থাকেন ।’ বালক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, একটি মন্দিরে প্রবেশ করিল এবং মন্দিরে কৃষ্ণ-মূর্তি দেখিয়া, ভাবিতে লাগিল,—‘আমি ভাগবতে যে কৃষ্ণের মহিমা শুনিয়াছি, সে ত—এ কৃষ্ণ নয় !—এ ত কৈ কথা বলে না বা নাচে না ;—সে কৃষ্ণ কথা বলে,—চলে,—বাঁশা বাঁজায়,—

গান করে এবং নাচে । আমি ত ঐ কৃষ্ণকে খুঁজিতেছি,—যে কৃষ্ণ কথা বলে,—চলে,—নাচে এবং গান করে ।’ বৃন্দাবনে যত মন্দির ছিল, বালক তন্ন তন্ন করিয়া, সকল মন্দিরে গিয়া দেখিল ; কিন্তু, কোন মন্দিরেও কথা বলা কৃষ্ণ দেখিতে পাইল না । কাজেই—হতাশ হইয়া, বনাস্তরে গমন করিল এবং একান্ত স্থানে বসিয়া, কাঁদিতে লাগিল । কাঁদিয়া কাঁদিয়া, চক্ষুদ্বারা বন্ধ ভিজাইয়া, কত কি ভাবিতে লাগিল, আবার ক্ষণপরে প্রতিজ্ঞা করিল,—‘যতদিন না কথা বলা কৃষ্ণ দেখিতে পাইব, ততদিন অন্ন-জল গ্রহণ করিব না, অনাহারে থাকিয়াই প্রাণ ত্যাগ করিব ।’ এই প্রকারে প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া, কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিল এবং অহর্নিশ কেবলই কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিল । শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণে রতাঃ কৃষ্ণমনুষ্মরন্তি,

রাত্ৰৌ চ কৃষ্ণং পুনরুখিতা য়ে ।

তে ভিন্নদেহাঃ প্রবিশন্তি কৃষ্ণং,

হবির্যথা মদ্রহত্যং হতাশে ॥

ব্রহ্মপুরাণ । ১৭৭

যাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে রত হইয়া, অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণকেই অনুস্মরণ করে, রাত্রিকালে উখিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণকে ভাবনা করে, তাহারা সর্ব-বাসনা-মুক্ত হইয়া, হতাশনে মদ্রহত্য হবির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে । এক্ষণে তন্ময় হইয়া, আহার-নিদ্রা, এমন কি,—আপন দেহের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হইল । ভক্ত-বৎসল ভগবান্, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না,—বুঝিলেন, ‘কোন ভক্ত আমায় ডাকিতেছে এবং অনাহারে আমার জন্ম প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছে । কোথায় কোন্ ভক্ত আমাকে বিচলিত করিল ?’ এই বলিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন, একটি বালক তাঁহাকে দেখিবার জন্ম কর্তার তপস্যা করিতেছে এবং নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান

মগ্ন হইয়াছে । অগনি—ভক্ত-বৎসল ভগবান, ভক্তের মনোভাব
 বুঝিয়া, গোলোক ছাড়িয়া, ভুলোকে পদার্পণ করিলেন । ভক্তবাঞ্ছা-
 কল্পতরু ভগবান, বালকের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণ-
 রূপ ধারণ করিয়া, বালকের সম্মুখে ‘ত্রিভঙ্গ-বন্ধিম-ঠামে’ দাঁড়াইয়া,—
 “কলবেণুসমীরিতগানরতঃ” হইলেন ; কিন্তু, তাহাতেও বালকের
 ধ্যানভঙ্গ হইল না,—তিনি আবার—“মুহনৃত্যতি গায়তি বাদয়তে”
 তখনই বালকের ধ্যানভঙ্গ হইল এবং সম্মুখে নৃত্য-গান-রত ভগবানকে
 দেখিয়া আকুল-আবেগে ছুটিয়া গিয়া, শ্রীচরণযুগল দৃঢ়-রূপে ধরিয়া,
 কেবলই কাঁদিয়া কাঁদিয়া, অশ্রু-প্রবাহে বক্ষঃ প্লাবিত করিতে লাগিল ।
 দীন-বৎসল ভগবান, বেগবান্ স্নেহাতুর আদর-কম্পিত-স্বরে কহিলেন,
 —‘বালক ! তুমি অনেকদিন যাবৎ ক্ষুধায় থাকিয়া বড়ই কাতর হইয়া
 পড়িয়াছ,—এই লও, কিছু আহাৰ্য্য বস্তু খাও ।’ বালক কহিল,—‘তুমিই
 কি আমার সেই কৃষ্ণ ?’ ভক্ত-বৎসল ভগবান্ সরস-মধুর হাস্য-মণ্ডিত
 আবেগ-মধুর আদর-কম্পিত করুণ-স্বরে কহিলেন,—‘হাঁ, বৎস ! তুমি
 যাহাকে খুঁজিতেছ, আমিই সেই কৃষ্ণ ।’ তখন বালক কহিল,—
 ‘প্রভু ! আমার যে বিশ্বাস হয় না !—অতএব তুমি আমার সঙ্গে চল,
 পণ্ডিত মহাশয় যদি বলেন,—তুমিই সেই কৃষ্ণ, তবে আমার বিশ্বাস
 হইবে এবং তোমার প্রদত্ত আহাৰ্য্যও খাইব ; নতুবা আমার প্রতিজ্ঞা
 কৃষ্ণকে না দেখিলে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিব ।’ বালকের কথা
 শুনিয়া, ভক্ত-বৎসল ভগবান্ বালকের সঙ্গে বাইতে উত্তত হইলেন ।
 বালক কহিল,—‘প্রভু ! আমি শুনিয়াছি, তুমি নাকি বড় চতুর !—
 তোমাকে সহজে কেহ লইয়া যাইতে পারে না ;—তাই আমার ভয়
 হইতেছে ; সুতরাং তোমার হাত বাঁধিয়া লইয়া যাইব, নতুবা তুমি
 ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাইবে ।’ ভক্তিগদগদচিত্ত তন্ময় বালকের
 করুণা-মিশ্রিত কাতরতা-মণ্ডিত বাক্য শুনিয়া, ভক্তাধীন ভগবান্

হাসিতে হাসিতে, বাঁধিবার জন্য দুইটি হাত বাড়াইয়া দিলেন। বালক আনন্দে মাতিয়া, উৎফুল্ল হইয়া, আপনার বস্ত্রাগ্র দ্বারা ভগবানের দুইটি হাত বাঁধিল এবং পুনঃপুনঃ দেখিল, বাঁধা শক্ত হইয়াছে কি না, বন্ধন শিথিল হইলে ভগবান্ পাছে পলাইয়া যান। এইরূপে ভগবান্কে বাঁধিয়া, বালক আপন বস্ত্র দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া, পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট ভগবান্কে লইয়া চলিল। নিমেষমধ্যেই পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া, বালক আকুল হইয়া কহিল,—‘পণ্ডিত মহাশয় ! আপনার কথানুসারে আমি বৃন্দাবনে যাইয়া, বড়ই কষ্টে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া আনিয়াছি। আপনি দেখুন, ইনিই কি সেই শ্রীকৃষ্ণ ?’ পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—‘বালক ! পাগল হইয়াছ না কি ?—যাও, গৃহে যাও, আমাকে বিরক্ত করিও না।’ বালক এইরূপে পুনঃপুনঃ কহিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে জ্বালাতন করিলে, পণ্ডিত মহাশয় শম্যা ত্যাগ করিয়া, বাহির হইলেন এবং ভাবিলেন,—‘বালক পাগল নহে, ইহার বাক্যে কেন প্রাণ-মন বিগলিত হইতেছে ? আচ্ছা—দেখা যাউক।’ এইরূপ ভাবিয়া, তিনি বালক-সমীপে আসিয়া কহিলেন,—‘বালক ! তুমি বলিতেছ, শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া আনিয়াছি ; কিন্তু আমি ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ! কোথায় তোমার কৃষ্ণ ?’ পণ্ডিতের মুখে একথা শুনিয়া, বালক ভগবান্কে কহিল,—‘প্রভু ! তুমি পণ্ডিত মহাশয়কে দেখা দিতেছ না কেন ? শীঘ্র দেখা দাও, তবেই ত তিনি তোমায় চিনিতে পারিবেন !’ ভক্তাধীন ভগবান্ নিরুপায় দেখিয়া, পণ্ডিত মহাশয়কে দর্শন দান করিতে বাধ্য হইলেন। গুরু-শিষ্য ভগবানের দর্শন লাভ করিয়া, জন্ম সফল ও জীবন সার্থক করিলেন। অতএব, দৃঢ়বিশ্বাসী বালকের বিশ্বাস-ভক্তিতে গুরুও ভগবানের দর্শন করিতে সমর্থ হইল ; সুতরাং ভগবদ্ভজনায বিচা-বুদ্ধির কোনই আবশ্যক করে না,—কেবলমাত্র ভক্তি-বিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন। গুরুর প্রতি বিশ্বাস-ভক্তি করাতেই বালক ভগবানের হাত বাঁধিয়া ধরিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতএব,—

গুরুঃ পিতা গুরুমাতা গুরুদেবো ন সংশয়ঃ ।

কর্মণা মনসা বাচা তস্মাৎ শিষ্যৈঃ প্রসেব্যতে ॥

গুরুপ্রসাদতঃ সর্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ ।

তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমন্থথা ন শুভং ভবেৎ ॥

শিবসংহিতা । ৩

গুরুই পিতা, গুরুই মাতা এবং গুরুই দেবতা-স্বরূপ, এই জন্মই সাধকগণ কায়মনোবাক্যে সর্ববিনোদভাবে গুরু-শুশ্রূষা করিয়া থাকেন । গুরু যদি তুষ্ট হইলেন, তাহা হইলেই নিখিল শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ; সুতরাং সর্বদাই গুরুসেবা করা বিধেয় । গুরুসেবা ব্যতীত কদাচ শুভ-ফল প্রত্যাশা করা যায় না । কেন না, শাস্ত্র বলিয়াছেন,—‘গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর ; গুরুদেবই পরব্রহ্ম ;’ সুতরাং সাধকের আরাধ্য-বিষয়ের সাধন-কালে—গুরু, মন্ত্র ও উপাস্ত্র,—এই ত্রিমূর্তির একত্ব চিন্তা করিয়া, তিনকে ভাজিয়া এক করিতে হয় । তাই সাধক-প্রবর রামপ্রসাদ আবদার করিয়া, সাধকে কহিয়াছিলেন,—“তিন ভেঙ্গে যে এক করে মা !—তার কাছে কেমনে বাঁচ ?” কারণ, ভগবান্ নিজেই গুরু-রূপে শিষ্যকে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করেন এবং তিনিই নাম বা মন্ত্র-রূপে সাধকের সাধনায় সহায় হন ; তিনিই আবার, উপাস্ত্র-রূপে সাধকের সাধনায় সুফল প্রদান করেন । এই আলোচনায় জানা গেল যে,—সাধন-ক্ষেত্রে, ভগবান্ই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর,—এই ত্রিমূর্তিতে বিরাজিত । সুতরাং যাঁহা দ্বারা, সেই ত্রিতয়াক্তক মূর্তির মহিমা খ্যাতি প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলে, তাঁহারা সহিবেন কিরূপে ? - বিশেষতঃ সেই ত্রিতয়াক্তক গুরু-মূর্তিকে অবজ্ঞা করিলে, কি তাঁহাদের নাম-মূর্তির কাছে অপরাধ করা হয় না ?—যিনি ভক্তিমান্ বা প্রেমিক সাধন-পথের পথিক, তিনি কি কখন গুরুকে অবজ্ঞা করিতে পারেন ? গুরু-পদাশ্রয়ই যে তাঁহার যথা-সর্বস্ব । কেন না, যে সাধন-ভক্তি হইতে ভগবদ্-অনুরক্তির উদয় হয়, সেই

সাধন-ভক্তির অঙ্গ সকলের প্রথম অঙ্গই যে,—‘গুরু-পাদাশ্রয় ।’
 সুতরাং গুরু-পাদাশ্রয় পরিত্যাগ করিলে কি নাম-সাধন চলে, না
 সাধনার ধন—নিদানের বন্ধু, প্রেমধন—অমূল্য রতন ভগবান্ শ্রীহরি
 মিলে ? গুরুর প্রতি যাহার অবজ্ঞা, তাহার নামেই বা রুচি হইবে
 কেন ? নাম ত সেই গুরুই দিয়াছেন । অতএব, গুরুকে সাধারণ
 মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করিও না, গুরুর এই মনুষ্যাকার শরীর অবিতর্ক্য
 অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছা-বিলসিত । ইহা প্রাকৃত-মনুষ্যের তুল্য নহে ;
 গুরুর হৃদয় সত্ত্ব-স্বরূপ, উহাতে শুদ্ধ-সত্ত্বগুণই বিরাজ করিতেছে ।
 সেই জগৎ শাস্ত্র বলিয়াছেন,—“গুরৌ মানুষবুদ্ধিস্ত কুব্বাণো নরকং
 ব্রজেৎ ।” গুরুকে সাধারণ মানুষ জ্ঞান করিলে, নরকে যাইতে হয় ।
 কেন না,—“নিগুণঞ্চ পরব্রহ্ম গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ।” গুরু—এই অক্ষর
 দুইটি নিরাকার নির্বিকার নিগুণ ব্রহ্মের বাচক । অতএব, গুরুর
 পূজাই মন, বাক্য, চক্ষুঃ ও অগ্ৰাণ্য ইন্দ্রিয়ব্যাপারের সাক্ষাৎ ফল ।
 অগ্রে গুরুকে ভক্তি-সহকারে পূজনা করিলে, কোন পুরুষ মহা-মোহময়
 মমতা-পাশ হইতে কদাপি মুক্ত হইতে পারে না । সুতরাং গুরুকে
 ভক্তি-সহকারে পূজা করিবে,—শিক্ষা-গুরু, দীক্ষা-গুরু এবং ভগবদ্ভক্তকে
 গুরু রূপে পূজা করিলে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হইয়া থাকে । কেন না,
 মাতেশ্বরী শ্রুতি কহিয়াছেন,—

“গুরুব্রহ্ম। গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবঃ সদাচ্যুতঃ ।
 ন গুরোরধিকঃ কশ্চিচ্ছ্রিয় লোকেষু বিদ্যতে ॥
 দিব্যজ্ঞানোপদেষ্টারং দেশিকং পরমেশ্বরম্ ।
 পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা তস্য জ্ঞানফলং ভবেৎ ॥
 যথা গুরুস্তথৈবেশো যথৈবেশস্তথা গুরুঃ ।
 পূজনীয়ো মহাভক্ত্যা ন ভেদো বিদ্যতেহনয়োঃ ॥
 নানৈধৈতবাদং কুব্বীত গুরুণা সহ কুত্রচিৎ ।
 অদ্বৈতং ভাবয়েদ্ভক্ত্যা গুরোর্দেবস্য চাত্মনঃ ॥”

যোগশিখোপনিষৎ । ৫

[১র্থ খণ্ড]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

৪৫

গুরুই ব্রহ্মা অর্থাৎ গুরু শিষ্যকে ব্রহ্ম-জ্ঞানোপদেশ দিয়া, তাহার হৃদয়ে ব্রহ্মভাব উৎপাদন করেন বলিয়া, গুরু মহা-মহিমাযিত সৃষ্টি-কুশল বিশ্ব-স্রষ্টা ব্রহ্মার অবতার-স্বরূপ ; আর, গুরুই বিষ্ণু অর্থাৎ শিষ্যের হৃদয়স্থ ব্রহ্মভাবকে অবিকৃত ও অবিচলিত-ভাবে রক্ষণ এবং শিষ্যকে আশ্রয় হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া, গুরু পালনকর্তা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অবতার-স্বরূপ এবং গুরুই মহেশ্বর অর্থাৎ শিষ্যের হৃদয়গত অজ্ঞান অন্ধকার-রাশি নাশ করেন বলিয়া, গুরুদেব সংহারকর্তা মহেশ্বরের অবতার-স্বরূপ । পবমারাধ্য প্রাণের দেবতা শ্রীগুরুদেব, আধ্যাত্মিক পরমতত্ত্ব-সমূহ শিষ্যকে দান করিতে এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখত্রয় হইতে ত্রাণ করিতে পারেন বলিয়া, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল,—এই ত্রিলোকে তাঁহার অপেক্ষা আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই । অতএব, দিব্যজ্ঞানের উপদেশক, ত্রিতয়াত্মক পরমেশ্বর-স্বরূপ পরমারাধ্য শ্রীগুরুকে যে ব্যক্তি পরম ভক্তি-সহকারে বিনয়-শুশ্রূষাদি দ্বারা নিত্য পূজা করে, তাহারই জ্ঞানফল অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয় । কেন না, যিনি গুরু, তিনিই ঈশ্বর অর্থাৎ নরাকারে স্থূলমূর্তি ঈশ্বর-রূপে অবস্থান করিতেছেন এবং যিনি ঈশ্বর, তিনিই গুরু অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপী ঈশ্বর স্থূলমূর্তি ধারণ করিয়া, উপদেশক-রূপে গুরু-স্বরূপে জগতে বিরাজ করিতেছেন । সুতরাং গুরুমূর্তি ও ঈশ্বর-মূর্তি উভয়-মূর্তিই মহাভক্তি-সহকারে পূজনীয় অর্থাৎ মানবদেহধারী বলিয়া, গুরু হেয় নহেন । অতএব, গুরুকে যে ব্যক্তি সামান্য মানুষ বিবেচনা করে, সে অজ্ঞ অন্ধ মূঢ় জন নরকে যায় । গুরুকে অবজ্ঞা করা ত দূরের কথা, মানব-দেহধারী মানুষ বলিলেও মহাপাপ হয় । সুতরাং একুণ্ড মানুষ-বুদ্ধি গুরুতে স্থাপন করিবে না, ঈশ্বর-জ্ঞানে তাঁহার পূজা করিবে ; কেন না, ইহাদের উভয়ে কোন প্রকার ভেদ নাই । আর, কোন বিষয়েই গুরুর সহিত অদ্বৈতবাদ করিবে না, অর্থাৎ গুরু আমা হইতে শ্রেষ্ঠ, সর্ববদা এই ভাব প্রকাশ করিবে এবং

মনে মনেও ভাবিবে ; কিন্তু, গুরুতে ও আমাতে কোন ভেদ নাই, সকলই এক, এইরূপ বাদানুবাদ করিবে না । তথাপি গুরু, দেবতা ও নিজেকে অভেদ-রূপে মনে মনে ভাবনা করিবে ; কিন্তু, তাহা ভক্তি-ভাবে, অন্য ভাবে নহে । ভক্তিভাবে তাঁহাকে নিজের সহিত অভেদরূপে অন্তরে অন্তরে চিন্তা করিবে, বাক্যে ও কার্যে তাহা প্রকাশ করিবে না । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উক্ত আছে যে,—

সর্বেষাঞ্চ গুরুণাঞ্চ জন্মদাতা পরো গুরুঃ ।
 পিতুঃ শতগুণৈর্মায়া পূজ্যা বন্দ্যা গরীয়সী ॥
 বিদ্যাদাতা মন্ত্রদাতা জ্ঞানদো হরিভক্তিদঃ ।
 পূজ্যা বন্দ্যাশ্চ সেব্যাশ্চ মাতুঃ শতগুণৈর্গুরুঃ ॥
 মন্ত্রমুদগীরণেনৈব গুরুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ।
 অন্য বন্দ্যা গুরুরয়মশ্চাচারোপিতো গুরুঃ ॥
 অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাজ্ঞানশলাকয়া ।
 চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ ত্রীগুরবে নমঃ ॥
 জন্মদাতারদাতা বা মাতান্যে গুরবস্তথা ।
 পারং কর্তুং ন শক্তাস্তে ঘোরে সংসারসাগরে ॥
 বিদ্যামন্ত্রজ্ঞানদাতা নিপুণাঃ পারকর্শ্মণি ।
 ন শক্তাঃ শিষ্যমুদ্বর্তু মৌখরশ্চৈবরোহণরঃ ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ । জন্ম । ৫৯

উপাধ্যায়, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মাতুল, শশুর, পিতামহ, পিতৃবা, রাজা ও বর্ণজ্যেষ্ঠ,—ইঁহারা সকলেই গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন । আর, মাতা, মাতামহী, গুরুপত্নী, পিতৃষা, মাতৃষা, শ্বশুরী, পিতামহী ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী,—এই সকল গুরুজন বলিয়া কথিত । এই সকল গুরুকে গুরুবর্গ বলে । গুরুবর্গ দুই প্রকার,—মাতৃবর্গ ও পিতৃবর্গ । জন্মদান ও প্রতিপালন হেতু জন্মদাতা সকল পূজ্যতম পূজ্যতম জনক ও পিতা বলিয়া কথিত ; কিন্তু, জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা

[৪র্থ খণ্ড]

চতুর্থ-পরিচ্ছেদ ।

৪৭

অন্নদাতা পিতা শ্রেষ্ঠ । যেহেতু, অন্ন ব্যতীত দেহ রক্ষা অসম্ভব । আর, পিতা হইতে যে উৎপত্তি, তাহা স্বভাবসিদ্ধ । এই দ্বিবিধ পিতা হইতেই মাতা গর্ভধারণ ও পোষণহেতু শতগুণে পূজ্যা, মায়া, শ্রেষ্ঠা ও বন্দনীয়্য হইলেন । বেদে কথিত আছে যে, অভীষ্টদেব পূর্বোক্ত গুরুজন হইতেও শতগুণে পূজ্যতর ; কিন্তু জ্ঞানদাতা, বিদ্যাদাতা ও মন্ত্রদাতা, সেই অভীষ্টদেব অপেক্ষাও পূজ্যতম । আবার বিদ্যাদাতা, মন্ত্রদাতা, জ্ঞানদাতা অপেক্ষাও হরিভক্তি-প্রদাতা গুরু,— শতগুণে পূজ্য, বন্দনীয় ও সেবাহঁ । মন্ত্রদাতা, মন্ত্র উদগীরণ করেন বলিয়া, বুধগণ তাঁহাকে গুরু বলিয়া থাকেন ; অতএব মন্ত্রদাতাই যথার্থ গুরু, অথো গুরুত্বের আরোপ মাত্র । যিনি জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকা দ্বারা অজ্ঞান-তিমিরাক্ষ ব্যক্তির জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন করিয়া দেন ; সেই গুরুকে নমস্কার । কেন না, জন্মদাতা, অন্নদাতা, মাতা বা অন্য যে গুরুই বল, তাঁহার কেহই ঘোর সংসারসাগর হইতে নিস্তার করিতে সক্ষম নহেন । কেবল বিদ্যা, মন্ত্র ও জ্ঞানদাতা গুরুই ছুপার সংসারসাগর পারকরণে নিপুণ ; অপর কোন গুরুই শিষ্যের উদ্ধার সাধনে সমর্থ নন । এমন কি, সর্ববাত্মা পরমেশ্বর হইতেও গুরু পূজ্য । অতএব, যিনি হরিভক্তি-প্রদাতা, তাঁহার অপেক্ষা আর কে গুরু হইতে পারে ? যে ব্যক্তি এতাদৃশ গুরুকে দরিদ্র, পতিত বা ক্ষুদ্র দেখিয়া, তাঁহার প্রতি মনুষ্য-বুদ্ধি আচরণ করে, সে বিদ্যাক্ষ শত তীর্থে স্নাত হইয়াও, শুচি হয় না ও কোন কস্মৈই অধিকারী হয় না । যে ব্যক্তি সম্পদে মত্ত হইয়া, গুরুর অবমাননা করে, অচিরকাল মধ্যে তাহার নিশ্চয়ই বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে । পরন্তু, এ স্থলে কথা এই যে, যিনি অজ্ঞানাক্ষ শিষ্যকে বিপথগামী হইতে দেখিয়া, তাহাকে উপদেশ দিয়া, তাহা হইতে উদ্ধার করেন, তিনিই পরম হিতকারী গুরু ; তিনি শিষ্য-বিত্তাপহারী নহেন, তিনি শিষ্য-চিত্তাপহারী বা হত্বাপহারী । সেই গুরু আর কে ? ভগবানেরই অপর মূর্তি । অক্ষ

ব্যক্তি বিপথে যাইলে, তাহাকে দেখিয়া যেমন চক্ষুস্থান ব্যক্তি, সেই পথ ছাড়িয়া, সুপথে বাইতে উপদেশ করেন, ঐরূপ অজ্ঞানকে অবিদ্যাচ্ছন্ন শিষ্যকে বিপথগামী হইতে দেখিলে, গুরু তাহাকে বিপথ হইতে উদ্ধার করিয়া, সুপথে বাইতে উপদেশ করিয়া থাকেন। গুরু যেমনই হউন, তিনি শিষ্যকে সদুপদেশ দিয়া, সৎপথে চলিতে ও ভগবানের ভজন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। তবে এই গুরুও আবার তিন প্রকার ; যথা,—

চোদকো বোধকশ্চৈব মোক্ষদন্ত পরঃ স্মৃতঃ ।

ইত্যেবাং ত্রিবিধো জ্ঞেয় আচার্য্যস্ত মহীতলে ॥

চোদকো দর্শয়েন্মার্গঃ বোধকঃ জ্ঞানমাচরেৎ ।

মোক্ষদন্ত পরঃ তত্ত্বং যজ্জ্ঞাত্বা পরমস্মৃতে ॥

ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ ।

চোদক, বোধক ও মোক্ষদ,—এই তিন প্রকারের গুরু শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে অর্থাৎ জীব-জগতে এইরূপ তিন প্রকার গুরু বিদ্যমান। কিন্তু, এই ত্রিবিধ গুরুর মধ্যে মোক্ষদ গুরুই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেন না, মোক্ষদ গুরু নিজে মুক্ত এবং মুমুক্শু শিষ্যকেও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। এই ত্রিবিধ গুরুর মধ্যে যিনি চোদক অর্থাৎ প্রেরক তিনি কেবল মাত্র পথ-প্রদর্শক ; তিনি প্রথমাবস্থায় অজ্ঞান-তমসচ্ছন্ন শিষ্যকে সদুপদেশ দ্বারা তদুপযোগী সাধন-মার্গ দেখাইয়া সাধন-মার্গে অগ্রসর হইবার উদ্যম জন্মাইয়া দেন। সাধক তদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সাধনা করিতে করিতে, কালে—ভগবৎ-কৃপায়,—‘বোধক’ অর্থাৎ জ্ঞাপক গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ করে ; বোধক গুরু শিষ্যকে ভগবত্ত্ব সম্যক বোধগন্য করাইয়া, ভগবৎ-উপাসনা-মার্গ সুচারু-রূপে দেখাইয়া, ভগবৎবিষয়ক জ্ঞান জন্মাইয়া দেন। সাধক ভগবৎবিষয়ক তত্ত্ব সম্যক প্রকারে বিদিত হইলে, তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে, বিরাগ-রসিক হইলে, সংসারের নিত্যানিত্যবস্ত-বিবেক করিয়া, সংসারের অনিত্য

[৪র্থ খণ্ড]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

৪৯

বস্তুর আসক্তি পরিহার এবং নিভা বস্তুতে আসক্তি জন্মে । এই যে, অনিত্য বস্তুতে বিরক্তি, ইহাই মনুষ্যের লাভের সোপান । এই স্তরেই সাধকের হৃদয়ে মনুষ্যত্বের মহান্ বীজ রোপিত হইয়া থাকে । এই স্তরে আসিয়া, সাধক আপনাকে অবরুদ্ধ মনে করে ও হতাশ হইয়া পড়ে । অর্থাৎ এই স্তরেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব-বীজ উন্মেষিত হয় । এই স্তরে আসিয়াই সাধক স্বীয় মহত্ত্ব বুঝিতে পারে,—আপনাকে চিনিতে পারে এবং সে আপনাকে বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করে । আমি কে ? এই মানব-দেহ ধরিয়া—এই মহান্ মানব-জীবন লাভ করিয়া, আমি কি করিব ?—এই স্তরে আসিয়া সাধকের এই জিজ্ঞাসা জন্মে । ইহারই নাম আত্ম-জিজ্ঞাসা । এই আত্ম-জিজ্ঞাসাই সাধকের মুখ্য ধর্ম । এই জিজ্ঞাসা হইতে সাধকের কর্মজ্ঞান—ধর্মবুদ্ধি জন্মে ; সাধক, কর্মের ও ধর্মের মর্মকথা বুঝিতে পারে । ইহাতেই মানবের কর্মের ও ধর্মের সমন্বয়-সামঞ্জস্য সংসাধিত হয় । তৎকালে সাধক জিজ্ঞাস্ত হইয়া, ভগবৎ-স্বরূপ 'মোক্ষদ' গুরুর পদাশ্রয় লাভ করে,— 'মোক্ষদ' অর্থাৎ মুক্তি মার্গে সমুন্নত করিয়া মুক্তি প্রদানে সমর্থ গুরুর পদাশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া, তদুপদেশে পরতত্ত্বে প্রবেশ করে অর্থাৎ পরাৎপর পরব্রহ্মে আত্মলীন করিয়া থাকেন । স্মৃতরাং যেরূপ মধু-মক্ষিকা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করিয়া মধু সঞ্চয় করে, তদ্রূপ শিষ্যও—“গুরোঃ গুর্ববস্তরং ব্রজেৎ ।” অতএব,—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ শ্রী—

দীশাদপেতস্ত বিপর্যায়ঃ স্মৃতিঃ ।

তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং,

ভক্তৈক্যেশং গুরুদেবতাত্ম ॥

শ্রীমদ্ভাগবত । ১১। ২

ঐশী মায়া-নিবন্ধন ভগবদ্বিষ্ণু ব্যক্তির স্ব-স্বরূপের অস্মরণ ও
দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মিয়া,—‘ঈশ্বর হইতে আমি স্বতন্ত্র’ এই জ্ঞান-হেতু
ভীতি উপস্থিত হয়; সুতরাং ধীমান্ ব্যক্তি গুরু-রূপ দেবতাতে
আত্মার্পণকরতঃ একান্ত ভক্তিযোগে ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

শ্রুতিশাস্ত্র নিকা ।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি পূর্বের বলিয়াছেন যে,—‘চতুর্থ নামাপরাধ—বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা করা ।’ কিন্তু, আজকাল যাহারা বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বলিয়া, লোক-সমাজে সমাদৃত হন, তবে কেন তাঁহারা শ্রুতি-শাস্ত্রের নাম শুনিলে ; এমন কি—শ্রুতিশাস্ত্রের নাম উচ্চারণ করিলেও নাসিকা-কুঞ্জন করেন ? তাহাতে কি তাঁহাদের অপরাধ হয় ?

শাস্ত্রযোনিবাৎ ।

ব্রহ্মসূত্র । ১ । ১ । ৩

শ্রুতিশাস্ত্রই অতি গুহ্য ভগবন্ত্ব বুঝাইয়া, সাধককে সাধন-পথে অগ্রসর করাইয়া দেন ; সুতরাং শ্রুতিশাস্ত্রই অজ্ঞান-তমসচ্ছন্ন মানবের জ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা-স্বরূপ । শ্রুতিশাস্ত্রই জীবের ঐহিক-পারত্রিকের একমাত্র সম্বল । শাস্ত্র অনন্ত ; কিন্তু অনন্ত শাস্ত্রের প্রথম বা আদি শ্রুতি বা বেদ । তন্মিন্ন অগ্রাশ্র শাস্ত্র সকলই বেদের অনুগত বা অনুমত । আর, বেদ-বিরুদ্ধ যাবতীয় শাস্ত্র—কুশাস্ত্র, উহা ভক্ত সাধকের পক্ষে অপাঠ্য ও অগ্রাহ্য । বেদের উৎপত্তি-স্থান অনাদি-অনন্ত অক্ষয়-অব্যয় শ্রীভগবান্ । ভগবান্ই শাস্ত্রের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি বা জন্মস্থান । সেই অনাদি-অনন্ত অক্ষয়-অব্যয় চিদানন্দময় অনন্ত জ্ঞানের আধার, অক্ষয় ভাণ্ডার শ্রীভগবান্ হইতেই, আদি সৃষ্টি-কালে, বেদাদি অনন্ত শাস্ত্র, নিঃশ্বাসের ছায় নিঃসৃত হইয়াছিল,—এই কথা বেদের গুরু-গভীর আদেশ বাক্যের ওজস্বিনী ভাষায় অর্থাৎ বেদের মুখেই শুনা যায় । অতএব, অনাদি-অনন্ত অক্ষয়-অব্যয় জ্ঞানের অনন্ত

ভাণ্ডার শ্রীভগবানের মুখারবিন্দ হইতেই চারিবেদ, ছয় বেদাঙ্গ ও অন্যান্য শাস্ত্র সকল আবির্ভূত হইয়াছেন অর্থাৎ উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন । ভক্তি-শাস্ত্রের আচার্য্য মহর্ষি শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন,—

“নির্ম্মায়েচ্চাবচং শ্রুতীশ্চ নির্গমীতে পিতৃবৎ ।”

শাণ্ডিল্যসূত্র ।

‘অনাদি-অনন্ত অক্ষয়-অব্যয় এক অদ্বিতীয় নিরঞ্জন শ্রীভগবান্, ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারেই স্বাবর-জন্মান্মক ভূতসকলকে উত্তমাধম-রূপে সৃষ্টি করিয়া, সর্বভূতের জ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্ত, সঙ্গে সঙ্গে বেদ-শাস্ত্রেরও উৎপাদন করিয়াছিলেন । যেরূপ পিতা, পুত্রোৎপাদন করিয়া, তাহাদিগের হিতার্থ অন্তাত-বিষয়ে জ্ঞান জন্মাইয়া থাকেন, তদ্রূপ জগন্নিয়ন্তা পরমপিতা পরমেশ্বর ভূতসকলের হিতাহিত পরিত্তানার্থ স্বয়ং বাক্য-স্বরূপ বেদোৎপাদন করিয়াছেন ।’

সর্বনিয়ন্তা জগৎপিতা প্রভু ভগবান্ শুধু শাস্ত্রযোনি বা শাস্ত্রের জনক নহেন, তিনি শাস্ত্রের শিক্ষক এবং প্রচারকও বটে। অনন্ত-শক্তিশালী সর্ব-শক্তিমান্ ভগবান্ অসীম-শক্তি দ্বারা মহামহিমাযিত সৃষ্টি-কুশল বিশ্ব-শ্রষ্টা ব্রহ্মার হৃদয়-কন্দরে বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি শিক্ষকরূপে ব্রহ্মাকেও বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন । মহর্ষি যোগীরাজ পতঞ্জলি কহিয়াছেন,—

“স পূর্ব্বেষামপি গুরু কালেনানবচ্ছেদাৎ ।”

পাতঞ্জলদর্শন । সমাধি । ২৬

‘অনাদি-অনন্ত অক্ষয়-অব্যয় সর্বজ্ঞ সর্ববেত্তা শ্রীভগবান্, পূর্ব পূর্ব সৃষ্টিকর্তাদিগেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা । তিনি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন অর্থাৎ সকল কালেই তাঁহার অস্তিত্ব বিद्यমান ।’ তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে সৃষ্টিকর্তা বলা যায় বটে ; কিন্তু সর্বনিয়ন্তা পরমপিতা পরমেশ্বর, তাহাদিগেরও শ্রষ্টা ও উপদেষ্টা । ব্রহ্মাদি দেবগণের জন্ম ও মৃত্যু আছে ; কিন্তু অজ ও

[৪র্থ খণ্ড]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

৫৩

অমৃত শ্রীভগবানের জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই; তিনি অনাদি-অনন্ত অক্ষয় ও অব্যয়। সেই অনাদি-অনন্ত ভগ্নমিস্তা পরমপিতা পরমেশ্বর, বিশ্বস্বর্গ-বিধি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদ অর্থাৎ সৃষ্টিজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব, তিনিই সর্বব্রহ্মা এবং সর্বব্রহ্মজ্ঞানের আকর ও অনন্ত শাস্ত্রের আধার। তিনিই—“অচতুর্বিদনো ব্রহ্মা দিবাহরপরো হরিঃ। অভাললোচনঃ শম্ভু ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥” ব্রহ্মাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনিই শম্ভু-রূপে তন্ত্র-শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন এবং তিনিই আবার, ভগবান্ বাদরায়ণ ব্যাসদেবকেও বেদ শিক্ষা দিয়া, বেদ বিভাগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া, বেদকে চতুর্ধা, পঞ্চধা, দশধা, শতধা বিভাগে বিভাগ করিয়াছেন। তিনিই অন্তর্ধামী-রূপে কঠ, কেন, কোথুম প্রভৃতির হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া, তাঁহাদিগকে বেদ-প্রচারে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তিনিই কপিল, কনাদ, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন প্রভৃতি নাম ও রূপ স্বীকার করিয়া, শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন; ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত ও জীবন্ত প্রমাণ, শাস্ত্রের ও গ্রন্থের কুক্ষিতে কুক্ষিতে নিহিত আছে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন,—

“জন্মকর্মবিদশ্চাজন্মশকাৎ।”

শাণ্ডিল্যসূত্র ।

‘ভগবান্ জন্ম-রহিত; কিন্তু তিনি অজ হইয়াও, শরীর পরিগ্রহ ব্যতীত বেদ প্রণয়ন হইতে পারে না বলিয়াই, দেহ পরিগ্রহ করিয়া, ব্রহ্মাদি-রূপে বেদ-প্রণয়নাদি কার্য্য করিয়াছেন।’ অতএব, স্বয়ং ভগবান্ই যে সকল শাস্ত্রের প্রকাশক, প্রচারক, রক্ষক ও শিক্ষক, সেই সত্যসিদ্ধ শাস্ত্র সকলকে নিন্দা করা কি বর্ব্বরতার লক্ষণ নহে? আমরা দুর্ব্বল-বুদ্ধি-প্লেবের সাহায্যে দুস্তর শাস্ত্র-সিদ্ধি উত্তীর্ণ হইবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি; তাহাতেই ত আমাদিগকে এত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় এবং আমরা পদে পদে বিড়ম্বিত হই।

আমরা কি দুর্ভাগ্য ! কোথায় ভগবানের মুখারবিন্দ-বিনিঃসৃত শাস্ত্র পাঠ করিয়া, ধর্মের মর্ম বুঝিয়া, ভগবন্ত্বে মজিবার শক্তি-শিক্ষা-লাভ করিব ; আর, তাহা না করিয়া, ভগবানের প্রাণ-স্বরূপ নাম-মাহাত্ম্যময় শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া, নরকের পথ পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। শাস্ত্রের মর্ম না বুঝিয়াই, আমরা ভগবন্ত্ব-নিহিত শাস্ত্র সকলকে এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের মানস-কণ্ডূয়ন বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিবার ও শাস্ত্র-তত্ত্ব মজিবার চেষ্টা করি এবং শাস্ত্র-তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, শাস্ত্র সকলকে নিন্দা করিয়া থাকি। ইহা আমাদের ধৃষ্টতা বা এই মানস-কণ্ডূয়ন মস্তিষ্কের বিষম বিকার ব্যতীত আর কিছুই নয়। তবে কথা এই যে, যে সকল শাস্ত্রে হরি-ভক্তির উল্লেখ নাই, যে সকল শাস্ত্র পাঠ করিলে হৃদয়ে রজস্তমোগুণের বৃদ্ধি হয়, যে সকল শাস্ত্রে ভগবন্ত্ব বিবৃত হয় নাই,—তাহা ভগবন্ত্বের অনালোচ্য বা অপাঠ্য বটে ; কিন্তু, আলোচনা শ্রেয়স্কর না হইলেও, তথাপি তাহার নিন্দা করা উচিত নয়,—একথা মুক্তকণ্ঠে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মহামতি বশিষ্ঠদেব কহিয়াছেন,—

“উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতপৈব দ্বিবিধং পৌরুষং স্মৃতম্।

তত্রোচ্ছাস্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতম্ ॥”

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। মুমুকু। ৫

‘শাস্ত্র অনন্ত, অনন্ত শাস্ত্রের উপদেশও অনন্ত ; কিন্তু তাহা হইলেও, মানবসকলের কর্ম দ্বিবিধ,—শাস্ত্র-বহির্ভূত এবং শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত। তন্মধ্যে যাহা শাস্ত্র-বহির্ভূত, তাহা অনর্থের অর্থাৎ অনিষ্টের মূল ; আর, যাহা শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত, তাহা পরমার্থ-সূচক ; সুতরাং ইচ্ছা-সাধক ও সর্ব-মঙ্গল-বিধায়ক।’

অতএব যে শাস্ত্র পাঠ করিলে, হরি-ভক্তির বিষ উপস্থিত হয়, তাহা অশাস্ত্র তাহা পরিবর্জন করিবে ; তাই বলিয়া শাস্ত্রের নিন্দা করিবে না,—কেবলমাত্র তাহা পাঠ করিতে নিষেধ করা হইতেছে,

[৪র্থ খণ্ড]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

৫৫

ধুঝিতে হইবে । কিন্তু শাস্ত্র-সম্বন্ধে বিশেষ-রূপে বিচার করিয়া হেয় ও উপাদেয় নির্ণয় করিতে হইবে ; কেন না, এমন অনেক শাস্ত্র আছে, যাহাতে তামসিক বা রাজসিক ভাবের ভিতর দিয়া, ভগবানের উপাসনার বিষয় বিশেষ-রূপে বিবৃত হইয়াছে । তাহা ভগবদ্ভক্তের পক্ষে হেয় হইলেও, উপাদেয়,—ভগবদ্ভক্ত তাহার আচরণ না করিতে পারেন ; কিন্তু তাহা পাঠ করিতে তাঁহার দোষ নাই, অবশ্যই পাঠ করিতে পারেন । যেমন তন্ত্রশাস্ত্র ; তন্ত্রশাস্ত্রে তামসিক বা রাজসিক ভাবে উপাসনার বিরাট ব্যাপার লিখিত আছে ; আবার, তাহাতেই সাত্ত্বিক ভাবের উপাসনা-পদ্ধতি-বর্ণনাও চূড়ান্ত-রূপে কীর্তিত হইয়াছে । তেমন সাত্ত্বিক ভাবের উপাসনার বিধি বোধ হয়, বৈষ্ণব শাস্ত্রেও নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না । ভক্তি-শাস্ত্রের আচার্য্য মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন,—

“মিত্রোপদেশোম্মেতিচেন স্বল্পত্বাৎ ।”

শাণ্ডিল্যসূত্র ।

“পরম-পিতা পরমেশ্বর বেদ-বাক্য দ্বারা পশুহিংসাবিশিষ্ট যজ্ঞের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ; তাহাতে পশুবধজ্ঞ পাণের অল্পতাহেতু, সেই সমস্ত যজ্ঞোপদেশও আমাদের উপকারী । কেন না পরমেশ্বর নিয়ত পিতার ন্যায় আমাদের হিতকারী । যজ্ঞে যে পশুবধ উক্ত আছে, তাহাতে অতি অল্প মাত্র পাগই ঘটে ; পরন্তু, অসাধারণ পুণ্যাচরণই যজ্ঞাদির উদ্দেশ্য । যজ্ঞের প্রধান অংশ দেব-পূজাদি দ্বারা অতুল স্তব-ভোগাদি লাভ হয় । তদঙ্গীভূত পশু-বধাদি অল্প পাপ উৎপাদন করে । সুতরাং যজ্ঞবিধানকারী পরমেশ্বর, আমাদের অনিষ্টকারী নহেন । যজ্ঞের অঙ্গীভূত হিংসার প্রধান ফল স্বীকার করিলে, সামান্য হিংসা নিষেধের বিষয় কোথায় থাকিবে ?—“যজ্ঞার্থে পশবঃ স্ফূট্যঃ” যজ্ঞের নিমিত্ত পশুর সৃষ্টি হইয়াছে ; সুতরাং—“যজ্ঞার্থে পশবো হন্তাঃ” যজ্ঞের নিমিত্ত পশুবধ করিবে ।

অতএব এই যে,—‘হিংসা করিবে’ এবং “অহিংসা পরমোধর্ম্যঃ”
সুতরাং—‘হিংসা করিবে না’ স্থলভেদেই এইরূপ বিকল্প কল্পনা হইয়া
থাকে অর্থাৎ যজ্ঞের অঙ্গীভূত হিংসা বিচিত্র ফল প্রদান করে;
সুতরাং তাহা বিরুদ্ধ নহে। কেবল সাধারণ হিংসাই পাপের কারণ
বলিয়া ত্যাজ্য ;—‘হিংসা করিবে’ ‘হিংসা করিবে না’—এই বাক্যের
অবিরোধিতা সম্পন্ন হইল।’

অতএব, মহর্ষি শাণ্ডিল্যের উক্তিতে তন্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে হিংসাদি
বর্ণিত আছে বলিয়া উক্ত শাস্ত্রদ্বয় ভগবন্তের হেয় নহে, উপাদেয়।
কেন না, যে হিংসা—দারুণ দুঃখের কারণ, বিধিবিচনে তাহারই নিষেধ
অনুমান হইতেছে। সুতরাং যজ্ঞের অঙ্গীভূত পশু-বধ-জনিত অল্প দুঃখ-
সুখাদি প্রধান ফলের অন্তরায় নহে। প্রবল পুণ্যার্জনার্থ অল্প পাপ
দূষণীয় নহে। তবে—“রক্ষোপজীবি পশুহা রোরবং নরকং ব্রজেৎ”
নট-মল্লাদি-বুদ্ভি-অবলম্বনকারী মানব, বিড়াল, কুক্কট, ছাগ, কুকুর,
বরাহ, মৎস্য ও পক্ষী প্রভৃতি নিরীহ প্রাণী সকলকে জীবিকার্থ বধ
করিলে, সেই ব্যক্তি রোরব নরকে যায়। এই সমুদয় ব্যাপার যে
সকল শাস্ত্রে কথিত আছে, তাহা ভগবন্তের পক্ষে অপাঠ্য হইলেও,
তাজ্য নহে; তন্ত্ৰিন্ন অগ্ন্যাগ্ন শাস্ত্র ত্যাজ্য। কিন্তু, তাই বলিয়া, শাস্ত্র-
বিধি কদাচলঙ্ঘন করিবে না; কেন না, ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন,—

“যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।

জ্ঞান্ শাস্ত্ররিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহাসি॥”

ভগবদ্গীতা । ১৬

‘যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া, কামাচারে অর্থাৎ
স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে কদাচ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, সুখ প্রাপ্ত হয়
না এবং পরম গতিও প্রাপ্ত হয় না। অতএব কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থা-

[৪র্থ খণ্ড]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

৫৭

বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ ; সুতরাং শাস্ত্রের মৰ্ম বুঝিয়া, শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম অবগত হইয়া, তাহার অনুষ্ঠান করিবে।

মূল কথা শাস্ত্রে শ্রদ্ধা থাকা চাই,—জন্মান্তরীণ স্মৃতির ফলে ভগবৎ-রূপা-বলে,—শাস্ত্রে শ্রদ্ধা হইলে, তবেই নাম-সাধনে স্মৃতির আশা আছে ; নতুবা নহে। শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির নাম-কীর্তনে লাভ নাই ; কেন না, শাস্ত্র ভগবদ্বাক্য, তাহাতে শ্রদ্ধাশূণ্য হইলে, ভগবানে শ্রদ্ধা থাকিতে পারে কি ? শাস্ত্রে শ্রদ্ধা করিলে, ভগবানে শ্রদ্ধা করা হয়, ভগবানে শ্রদ্ধা করিলে,—সিদ্ধি, সুখ ও পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্র কহিয়াছেন,—“বাদৃশী বাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধিৰ্ভবতি তাদৃশী” শাস্ত্র বা ভগবানের প্রতি তোমার যে প্রকার শ্রদ্ধার বিকাশ হইবে, তুমি সেই প্রকারই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ভূতভাবন ভগবান্ মহেশ্বর কহিয়াছেন,—

“অন্যানি চৈব শাস্ত্রানি লোকেহস্মিন্মোহনানি চ।

বেদবাদবিরুদ্ধানি ময়ৈব কথিতানি তু ॥

বামং পাশুপতং বোগং নাকুলং চৈব ভৈরবম্।

অসেব্যমেব কথিতং বেদবাহু তথৈতরং ॥”

কুৰ্মপুরাণ। উপরি।

‘ইহলোকে শ্রুতি-স্মৃতি ভিন্ন অণু বাবতীয় শাস্ত্র সকল, কলি-কলুষিত কামনা-বিজড়িত মানবের চিন্তকে, বাহা দূষিত, তাহাকে আরও দূষিত করে ; বাহা পাপ-পঙ্কিল, তাহাকে আরও কৰ্দমাক্ত করে ; বাহা অন্ধকারময়, তাহাকে আরও তমসচ্ছন্ন করে ; সারল্যের শুভ্র আচ্ছাদন ভেদ করিয়া, কোটিল্যের দীপ্ত প্রকাশিত করে ; আর অজ্ঞানের ঘোর ঘনঘটাচ্ছায়ায় জ্ঞানের আলোক নিম্প্রভ হয়। শাস্ত্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক নির্বাপিত হইয়া যায় ; শিষ্টাচারের সৌজ্য লোপ পায়, প্রেমের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। কেন না,

ইহা পাশবিক শক্তি সকলকে উত্তেজিত করে, মানসিক শক্তি নিচয়ের মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা করে। ইহা মানবের স্বাস্থ্যের বিষ, মনের বিভ্রম, চরিত্রের অন্তরায় ; জিহ্বার স্বাধীনতা, চরণের অবাধগতি, হস্তের মুক্তি, মায়ার প্রলোভন, ক্রোধের রক্তমা, হিংসার বহু, অহঙ্কারের জ্বালা। আমি জানি যে, এই শাস্ত্র সকল মানবের পাপ-প্রবুদ্ধিকর ; ইহা মানবের চিন্তকে স্বাধীন ইচ্ছাবৃত্তির প্রলোভনের প্ররোচনার পথে ছাড়িয়া দেয়, কাজেই মানবচিন্ত প্রলোভনের নিকট সহজেই পরাস্ত হয় ; সে প্রলোভনকে পরাস্ত করিতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলেও আমিই সেই সকল শাস্ত্রের প্রণীতা, আমিই সেই সকল শাস্ত্রে লোককে বিমোহিত করিবার নিমিত্ত বাগাড়ম্বর বিস্তার করিয়াছি। যাহা বেদ-বিরুদ্ধ শাস্ত্র, তাহা সকলেরই অসেব্য ও অশ্রাব্য। বামমত, পাশুপতমত, যোগমত, নকুলীশমত, ভৈরবমত, এ সকল বেদ-বিরুদ্ধ শাস্ত্র,—এ গুলি বৈষ্ণব ভগবন্তের অসেব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। কেন না, এইগুলি বেদ-বিরুদ্ধ ও বেদ হইতে ইতর শাস্ত্র।

অতএব, এই সকল শাস্ত্রের কথিত বিষয় আচরণ করিবে না বা শুনিবে না ; কিন্তু তাই বলিয়া, সেই সকল শাস্ত্রের নিন্দা করিতে কদাচ লাফাইয়া পড়িও না ;—শাস্ত্রের নিন্দা করা মহাপাপ। মনে রাখিবে যে, ইহলোকে যাহা শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ, সেই সকল শাস্ত্রে নিষ্ঠা করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হয় ; কারণ, সেই সকল শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ শাস্ত্রের নিষ্ঠাকে তাগসী নিষ্ঠা বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্মরণ্য তাহা সর্বতোভাবে হয় ; তা বলিয়া নিন্দনীয় নহে ; দেবতা-নিন্দা ও শাস্ত্রনিন্দা যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি দেবতা, গুরু ও শাস্ত্রনিন্দা করে, সে ব্যক্তির নিকৃতির উপায় কোনও শাস্ত্রে দেখা যায় না। অতএব, যে স্থানে গুরুনিন্দা, সাধুনিন্দা, দেবনিন্দা বা শাস্ত্রনিন্দা কেহ করিবে, সে স্থান অবিলম্বে পরিত্যাগপূর্বক দূরে

[৪র্থ খণ্ড]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

৫৯

সরিয়া যাইবে অথবা মৌনাবলম্বন করিবে, কিছুমাত্রই উত্তর করিবে না ; এমন কি, ঐ নিন্দাকারী ব্যক্তিদিগকে অবলোকনও করিবে না এবং কণ আচ্ছাদনপূর্বক সে স্থান হইতে অস্থ স্থানে গমন করিবে । কেন না, শাস্ত্র, গুরু, বেদ ও দেব নিন্দা শুনিলে, নামাপরাধে অপরাধী হইতে হয় । শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

“স ভিত্ততে বেদময়ঃ স বেদঃ,
করোতি ভেদৈবহুভিঃ সশাখম্ ।
শাখা প্রণেতা স সমস্ত শাখা,
জ্ঞানস্বরূপো ভগবাননন্তঃ ॥”

বিশেষ্বর বিশ্বরূপ বিরাট-পুরুষ সর্ববিশ্বর সর্বরূপ সর্ব-স্বরূপ ভগবান্ অনন্তদেব, একমাত্র বেদ-স্বরূপ ; অথচ, শাখাদি ভেদে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন । তিনিই বেদকে বহু শাখায় বিভক্ত করিয়া, সেই সমুদয় শাখা-বেদের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন । তিনিই বেদের শাখা-রচয়িতা ; সুতরাং তিনিই সমস্ত শাখা-স্বরূপ । তিনিই জ্ঞান-স্বরূপ, ভগবান্ এবং অনন্ত । অতএব, বেদ বা অস্থান শাস্ত্রের নিন্দা করিলে, তাঁহারই নিন্দা করা হয় । বাহাই হউক,—

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি,
ভক্তপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠনকোবিদেতি ।
নাথেতি নাগশয়নেতি জনম্বিবাসে—
ত্যালাপিনং প্রতিদিনংকুরু মাং মুকুন্দ ॥
মুকুন্দমালাস্তোত্র ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

নামে অর্থবাদ-কল্পনা

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি পূর্বের বলিয়াছেন যে,—‘পঞ্চম নামাপরাধ—নাম-মাহাত্ম্যকে অর্থবাদ বলিয়া মনে করা । যে নরাদম ভগবন্নামে অর্থবাদের আরোপ করে, তাহার অর্জিত পুণ্যরাশি অর্থবাদ-রূপে পরিণত হয় অর্থাৎ বিফলে যায়।’ অতএব, নাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ কি ? অর্থবাদ কাহাকে বলে ?

প্রকরণঃ প্রতিপাদ্য তত্র তত্র প্রশংসনং অর্থবাদঃ ।

বেদান্তসার । ৭৭

অর্থবাদের অর্থ—স্তুতিবাদ অর্থাৎ প্রশংসা, গুণ-কীর্তন, সাভিপ্রায় উক্তি ইত্যাদি । যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদিত হইবে, সেই প্রকরণের মধ্যে বার বার সেই প্রতিপাদ্য বস্তুর উল্লেখ করা অর্থাৎ প্রকরণ প্রতিপাদ্যের কিংবা তৎসাধন অনুর্ত্তানের প্রয়োজন বর্ণনা অর্থাৎ প্রতিপাদ্য—বর্ণনীয় বস্তুর প্রশংসা । যথা,—“আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদ তস্মৈ তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে” অর্থাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন,—‘আচার্য্যাবান্ ব্যক্তিই ভগবান্কে জানিতে পারেন, অশ্রুতি পারে না । ভগবন্ত্বজ্ঞের মুক্তি হইতে সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না তাহার দেহপাত হয় । দেহপাত হইলেই ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়।’ ইত্যাদি প্রকারে ভগবজ্জ্ঞানের ভগবল্লাভরূপ ফল বা প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে । উক্ত শ্রুতির উক্ত অধ্যায়ে প্রতিপাদ্য অর্থাৎ বর্ণনীয় অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে, গুরু এইরূপে প্রশংসা করিয়াছেন যে,—‘ঐহাকে গুনিলে, অশ্রুত বস্তুরও শ্রবণ সিদ্ধ হয়, যাহা কখনও মনে করা হয়

[৪র্থ খণ্ড]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

৬১

নাই, তাঁহাও মনে করা হয়, অজ্ঞাত পরমার্থের জ্ঞান হয় ; ইত্যাদিকেই অর্থবাদ বলে । এই অর্থবাদও আবার, তিন প্রকার ; যথা,—

বিরোধে গুণবাদঃ শ্রাদানুবাদোহবধারিতে ।

ভূতার্থবাদস্তদ্বাদানুবাদবধারিতঃ । মতঃ ॥

ভট্ট ।

গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ । গুণবাদ অর্থাৎ দাতা, অল্প জামান্ন গো, হিরণ্য ও ভূম্যাদি দান করিলে, গৃহীতা তাঁহাকে অলৌকিক বিশেষণে ভূষিত করিয়া, তাঁহার দানশৌণ্ডিকতা লোকসমাজে প্রকাশ পূর্বক, তাঁহার গুণানুবাদ করেন ; ইহাকেই বলে ‘গুণানুবাদ’ । অনুবাদ অর্থাৎ—“অবধারিতে প্রমাণাস্তরসিদ্ধেহর্থে যো বাদঃ” নির্দ্ধারিত প্রমাণাস্তর সিদ্ধার্থ যে বাদ অর্থাৎ অন্তরীক্ষে অগ্নি চয়ন কর, অগ্নিই ইহার ঔষধ ইত্যাদি । কিন্তু, অন্তরীক্ষে অগ্নি চয়ন অসম্ভব ; তাহার অভাবের ও নাশের লৌকিক প্রমাণ দ্বারা অনুবাদ । তাহার হানি ও তাহার বিরোধের অভাবে ভূতার্থবাদ । যেমন দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রহ্মহনু ইত্যাদি । এই ভূতার্থবাদও আবার দুই প্রকার ;— “স্তূত্যর্থবাদো নিন্দার্থবাদশ্চ ।” স্তূত্যর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ । ভ্রমধ্যে স্তূত্যর্থবাদ যথা,—“সন্ধ্যামুপাসতে যে চ” অর্থাৎ যাঁহারা সন্ধ্যা উপাসনা করেন, তাঁহারাই দ্বিজ ও পবিত্রচেতাঃ ইত্যাদিরূপ স্তুতি করাকে স্তূত্যর্থবাদ বলে । আর নিন্দার্থবাদ যথা,—“দ্বীতৈলমাংস-সন্তোগী পর্বষেতেষু বৈ পুমান্ । বিন্মূত্রভোজনং নাম প্রযাতি নরকং যুতঃ ॥” অর্থাৎ যে ব্যক্তি পর্বদিবসে অর্থাৎ চতুর্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্তা ও সংক্রান্তিতে দ্বীসন্তোগ, তৈলমর্দন ও মাংসভক্ষণ করে, সে যুত হইলে, নরকে যায় ; কেন না, পর্বদিনে দ্বীসন্তোগ তৈলমর্দন ও মাংসভোজন নিষিদ্ধ ; শাস্ত্রবিহিত নিষিদ্ধ দিনে উক্তরূপ আচরণ করিলে, ইহলোকে নিন্দাই হইতে হয় এবং যুত হইলে

পরলোকে বিগ্নভোজন নামক নরকে গমন করিবে, ইত্যাদিকেই
নিন্দার্থবাদ বলে । হিন্দু ধর্ম, হিন্দুর অনন্ত শাস্ত্র, অনন্ত মহার্ণবের
স্বরূপ । ইহার প্রত্যেক নদ-নদীতে, প্রত্যেক বীচিতে, প্রত্যেক তরঙ্গে,
প্রত্যেক বৃদ্ধদে, প্রত্যেক ফেনে, স্তরে স্তরে নাম-মাহাত্ম্য বিরাজমান ;
সে গুলিকে অর্থবাদ-স্বরূপ—‘আপাতঃ মধুর প্রলোভন-বাক্য মাত্র
মনে করা’,—নামাপরাধ । কেন না, স্মৃতমুনি মুনিসকলকে বড় ক্রোধের
সহিত কহিতেছেন,—

“অহো হি বাক্যো চতুরঙ্করে ধ্ব,
পুণ্যস্ত পাপস্ত নিদানভূতে ।
উচ্চারণাদেব নৃণাং মুনীন্দ্রা—
নারায়ণশ্চেতি তথার্থবাদঃ ॥ ”

বৃহন্নারদপুরাণ : ১

‘ইহলোকে দুইটি চারি অঙ্কের কথা আছে, উচ্চারণমাত্রেই
একটি পুণ্যের নিদান ; আর, একটি পাপের আদিকারণ । অর্থাৎ
একটিকে উচ্চারণ করিবামাত্রই অশেষ পাপরাশি নাশ পায় ও পুণ্যপুঞ্জ
সঞ্চিত হয় এবং অপরটি উচ্চারণ করিবামাত্রই পুণ্যপুঞ্জ নাশ পাইয়া,
সুপীড়িত পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে । হে মুনীন্দ্রগণ ! তাহা আর কিছ
নয়, সেই নামদ্বয় হইল,—‘নারায়ণ’ আর,—‘অর্থবাদ ।’

অতএর, মোক্ষদায়ক ভগবন্নাম-মাহাত্ম্যকে যাহারা ‘অর্থবাদ’
পূর্ণ বলে, তাহারা অশেষ পাপার্জন করিয়া, মৃত হইলে, নরকে যায় ।
বৈদিক কর্মকাণ্ডে অর্থবাদের প্রচুর পরিচয় আছে । বেদে বিধির
প্ররোচক এবং নিষেধের উত্তেজক-রূপে অর্থবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ।
অর্থবাদ বাক্যগুলি সহজতঃ প্রতিপাত্ত বিষয় বুঝায় না ; কিন্তু বিধি
বা নিষেধ বাক্যের সহিত একবাক্যতা প্রাপ্ত হইয়া, বিধেয়ের প্রশংসা
অথবা নিষিদ্ধের নিন্দা বুঝায় । বেদে উক্ত আছে যে,—“গাবঃ
সত্রমাসত বনস্পত্যঃ সত্রমাসত” অর্থাৎ গরুরা সত্রযজ্ঞ করিয়াছিল,

[৬র্থ খণ্ড]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

৩৩

বনম্পতির সত্ৰযজ্ঞ করিয়াছিল। এই বাক্যগুলি সত্ৰযজ্ঞ-বিধির স্তুতিবাদ মাত্র। এই সকল বাক্যের বাহা সহজ অর্থ অর্থাৎ গরু ও বনম্পতিগণের সত্ৰযজ্ঞানুষ্ঠান, তাহা অসম্ভব। বস্তুতঃ গরুরা ও বৃক্ষেরা সত্ৰযজ্ঞ করে নাই, করিতেও পারে না ; অথচ, ঐ বাক্যগুলি নিরর্থক নহে। কারণ, উহাদের তাৎপর্যার্থ এই—‘সত্ৰযজ্ঞ এমনই উৎকৃষ্ট যে, গরুরা এবং বনম্পতির পর্য্যন্ত ইহার অনুষ্ঠান করিয়াছিল। যদিও তাহারা করে নাই ; অতএব, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ সত্ৰযজ্ঞ অবশ্যই করিবেন।’ এখানে অপ্রকৃত গরুদের ও বৃক্ষগণের সত্ৰানুষ্ঠান বর্ণনা অর্থাৎ প্রশংসাকথা কেবল উপযুক্ত অধিকারীর প্ররোচনার জন্তই গ্রথিত হইয়াছে। যেমন নীতিশাস্ত্রে উক্ত আছে যে,—“মূর্থানাশাপদং দৃষ্ট্বা প্ররুদন্ত্যৎপলা অপি” মূঢ়জনগণের বিপদ দেখিয়া, পাষণেরও যে দুঃখ হয়, তাহারা তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যে কাঁদিয়া ফেলে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? পরন্তু, পাষণ কখনও রোদন করে না, পাষণ নিঃস্রাব পদার্থ হইয়া, মানুষের আপদ দেখিয়া, রোদন করে, দুঃখ প্রকাশ করে। এই কথা বলিলে, এই বুঝিতে হইবে যে, চেতন সজীব পদার্থ মানুষ, অশ্বের দুঃখ দর্শনে দুঃখিত হইয়া, আপন দুঃখের প্রতিকার করিবে, এইরূপ উদ্ভেজনা-বাক্য দ্বারা মানুষকে দুঃখ-নিবৃত্তি-সাধনায় প্ররোচনা করা হইতেছে, বুঝিতে হইবে। অনেক নীতি-নিপুণ নাস্তিকমতি অশ্রদ্ধ জনের ধারণা এই যে,—‘নাম-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক বাক্যগুলির তাৎপর্য্য কেবল প্রশংসামাত্র, উহার সহজ অর্থ অর্থার্থ।’ এইরূপ অযথা বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়া, বাহারা নাম-কীৰ্ত্তনে শ্রদ্ধাহীন হইয়া, অন্য উপায় অবলম্বন করে, এবং পরকে উপদেশ দিয়া স্বীয় মতে আনয়ন করে, তাহাদের এরূপ অনর্থ আচরণই অর্থবাদ-রূপ নামাপরাধ হয় ; তাহাদের তাহাতে ইহ-পর উভয় কালে দুঃখভোগ ঘটিয়া থাক।

লৌহোড়ুপেন প্রতরনিমজ্জত্বাদকে যথা ।

তথৈবাকৃতপুণ্যাস্তু ভারয়ন্তি কথং পরাম্ ॥

বৃহন্নারদপুরাণ । ৯

লৌহময় উড়ুপ অর্থাৎ ভেলা দ্বারা জল উত্তীর্ণ হইতে গেলে, যেমন জলমধ্যেই নিমগ্ন হইতে হয়, সেইরূপ ঘাহারা অকৃতপুণ্য, তাহারা হরিনামসাধনা পরিত্যাগপূর্বক অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া, স্বয়ংই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে অশক্তি; সুতরাং অগ্নিকে কি প্রকারে নিস্তার করিবে ?

প্রকৃত প্রস্তাবে নামমাহাত্ম্য স্তুতিবাদ মাত্র নয়; ইহা সম্পূর্ণ সত্য ও সাধু-ভক্তগণের শতসহস্রস্থানে সুপরীক্ষিত । গজকুস্তীরের সংগ্রামকালে যখন কুস্তীর গজরাজের পদে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন গজরাজ অনন্তোপায় হইয়া, শুণ্ড উত্তোলনকরতঃ বলিয়াছিল, --‘হে ব্রহ্মেশ ! হে দেবেশ ! হে শক্তোশ ! আমাকে পবিত্রাণ কর’ গজরাজের এইরূপ কাতরোদ্বেলিত প্রাণে নাম-কীর্তনে নারায়ণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—‘করিবর ! শোক করিও না’ এই বলিয়া চক্রান্ত-প্রভাবে কুস্তীরের মুখ হইতে গজরাজকে ভগবান রক্ষা করিয়াছিলেন । যখন দুর্ঘটচিত্ত দুর্ঘোধন সভামধ্যে দ্রোপদীর কেশাকর্ষণপূর্বক দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ করিতেছিল, তখন দ্রুপদ-কুমারী নিরুপায় ভাবিয়া,—‘হা কৃষ্ণ ! হা অচ্যুত ! হা করুণাজলনিধে ! হা পাণ্ডবগতে ! তুমি কোথায় আছ ? দুর্ঘোধন সভামধ্যে আমাকে অবমানিত করিতেছে, এই অনাথা দ্রোপদীকে অধুনা রক্ষা কর’ বলিয়া কাতরতার ছায়ামণ্ডিত হইয়া, কাতরোদ্বেলিত প্রাণে নাম কীর্তন করিলে, দ্রোপদীর এই সকল কাতরোক্তি শ্রবণে জনার্দন অক্ষয় বসন দ্বারা কৃষ্ণার তনু-বষ্টি রক্ষিত করিয়া, দ্রুপদনন্দিনীকে রক্ষা করিয়াছিলেন । এইরূপে বিবিধ ভক্ত-চরিত্র অনুশীলন করিলে, নাম-মাহাত্ম্যের অসীম শক্তি ও অপরিমেয় গুণের পরিচয় পাওয়া যায় । অতএব, যে

[৪র্থ খণ্ড]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

৬৫

নাম-সুখা পান করিলে, নিখিল সম্ভাপ বিদূরিত হয়, যে নাম শ্রবণে দুর্জ্জন লোকও আশু অপার সংসার-সাগর পার হইয়া, নিত্যধাম বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে, সে নাম-মাহাত্ম্যকে অর্থবাদ মনে করা স্বকৃত্য বৈ আর কিছুই নয়। নাম-মাহাত্ম্য যখন শাস্ত্রসিদ্ধ ও সাধু-সেবিত যথার্থ তথ্য, এমন কি পবিত্র-চিত্ত ভগবন্তের পরম পথ্য, তখন ইহাকে স্তুতিবাদ মনে করায় যে অপরাধ হয়, তাহাতে সংশয় কোথায় ? পরম ভক্ত দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—

‘হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময় ।

ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥

শিব শঙ্কর রুদ্রেশ নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন ।

ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তে বাধতে কলিঃ ॥”

বৃহন্নারদপুরাণ ।৯

‘ঐহারা, হে হরে ! হে গোবিন্দ ! হে কেশব ! হে বাসুদেব ! হে জগন্ময় !—কিংবা হে শিব ! হে শঙ্কর ! হে রুদ্রেশ ! হে নীলকণ্ঠ ! হে ত্রিলোচন !—এইরূপ অহর্নিশ নাম কীর্তন করেন ; তাহাদিগকে কলি কদাচ কোনরূপ ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না । তাহারা কৃতার্থ হন ; ইহাতে কোন সংশয় নাই।’ ভক্তি-বহির্ভূত অভক্ত অভাজন অবিশ্বাসীদিগের ধারণা এই যে, নামের কোনও শক্তি নাই,—“স্বচিন্তিতং চৌষধমাতুরাণাং, ন নামমাত্রেন কেরোত্যরোগম্ ।” যেমন রোগার্ভ ব্যক্তি কেবল মাত্র ঔষধের চিন্তা বা নামোচ্চারণ করিলে, তাহার রোগারোগ্য হয় না, তদ্রূপ কেবলমাত্র নামোচ্চারণ করিলে কি মানুষের ভবরোগ সারে ? এই সকল দুর্নীতি-পরায়ণ দুর্বুদ্ধি মানব বুঝে না যে, ঔষধ যেরূপ স্বল্পবীৰ্য্য জড়বস্তু, সর্ব-শক্তিমান্ সর্বশাস্ত্রসার ভগবানের ‘নাম’ সেরূপ নয় । সর্বশক্তিমান্ ভগবানের নামের মধ্যে যে, বহিতে দাহিকা-শক্তির ন্যায় চতুর্বর্গ-

দায়িনী সর্বপাপহারিণী অসীম অনন্ত অপূর্ব শক্তি বিরাজ করে, তাহা অভক্ত অভাজনের বুদ্ধির বিষয় নয়। নামে মজিলেই নাম-মাহাত্ম্য বুঝিতে পারা যায়। স্বয়ং ভগবান্ ইহার শত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। ভক্তগণ লক্ষ লক্ষ স্থলে প্রমাণ পাইয়া, তাঁহার কহিয়াছেন,—“মম্বনাদৃশ্যতে হৃদিস্তদ্বদ্বান্মা চ বৈ হরিঃ।” যেমন কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি থাকে, তাহা বুঝিতে বা জানিতে পারা যায় না ; কিন্তু, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে, অগ্নি দর্শন হয়, সেইরূপ নামে মজিয়া, আপনার সত্তা নামে ডুবাওয়া, অহর্নিশ নাম সাধন করিতে পারিলে, নামের মধ্যে শক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীহরির অনুভূতি হইয়া থাকে। অতএব, নাম-মাহাত্ম্যে বিশ্বাস কর, অবিশ্বাসী হইলে, নামের শক্তি বুঝিতে পারিবে না। মাতেশ্বরী ক্রটি কহিয়াছেন,—

“অসংশয়বতাং মুক্তিঃ সংশয়াবিক্চেতসাম্।

ন মুক্তির্জন্মজন্মান্তে তস্মাদ্বিশ্বাসমাগ্নুয়াৎ ॥”

বিশ্বাসই মূলধার। তাই ভক্তগণ কহিয়া থাকেন,—“বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।” অর্থাৎ ভগবানে বিশ্বাস থাকিলে, তাঁহাকে সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় ; কিন্তু হৃদয়ে অবিশ্বাস থাকিলে,—অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে — অনন্তে, আকাশে, অবনী-মণ্ডলে,—জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম-বিশ্ব-চরাচরে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইলেও, তাঁহাকে পাওয়া যায় না ; তিনি কাহারও অনুভূতিতে আসেন না। অতএব, নাম-মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করিয়া, নাম সাধন করিতে করিতে, অহর্নিশ বাহিরের সর্ববস্তুতে তাঁহাকে খুঁজিতে থাক। বাহিরে যদি না পাও, তবে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ স্থাবর-জঙ্গম চরাচরের অন্তরে এবং স্বীয় হৃদয়কমলের রক্তিম-দলের কর্ণিকাভ্যন্তরে অহর্নিশ খুঁজিয়া বেড়াও,—প্রাণেশ্বর বলিয়া, কাতরো-বেলিত প্রাণে ডাকিতে থাক, আবেগভরে আকুল-প্রাণে ডাকিলে, তাঁহার কাণে তোমার আর্তনাদ পৌঁছবে, তিনি সাড়া দিবেন, তুমি

[৪র্থ খণ্ড]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৬৭

তাহা বুঝিতে পারিবে। কাতর-প্রাণে প্রেম করিয়া, ভক্তিভরে তাঁহাকে যে জন ডাকিতে পারে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সাড়া দিয়া থাকেন। যদিও তাঁহাকে কোন ভক্ত বা যোগিজন আপন হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে, প্রেম-ডোরে বাঁধিয়া, ভক্তি-আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া, ঢাকিয়া রাখেন, তিনি তদবস্থায় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে ঢাকিয়া থাকিলেও, ধরা পড়িবেন; সংশয় নাই। পরন্তু, মনে যদি কণামাত্র সংশয় বা অবিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ডাকিয়াও, তাঁহাকে ধরিতে পারিবে না বা তাঁহার সাড়াও পাইবে না। হৃদয়ে বিশ্বাস থাকা চাই,—হৃদয় সংশয়-শূন্য হওয়া চাই। অবিশ্বাসী অভাজন মানুষের তিনি অনেক দূরে থাকেন,—অবিশ্বাসী মানব জন্ম-জন্মান্তরেও তাঁহাকে ধরিতে পারে না; কেন না, অসন্ধিদ্ধ-চিত্ত বিশ্বাসী ভক্তজনেরই তিনি সহজ-লভ্য। সংশয়াপন্ন অবিশ্বাসী মানব, বৃহস্পতির ন্যায় অগাধ বিচ্যায় পণ্ডিত হইলেও, জন্ম-জন্মান্তর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও, তাঁহার নিদর্শন পান নাই;—“তস্মাদ্বিশ্বাস-মাপ্নুয়াৎ।” অতএব সংশয়হীন হইয়া, তাঁহার নাম-মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করিয়া, ভক্তি-সহকারে তাঁহার নাম কীর্তন করিতে করিতে, তাঁহাকে খুঁজিতে থাক—ডাকিতে থাক, তিনি সত্তরে ধরা পড়িবেন,—তুমিও সহজে তাঁহাকে ধরিতে পারিবে এবং দেখিতে পাইবে। তাহা না করিয়া, নাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসী হইলে, নামের নিকট অপরাধী হইতে হয় এবং কীর্তন, নর্তন, ক্রন্দন সবই বৃথা ও নিষ্ফলে যায়। নাম-মাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকিলে, নাম কীর্তন করিতে করিতে,—“আনন্দাশ্রু-পুলকেন দশাভাব প্রজায়তে।” কিন্তু নাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসী হইলে, ‘দশাভাব’ কেবল দুর্দশা হইয়া থাকে। তাই বলি—নামসাধক! নাম-মাহাত্ম্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে; কেন না, নাম-মাহাত্ম্যে বিশ্বাস ব্যতীত কীর্তন, নর্তন, ক্রন্দন সবই বৃথা হয়, নিষ্ফলে যায়।

তুমি যদিও নাম-সাধন-সম্পন্ন ; কিন্তু, তথাপি এরূপ অবিশ্বাস ও সংশয়-মূষিককে হৃদয়ে স্থান দিলে, তোমার সে সর্বনাশ করিবে ; সে যদি তোমার হৃদয়ে স্থান পায়, তবে হৃদয়ে থাকিয়া হৃদয়-সিংহাসনের ভক্তি-আস্তরণ, শ্রদ্ধা-বিতান ও বিশ্বাস-বালরকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে, তাহার অস্তিত্বের নিদর্শনও পাইবে না । অতএব, যাহাতে অবিশ্বাস মূষিক তোমার হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক থাকিয়া, অহর্নিশ নাম সাধনে নিরত হইয়া, মনে প্রাণে এক করিয়া বলিতে থাকিবে— “ জয় কৃষ্ণ মনোহর ষোড়শধরে, যত্ননন্দন নন্দকিশোর হরে । ”

আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম

নারায়ণানন্ত নিরাময়েতি ।

বক্তুং সমর্থোহপি ন বক্তি কশ্চি—

দহৌ জনানাং বাসনানি মোক্ষে ॥

মুকুন্দমালাস্তোত্র ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

—০—

নামের আবরণে পাপের আচরণ ।

—(০)—

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি পূর্বে বলিয়াছেন যে,—‘ষষ্ঠ নামাপরাধ—নামের আবরণে পাপের আচরণ । যাহারা এরূপ নামের আবরণে পাপের আচরণ করে, তাহারা নামাপরাধী হইয়া, নরকে যায় ।’ সুতরাং নামের আবরণে পাপের আচরণ কিরূপ ?

মুণ্ডী জটী বন্ধনবাংজ্রিদণ্ডী,
কষায়বাসা ব্রতকর্ষিতাঙ্গঃ ।

তাত্ত্বিকো বা যদি নাপ্ততত্ত্ব—

স্তদা তু ততোভয়মেব নষ্টম্ ॥

নামের আবরণে পাপের আচরণ কিরূপ ? না, মুখে হরিনাম-কীর্তন, অন্তরে পাপ-চিন্তন ;—মুখে ‘ধর্ম-ধর্ম’, অন্তরে অপকর্ম ;—প্রকাশে কামিনী-ত্যাগ, গোপনে কামের বাগ ;—বাহিরে সংসার-বিরাগ, অন্তরে তাহাতেই অনুরাগ ;—বাহিরে ধর্মের ভান, ভিতরে অধর্মের ধ্যান ;—উপরে পুণ্যের ধ্বজা, ভিতরে পাপের মজা ;—উপরে ভগবন্তুক্ত, ভিতরে বোধিদানুরক্ত ;—বাহিরে যোগী, অন্তরে ভোগী ;—বাহিরে মুণ্ডী, অন্তরে পাষণ্ডী ;—সর্বদা তিলক ছাপ, অন্তরে অসংখ্য পাপ ;—এ হেন পাষণ্ডের নাম-সাধন পণ্ডশ্রম মাত্র । উপরে মুণ্ডী, জটী, বন্ধনধারী, ত্রিদণ্ডী, কষায়বাস ; আর, অন্তরে কামিনী-কাঞ্চন-সহবাস থাকিলে, আমি কখনই ভক্ত হইতে পারি না,—এরূপ নামের আবরণে আবৃত হইয়া, লোক-সমাজে চলিলে কি

আমাকে ভগবানের কাছে অপরাধী হইতে হয় না ? প্রকাশে পাপাচরণ করিয়া, লোক-সমাজে পাপী হওয়া বরং ভাল ; কিন্তু, উপরে ধর্মের আবরণ রাখিয়া, ভিতরে কুকর্ম করিলে, তাহার পরিণতি অতি ভীষণ ! ঐ সকল “বকঃ পরমধার্মিকঃ” কুকর্মীর মর্মকথা দেশের দশজন না জানিতে পারে ; কিন্তু, “সর্বতোহক্ষিঃ” সর্বাস্ত্রধার্মী ভগবান্ ত সবই জানেন ! লোক-সমাজে লোক সকলকে সহজে ঠকান যায় ; কিন্তু, সেই চতুরচূড়ামণি শঠ-শিরোমণিকে ঠকান দায় ! —অতএব, তুমি মুণ্ডিতমুণ্ড হইয়া বা আপৃষ্ঠলব্ধিত ধরণী-চুম্বিত জটাজুটভার ধারণ করিয়া বা পুত্র-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া, বন্থলধারী হও অথবা গৈরিক বসনে তনু আবৃত করিয়া, ত্রিদণ্ড ধারণ কর কিংবা কুচ্ছাতিকুচ্ছ-ত্রতাচরণ পূর্বক শরীরকে কুশাতিকুশ করিয়া, তপঃশীর্ণ কঙ্কালসার শরীর লইয়া, লোক-সমাজে বিচরণ কর, কিংবা ঐহিক স্ত্রৈশ্বর্য্য-সন্তোগ পরিত্যাগ করিয়া, সংসার-কল্লোল কোলাহল-গণ্ডগোলের অন্তরালে থাকিয়া, নিকামভাবে দিন যাপন কর ; কিন্তু যদি তোমার মন অশুদ্ধ থাকে, তবেই তোমার ঐ সকল ভান করা বৃথা,—আড়ম্বর মাত্র । যদি ঐরূপে লগ্ন হইয়াও, ভগবৎ-চরণাবিন্দে মগ্ন হইতে না পার, ভগবান্নাম কীর্তনে মন সংলগ্ন না হয়, তবে তোমার লগ্ন হইয়া, ফল কি ? বরং তোমা অপেক্ষা গৃহস্থাত্মমীকে শ্রেষ্ঠ বলিতে পারা যায় । কেন না, তাহার ইহ-পরকাল বজায় থাকে ; কিন্তু, তোমার উভয়কাল নষ্ট হইয়া যায়, তুমি ইহলোক হইতে ভ্রষ্ট এবং পরলোকেও নষ্ট হইয়া, নরক গমন করিতে হয় । এইরূপে বাহারা নামের আবরণে পাপের আচরণ করে, তাহাদিগের নরক গমন অবশ্যস্বাবী,—আজকাল অধিকাংশেরই এই অবস্থা ; ইহা আর বিশেষ কি কহিব ?—“জনা নষ্টা ভ্রষ্টা অহো কলিকাল প্রভবতি ।” এই জগুই শাস্ত্র গুরুগম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় কহিয়াছেন,—“ন ব্যাজেন

[৪র্থ খণ্ড]

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

৭১

চরেক্ষম্” ধৰ্ম্মাচরণে ভণ্ডামী রাখা উচিত নয় । অপিচ,—

ন ধৰ্ম্মস্থাপদেশেন পাপং কৃৎস্না ত্রতং চরেৎ ।

ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুৰ্ব্বন্ স্ত্রীশূদ্রলন্তনম্ ॥

প্রেত্যেহ চেদৃশো বিপ্রো গহৰ্ত্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ ।

ছদ্মনাচরিভঃ সচ ব্রতং রক্ষাংসি গচ্ছতি ॥

অলিঙ্গী লিঙ্গিবেশেন যো বৃত্তিমুপজীবতি ।

স লিঙ্গিনাং হরেদেনং তিৰ্য্যগ্-যোনৌ চ জায়তে ॥

বৈড়ালব্রতিনঃ পাপা লোকে ধৰ্ম্মবিনাশকাঃ !

সত্ত্বঃ পতন্তি পাপেষু কৰ্ম্মণস্তত্ত্ব তৎ ফলম্ ॥

পাষণ্ডিনো বিকৰ্ম্মস্থান্ বামাচারান্তথৈব চ ।

পঞ্চরাত্রান্ পাশুপতান্ বাঙ্-মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ ॥

কুৰ্ম্মপুরাণ । উপরি । ১৬

পাপ করিয়া, বাস্তবিক প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ প্রাজাপত্যাদি ব্রতচরণ করিবার সময়ে, অনেকে পাপ গোপন করিয়া,—‘আমি পুণ্যার্থ এই ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি, ইহা প্রায়শ্চিত্ত নহে’,—এইরূপ বাক্যে স্ত্রী ও শূদ্রাদি ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়া থাকে ; কিন্তু, এরূপ আচরণ করাও পাপ । অতএব, এরূপ লোক-সমাজকে মুগ্ধ করিবার নিমিত্ত কদাপি কোন কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিবে না । হল করিয়া যে ব্রতের আচরণ করা হয়, তাহা রাক্ষসদিগের ভোগ্য হয় ; স্তবরাং তাহা নিষ্ফল । পরন্তু, এরূপ ব্রতকারী বা ব্রতচারী ইহলোকে ও পরলোকে ব্রহ্মবাদিগণ কর্তৃক নিন্দিত হইয়া থাকে । যাহা যাহার লিঙ্গ নহে অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-বিহিত চিহ্ন নহে, সে যদি সেই সকল চিহ্নাদি ধারণ করিয়া, তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাহা হইলে, তদ্বারা সে বর্ণাশ্রমীদিগের পাপ গ্রহণ করে এবং সেই পাপে জন্মান্তরে তিৰ্য্যগ্-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে । ধৰ্ম্ম-বিনাশক, বিড়াল-ব্রতধারী সেই পাপীগণ পাপের ফলে, সত্ত্বই পতিত হয় ; তাহার সেই কৰ্ম্মের ইহাই ফল ।

পাষণ্ডী অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধমার্গাবলম্বী, বর্ণাস্তর-বৃত্তিজীবী, পঞ্চরাত্র-মতাবলম্বী, পাশুপতধর্মাবলম্বীদিগকে বাক্যদ্বারাও অর্চনা করিবে না ; পরন্তু দানে নিষেধ নাই। তাই বলিয়া, পাপীদিগকে স্থগা করিবে না, পাপকে স্থগা করিবে, তাহার আবরণ করিবে, তাহাকে স্থগা করা পাপ। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যে,—

পুংসাং জটাধরণমৌণ্ড্যবতাং স্থথৈব,

মোক্ষাশিনামখিলশৌচনিরাকৃতাম্ ।

ভোয়প্রদানপিভূপিণ্ড বহিষ্কৃতানাং ,

সন্তাষণাদপি নরা নরকং প্রয়াস্তি ॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৩। ১৮

নিরর্থকরূপধারী, বিনা কারণে মুগ্ধিত মুগ্ধ, দেবতাতিথি পূজা ন্যতিরেকে আহারকারী, সর্বপ্রকার শৌচহীন, তর্পণ কিংবা পিণ্ড-পিণ্ডদানে পরাস্থ,—এই সকল পাপাত্মাদিগের নাম পাষণ্ড, ভগবন্তভক্তজন ইহাদিগের সহিত আলাপ পর্যন্তও করিবে না। এই সকল ব্যক্তির সহিত সহবাস করা ত দূরের কথা, সন্তাষণ মাত্র করিলেও, মনুষ্যগণ নরকে গমন করে।

তাই বলি,—মানব ! যদি নামে প্রেম পাইতে চাও, তবে মনে-মুখে-কর্মে মিল কর। নতুবা,—“মনশ্চক্ষুঃশ্রবশ্চক্ষুঃ কৰ্ম্মণ্যশ্রুৎ” হইলে, বড়ই বিপদ,—সে দোষ অতীব দারুণ,—ঘোর অপরাধ ! অনেকে নামের ভরসায় স্বেচ্ছায় পাপের পসরা মাথায় তুলিয়া ভাবে যে,—“সমস্ত রাত্রি সমস্ত-রচিত প্রমোদোত্তানের প্রমোদাগারে প্রমদার সহিত আমোদ-আহ্লাদে কাটাইব, তাহাতে যে পাপ সঞ্চিত হইবে, ভোর বেলায় একবার—“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে” বলিলেই, সকল গোল মিটিয়া যাইবে,—পাপ-রূপ তুষাররাশি নাম-সূর্য্যোদয়ে গলিয়া জল হইয়া যাইবে ; অতএব, পাপ করিতে ভয় কি ?” কিন্তু, তাহার বুদ্ধি না যে, একরূপ ভাবা বা করা অমার্জ্জনীয়।

[৪র্থ খণ্ড]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

৭৩

বলিতে কি, এ ভাবের নাম-সাধনে এরূপ জ্ঞানকৃত পাপের স্তূপীভূত
তুষাররাশি গলে না, বরঞ্চ বেশী জমাট বাঁধে। সে পাপ খণ্ডাইবার
উপায়ান্তর নাই, কোথায় নাম-সাধনে পাপ-প্রকালন; আর কোথায়
বা তাহার পরিবর্তে অশেষ পাপের পসরা মস্তকে ধারণ।

ধর্ম্মঃ প্রসঙ্গাদপি নাচরন্তি,

পাপঃ প্রযত্নেন সমাচরন্তি।

আশ্চর্য্যমেতন্নি মনুষ্যলোকেহ—

মৃতং পরিত্যজ্য বিষং পিবন্তি ॥

মুভাবিতরত্নভাণ্ডাগার।

ধর্ম্মের প্রসঙ্গে থাকিয়া, ধর্ম্মাচরণে বিরত হইয়া, ধর্ম্মের ভাণ
করিয়া, যত্ন-সহকারে পাপাচরণ করিতে মানুষ অগ্রসর হইয়া থাকে;
এরূপ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, পাপাচরণ করা বড়ই অত্যাচার; ইহার
পরিণতি অতি ভীষণ! অহো! কি আশ্চর্য্য! মানুষ পাপের
পরিণতি বিষ এবং ধর্ম্মের পরিণাম অমৃত, ইহা জানিয়াও, তথাপি
পাপাচরণ হইতে বিরত হইতেছে না; হেলায় অমৃত পরিত্যাগ করিয়া,
বিষপান করিতে অগ্রসর হইতেছে! মানুষ! তোমার মুখের সংসারে,
আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ দৈব-দুর্বিপাক কে আনে? কোথা হইতে
আসে?—আজি ভূ-কম্পন, কালি জলোচ্ছ্বাস, পরশ মহামারী;—
এখানে বাত্যাবর্ত, সেখানে দিগ্‌দাহ, দূরান্তরে আগ্নেয়গিরির
অগ্নিস্রাব; তোমার শাস্তির সংসারের কোথাও দুর্ভিক্ষের দাবানল
জলিয়া উঠিয়াছে; কোথাও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগমে দেশ জলিয়া
পুড়িয়া যাইতেছে; কোথাও রণ-রাক্ষসীর লোল-রসনা লক্ লক্
করিতেছে; কোথাও প্লাবনের প্রবলোচ্ছ্বাসে দেশ ডুবিয়া ভাসিয়া ধসিয়া
ধসিয়া যাইতেছে; কোথাও বাত্যাবর্তের প্রকট প্রবাহে গৃহাদি উড়িয়া
যাইতেছে; কেন এমন হয়? কিসে ঘটে? কেহ বলিতে পার কি?

‘পুতিলে বিষফল, ফলিবে বিষফল, ফলে কি অমৃত ফল বিষফল
 শাখায়?’ গাছ পুতিলে, তাহার ফল হয়। তুমি যদি বিষের গাছপোত
 তাহাতে বিষফলই ফলিবে,—অমৃতফল ফলিবে না। তবে সে ফল একটু
 দেহিতে ফলে, পাপ করিলে, তাহার ফল অবশ্যই ফলিবে, সে ফল
 বিষময়। পাপাচরণকালে কেহ বুঝিতে পারে না যে, ইহার ফল
 অতি ভীষণ! কিন্তু, যখন তাহার ফল ফলে, তখনই বুঝিতে পারে;
 তখনই—‘জীবনের আশা ছাড়ি মৃত্যু করে কামনা।’ মানুষ,—“হসতা
 ক্রিয়তে কৰ্ম্ম রুদতা পরিভূজ্যতে।” হাসিতে হাসিতে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া
 থাকে বটে, কিন্তু, ফলভোগের সময় তাহাকে কঁাদিতে হয়।
 এখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, নামের আবরণে পাপাচরণ
 করিতেছ বটে; কিন্তু,—“ফলিবে যবে ফল, বুঝিবে ফলাফল,
 সুফল কি কুফল — ফলেন পরিচয়।” ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের
 অনুষ্ঠান হাসিতে হাসিতে করা যায়; বর্তমানে তাহার পরিণাম কেহ
 ভাবিতে পারে না; কিন্তু,—“একভুরুভয়োরেকদলয়োরেককাণ্ডয়োঃ।
 শালিশ্যামাকয়োৰ্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে ॥” একই ক্ষেত্রে শালিধান
 ও শ্যামধান জন্মে; উভয়েরই দল, কাণ্ড প্রভৃতি একরূপ; কিন্তু, ফলের
 দ্বারাই উভয়ের প্রভেদ জানিতে পারা যায়। তদ্রূপ পাপ-পুণ্য এক
 শরীরেই, এক মনেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; কিন্তু ফল ফলিবার
 সময় তারতম্য ঘটে,—পাপের ফল দুঃখভোগ, আর পুণ্যের ফলে
 সুখভোগ হয়। অতএব, অমৃতফল অর্থাৎ ‘মোক্ষফল’ ফেলিয়া দিয়া,
 বিষফল অর্থাৎ দুঃখ-ভোগ করিতে কেন চাও? অমৃতফল ত্যাগ
 করিয়া, কে বল, হলাহলের প্রার্থনা করিয়া থাকে? পাপাচরণ
 করিবার কালে সুখের আশায় করিয়া থাকে বটে; কিন্তু, পরিণামে
 আশানুযায়ী ফল পাইবে না; তাহার বিপরীত ফল প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং
 যদি শুভফল পাইতে চাও, তবে তাহার সদুপায় অবেষণ কর, সুখী
 হইতে পারিবে। তুমি সান্ত্বিত; সুতরাং তুমি অনন্তের জন্য লালায়িত;

[৪র্থ খণ্ড]

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

৭৫

তুমি অতি ক্ষুদ্র; সুতরাং তুমি মহতের আশ্রয়প্রার্থী ;— তুমি অসম্পূর্ণ, তাই তুমি সম্পূর্ণের জন্ত লালায়িত। মানুষের যাহা নাই, তাহাই পাইতে চায় ; কিন্তু, সে অভাব পূরণের জন্ত যাহা কর্তব্য, তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া মানুষ আপনি আপনার বিপদ ডাকিয়া আনে। ধর্ম্মাধর্ম্মের সুফল কুফল না চিনিয়া, মানুষ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও, সুফল পাইতে চায়; মানুষ! তুমি কুফল প্রাপ্তির উপায় কুকর্ম্ম করিয়া, সুফল প্রাপ্তির আশা কর কেমন করিয়া? তুমি কুকর্ম্ম করিয়াছ, তোমার ভাগ্যে অতি ভীষণ কর্ম্মফল দুঃখ ভোগ আছেই, তাহা তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে; তাহার অন্তথা হইবে না; কেন না, ভাগ্যফল আসল ফল, সে ফল কদাপি নকল হয় না,—‘অবিকল ফলে সে ফল, বিপরীত কে ফলায়?’ কাহারও সাধ্য নাই যে, সে ফলকে বিপরীত ভাবে ফলাইতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত,—অশ্বখ, বট ও নিম প্রভৃতি সুবিশাল বিটপী সকল শ্রান্তজনে আশ্রয়দানে ক্লান্তি দূর করে বটে; কিন্তু, তাহাদের ফলগুলি ইন্দ্রজালময়। একে ত ফলগুলি ক্ষুদ্র, তাহাতে আবার অখাদ্য ;— ফল ভক্ষণে পশ্চাত্তাপ ভোগ করিতে হয়; তদ্রূপ — “যত্তদগ্রেহ-মৃতোপমং পরিণামে বিষমিব” পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে, কণিক তুচ্ছ স্বপ্ন অনুভব করিয়া থাকে বটে; কিন্তু তাহার পরিণাম অতি ভীষণ! তাহা চিন্তা করিলে অন্তরাগ্না আলোড়িত হইয়া উঠে; এবং আত্মবিস্মৃত হইতে হয়। মহর্ষি পরাশর কহিয়াছেন,—

পাপং হি কর্ম্ম ফলতি পাপমেব স্বয়ং কৃতম্ ।

তস্মাৎ পাপিং ন স্বেভেত কর্ম্ম দুঃখফলোদয়ম্ ॥

পাপানুবন্ধং যৎ কর্ম্ম যত্বেপি স্যান্মহাফলম্ ।

তন্ম স্বেভেত মেধাবী শুচিঃ কুশলিনঃ যথা ॥

কিং কষ্টমনুপশ্যামি ফলং পাপস্ত কর্ম্মণঃ ।

প্রত্যাশন্নস্ত হি ততো নাত্মা তাবদ্বিরোচতে ॥

প্রত্যাপত্তিষ্চ যস্যেহ বালিশস্ত ন জায়তে ।

তত্ৰাপি স্তমহাংস্তাপঃ প্রস্থিতস্তোপজায়তে ॥”

পরশরগীতা । ২

‘অজ্ঞানকৃত পাপ তপস্যা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায় ; আর, জ্ঞানকৃত পাপ দুঃখরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে । অতএব দুঃখজনক পাপকার্যের অনুষ্ঠান করা কখনও বিধেয় নহে । যেমন পবিত্র পুরুষেরা চণ্ডালকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করেন, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তির পাপকার্য দ্বারা মহৎফল লাভ হইলেও, উহার অনুষ্ঠানে পরাশ্রুত হয়েন । পাপকার্যের ফল, অতি কুৎসিত । পাপাত্মারা পাপকার্যনিবন্ধন বিপরীতদৃষ্টি হইয়া, দেহাদিকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিয়া, আত্মাভিमानে আপনাকে সর্বশক্তিমান্ ভাবিয়া, আত্মপূজায় নিরত হয় । যে মুঢ় ব্যক্তি ইহলোকে বৈরাগ্য অবলম্বন না করে, তাহাকে নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকজনিত সম্ভ্রাণ ভোগ করিতে হয় । যেমন নীলাদিরাগে অরঞ্জিত বস্ত্র মলিন হইলে, ক্ষারাদি দ্বারা উহার শুভ্রতা সম্পাদন করা যায় ; কিন্তু, নীলাদিরাগে রঞ্জিত বস্ত্রের কোনরূপেই শুভ্রতা সম্পাদন করা যায় না, তদ্রূপ অজ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা বিনষ্ট হয় ; কিন্তু, জ্ঞানকৃত পাপের ধ্বংস হয় না ।’

বর্তমান, উন্নতির পথে আগুয়ান বিজ্ঞান, মানুষকে অজ্ঞান করিয়া দিয়াছে । মানুষ যতই জ্ঞান-গবেষণায় সমুন্নত হইতেছে, ততই তাহার জীবন বিকট দুঃখের আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে । মানুষ যতই ভাবিতে বুঝিতে শিখে, তাহার দুঃখ-দুর্দশার অগ্নি-শিখা ততই জ্বলিয়া উঠিতে থাকে । অবশ্য বিজ্ঞানের বলে, বুদ্ধির সাহায্যে তুমি আধি-ভৌতিক দুঃখ দমন করিতে পার সত্য ; কিন্তু, পাপের কবল হইতে নিজেকে কেমন করিয়া মুক্ত রাখিবে ? পাপ যে তোমাকে নিরন্তর নিরয়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে ; তোমার চতুর্দিকে নিত্য নূতন মায়াজাল বিস্তার করিতেছে ; বাহ্য দূষিত, তাহাকে আরও

[৪র্থ খণ্ড]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

৭৭

দূষিত করিতেছে ; বাহা পাপ-পঙ্কিল, তাহাকে আরও কদমাত্তর করিতেছে ; বাহা অন্ধকারময়, তাহাকে আরও তমসচ্ছন্ন করিতেছে । সারল্যের শুভ্র আচ্ছাদন ভেদ করিয়া, কোটিল্যের দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে ; আর অজ্ঞানের ঘোর ঘনঘটাচ্ছায়ায় জ্ঞানের আলোক নিম্প্রভ হইতেছে । পাপের প্রভাবে শাস্তির স্নিকোঙ্কল আলোক নিম্প্রভ হইতেছে ; প্রেমের পবিত্র বন্ধন শিথিল হইতেছে ; শিক্ষাচরেরা সৌজন্য লোপ পাইতেছে । ইহা পাশবিক শক্তি সকলকে উত্তেজিত করিতেছে, মানসিক শক্তি-নিচয়ের মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা করিতেছে । ইহা স্বাস্থ্যের বিষ, মনের বিভ্রম, চরিত্রের অন্তরায়া ॥ ইহা ক্রোধের রক্তমা, হিংসার বহ্নি, অহঙ্কারের জ্বালা । ইহা জিহবার স্বাধীনতা, চরণের অবাধপ্রতি, হস্তের মুক্তি, মায়ার প্রলোভন । ইহা সুখের অন্তরায়া, সমাজের একতার প্রত্যাবায়া, সংসারের শাস্তিহারক । ইহা দরিদ্রের ক্রন্দন, ধনীর উচ্ছ্বলতা, সৌভাগ্যের ঔদ্ধত্য, দুঃখের বস্ত্রণা । কেমন করিয়া, এই ভয়াবহ পাপের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে ? অতএব, নামের আধরণে পাপের আচরণ করিতে কদাপি অগ্রসর হইও না ; কেন না, বাহাদেক ভিতরে বিষ, উপরে সুখা ;—বাহিরে স্পষ্ট, ভিতরে ধাঁধা ;—উপরে গুণ, ভিতরে দোষ ;—বাহিরে ক্ষমা, অন্তরে রোষ ;—উপরে সত্য, ভিতরে মিথ্যা ;—উপরে সরল, ভিতরে কুটিল ;—মুখপাতে হরিনাম, অন্তরে পাপের ধাম ; এহেন নামসাধন পণ্ডিত্রমাত্র । কেন না, এরূপ আচরণে ভগবানের কাছে, সম্পূর্ণরূপে অপরাধী হইতে হয় । অতএব, নাম-সাধন করিতে গিয়া, আত্ম-প্রবঞ্চনা করিও না ; নিষ্ফল আরাধনায় কালাতিপাত করিয়া, বৃথা অনুতপ্ত হইও না । স্তব্ধতা ধর্মের ভাগ ছাড়িয়া, ভগ্নানী ছাড়িয়া, নকল ধর্মের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া, তুমি সেই সত্য-সনাতনের—বাহ্যের উজ্জ্বল-সম্মোহন দীপ-শিখার আলোকে দিগ্বিদল উদ্ভাসিত, বাহ্যের কৃপায় চরাচর বিশ্ব

সঞ্জীবিত, যাঁহার আকর্ষণে বিশ্ব-মণ্ডল সঞ্চালিত এবং নিয়ন্ত্রিত ; যিনি বর্ণের উৎস, যিনি আকাশের গায়ে নৌলিমা মাখাইয়া দিয়াছেন, যিনি নভোমণ্ডলকে হরিতাভ করিয়াছেন, যিনি ফুলের মুখে হাসি দিয়াছেন,— যিনি যুবকের চিবুকে দীপ্তি দিয়াছেন, যাহা সত্য, যাহা নিঃসন্দেহ, তাঁহারই পূজা কর, তাঁহারই সেবায় আত্মোৎসর্গ কর;— তোমার দুঃখের অবসান হইবে, সুখের সুখমায় প্রাণ পুলকিত হইবে ; বিজয়-মাল্য তোমার ললাট উদ্দীপ্ত হইবে। সত্যকে উৎসর্গ করিয়া, সন্দেহের আশ্রয় লইও না, যাহা নিশ্চিত, যাহা ধ্রুব, তাহার বিনিময়ে অনিশ্চিতকে সাদরে বরণ করিও না। আবার বলি,—ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া যেন, আত্ম-প্রবঞ্চনা করিও না ; আত্ম-প্রবঞ্চনা করিলে, তোমার হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হইবে না, বরং আরও ঘনীভূত হইয়া যাইবে। অতএব,—

যদি বহসি ত্রিদণ্ডং লগ্নমুণ্ডো জটাস্ত বা,

যদি বসসি গুহায়াং বৃক্ষমূলে শিলায়াম্ ॥

যদি পঠসি পুরাণং বেদসিদ্ধাস্ততত্ত্বং,

যদি হৃদয়মশুদ্ধং সর্বমেতন্ন কিঞ্চিৎ ॥

হৃদয় অশুদ্ধ থাকিল, তোমার ত্রিদণ্ড বহন, মস্তক-মুণ্ডন, জটী ধারণ বা সংসার-কোলাহল গণ্ডগোলের অন্তরালে গিরিকন্দরে, বৃক্ষমূলে অথবা শিলাবক্ষে বাস করাও বৃথা হইবে। আর, যদি হৃদয় অশুদ্ধ থাকে, তবে তোমার বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ,—পুরাণ-উপপুরাণ-সংহিতা পঠন বা সিদ্ধান্ত-তত্ত্ব শ্রবণও বৃথা হইবে; কেন না,—“যদি হৃদয়মশুদ্ধং সর্বমেতন্ন কিঞ্চিৎ।” অতএব মিথ্যা আড়ম্বরের ভাণ ছাড়িয়া সত্যের অনুসরণ কর, অসঙ্গলের অবসান হইবে, মঙ্গলের মাল্য তোমার শিরোভূষণ হইবে, প্রকৃত সুখের আনন্দ পাইবে। নাম-সাধনে যে সুখ আছে তাহা সকল প্রকার

[৪র্থ খণ্ড]

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

৭২

পাখির স্থখ অগেফা শ্রেষ্ঠ, মহৎ ও উচ্চ । নামে অবিশ্বাস করিলে, হতভাগ্যের দুঃখ আরও দুর্বিষয় হইয়া উঠিলে । তোমার জীবন সুখময় ; কিন্তু, এ সুখের স্থিতি কতটুকু ? অচিরে তোমার জীবন-বীণা নীরব হইবে—সুখের যবনিকা পতন হইবে ; সুতরাং জীবন সুখময় হইলেও, সুখ ভোগ করিতে পারিলে কৈ ? অদূর ভবিষ্যতে তোমার সুখ-সূর্য্য অন্তর্মিত হইবে—এই দুশ্চিন্তা তোমার বর্তমান সুখের শান্তি হরণ করিয়া লইতেছে । অতএব, সুখ পাইলে, কৈ ? আবার জীবন যদি দুঃখময় হয়, তাহা হইলে, এ দুঃখের পরিণতি নাই ভাবিলে, আত্মহার্য্য হইতে হয় । কেন না, দুঃখী ব্যক্তি অহরহঃ দুঃখের ঘূর্ণাবর্তে পতিত হইয়া, নির্দম ভাবে মথিত হইয়া থাকে ; দুঃখকে ছেঁ তাহার চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে পারে না, তাহার জীবন-আলেখ্যের পশ্চাৎগে ইহার স্থান নির্দেশ করিবার শক্তি তাহার নাই । তাহার জীবন নশ্বর, তাহার দেহ ক্ষণভঙ্গুর, সে অভাব-পরিবেষ্টিত ; সুতরাং তাহার দুঃখ অনিবার্য্য । দুঃখী শক্তিহীন, তাই সে শক্তি চায় ; দুঃখী নিরাশ্রয়, তাই সে আশ্রয় চায় ; দুঃখী আবদ্ধ, তাই সে মুক্তি চায় । সে চায় ; কারণ, তাহার বিশ্বাস, সে যাহা চাহিলে, তাহাই পাইবে । অতএব, তুমি যাহা নও, তাহাই যদি পাইতে চাও ; তোমার যাহা নাই, তাহাই যদি পাইতে চাও ; তবে তোমার যাহা আছে, তাহাতে অসন্তুষ্ট হও । আর, বিবেকের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, তোমার বাসনা-নিচয়ের বিরুদ্ধে সদর্পে যুদ্ধ ঘোষণা কর ; ঐহিক বাসনার বিশ্বগ্রাসী লেলিহান জিহ্বা সমূলে উৎপাটিত করিয়া, ভগবানের নাম সাধনায় প্রবৃত্ত হও ।

তস্মিন্ প্রসন্নো কিমিহান্ত্যলভ্যং,

ধর্ম্মার্থকামৈরলমল্লকাস্তে ।

সমাশ্রিতাদ্বন্ধতরোরনন্তাৎ

নিঃসংশয়ং প্রাপ্স্যথ বৈ মহৎফলম্ ॥

বিষ্ণুপুরাণ । ১১৮

ভগবান্ প্রসন্ন হইলে, জগতে আর অলভ্য কি ? ধর্ম, অর্থ, কাম ত তুচ্ছ, মোক্ষও প্রার্থনা করিতে হইবে না । অমল্ল ব্রহ্মতরুর আশ্রয় লইলে, তোমার নিঃসংশয়ই মহৎফল প্রাপ্তি হইবে । তবে ভগবানের প্রসন্নতাই সুখ-শান্তি-আনন্দ লাভের মূল ; তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে হইলে, মনে-মুখে মিল করিয়া, আড়ম্বরের মিথ্যা ভাণ ছাড়িয়া, ভক্তিভরে তাঁহার নাম-সাধন করিতে হইবে । নাম-সাধন করিলে, বিবেকের প্লানি নষ্ট হয়, মনের অন্ধকার দূর হয়, হৃদয়ের কালিমা অপসৃত হয় । মহা দুর্দিনেও নামের জ্যোতিঃ নিপ্রভ হয় না ; ঘোর বিপদের সময়েও, নামের আশ্বাস-বাণী অশ্রুত হয় না । নামের প্রভাবে দুর্গম পথ সুগম হয়, মহা-নৈরাশ্যের ভিতরও আশার সঞ্চার হয় । হরিনাম রোগ-শোক-জরাজীর্ণ জীবের স্বাস্থ্য এবং দুঃখ-দৈন্ত-ক্লিষ্ট মানবের মধুরিমা । হরিনাম হৃদয়ের আশা ; সুখের সাধুর্ধ্য ; মস্তকের শোভা, নয়নের জ্যোতিঃ, হস্তের শক্তি, চরণের ক্ষিপ্ৰগতি । হরিনাম ভয়াক্তের আশ্বাস, ভীকুর সাহস এবং দুর্বলের পরাক্রম । হরিনাম হইতে জ্বালায় বিভীষিকা নষ্ট হয়, দুঃখের যন্ত্রণা লাঘব হয়, কর্মের কঠোরতা কমিয়া যায় । হরিনাম পাপকে পরাস্ত করে, আত্মাকে বিনির্মুক্ত করে, বিশ্বাসকে স্ফূট করে, প্রেমকে উৎসাহিত করে, আশাকে সজীব রাখে এবং আগ্রহকে উত্তেজিত করিয়া দেয় । যেখানে দাসত্বের শৃঙ্খল, হরিনাম সেখানে স্নেহের বন্ধন ; যেখানে শতছিদ্র ছিন্নবাস, হরিনাম সেখানে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ; যেখানে জ্বালাময় তিরস্কার, হরিনাম সেখানে স্নেহাশীর্বাদ ; যেখানে জীর্ণ-শীর্ণ পলালাবশেষ পর্ণ-কুটীর, হরিনাম সেখানে সুরম্য হস্তা । বাঁহার নাম কীর্তনে আমরা মোহিত হইতেছি, চমকিত হইতেছি, সেই-নামে বাঁহার মহিমা প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহার কথা ভাবিলে, তাঁহার চিন্তায় অহর্নিশ নিরত হইলে, নামের জ্যোতিঃ আরও কি পরিস্ফুট হইবে না ? অতএব,—

[৪র্থ খণ্ড]

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

৮১

যৎকিঞ্চিদ্ধিত্তে পুংসাং তচ্চ কৃষ্ণে সমর্পয়েৎ ।
 কৃষ্ণার্পিভ্যং কুশলদমন্ত্যার্পিভ্যমসৌখ্যদম্ ॥
 চক্ষুর্ভ্যাং শ্রীহরেবেব প্রতিমাদিনিরূপণম্ ।
 শ্রোত্রাভ্যাং কলয়েৎ কৃষ্ণগুণনামাহর্নিশম্ ॥
 জিহ্বয়া হরিপাদাষু স্বদিতব্যং বিচক্ষণৈঃ ।
 ত্রাণেনাত্রায় গোবিন্দপাদাজতুলসীদলম্ ॥
 ঘ্রাণা স্পৃশ্য হরেভক্তং মনসাধ্যায় তৎপদম্ ।
 কৃতার্থো জায়তে জন্তুর্নাত্র কার্যাবিচারণা ॥
 পদ্মপুরাণ । স্বর্গ । ৩২

এই মায়াময় সংসারে তোমার বলিতে, যাহা কিছু আছে, মায়া-
 ক্ষমতা, আশা-ভরসা, বিভব-বৈভব, বিষয়-আশয়, ধন-সম্পত্তি,
 স্ত্রী-পুত্র, শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, ভূত-ভবিষ্যৎ,
 সমস্তই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিবে অর্থাৎ সমস্তই ভগবান্
 শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার উপর আত্মনির্ভর করিবে । ভব-পারা-
 বারের কাণ্ডারী, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে এই সমুদয় অর্পিত হইলে, কুশলদ,
 আর, পুঞ্জ-কলত্রে অর্পিত হইলে, অসৌখ্যদ বলিয়া জানিবে । তোমার
 চঞ্চল নয়ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিরূপম কুঞ্জ-কাননের,—প্রকৃতির বিনোদ-
 বল্লরীর শত সৌন্দর্য্য দর্শনে এবং কামিনীর কমনীয় বদন-সুধাকরের
 অনিন্দ্য-কান্তির সৌন্দর্য্য-সুধা অন্বেষণে অহর্নিশ আত্মহারা হইয়া
 রহিয়াছে ; উহাকে ঐ সকল হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া, সেই ভাব-
 সৌন্দর্য্যের आधार, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের—“নবনীরদমুন্দরনীলতনুং”
 প্রতিমা দর্শনে নিরত করিবে । তোমার বীণা-বিনিন্দিত প্রণয়-মধুর
 প্রিয়-সম্ভাষণ লাভে আকুলিত শ্রোত্রযুগল, বীণা-বেণু-সারঙ্গ-সপ্তস্বরার
 সমবেত সুস্বর-লহরীতে বা কলকণ্ঠকোকিল-বধুর কুহরণ-কাকলী, কিংবা
 বিহগ-বীণা-বিনিন্দিত সুধা-স্বর-তরঙ্গ অনুভব-সুখে সতত ধাবিত
 হইতেছে ; উহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া,—“মুরলীমধুরশ্রুতিরাগপরং”

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের, মধুর সুধাসিক্ত নাম-গুণ-কীর্তনে, মৃদঙ্গ-মন্দিরার মনোমদ মোহন ধ্বনি শ্রবণে অহর্নিশ নিরত করিবে । তোমার সুমিষ্ট-সুস্বাদু স্বরসাস্বাদনে অনুরক্ত জিহ্বা, মধুর রসাস্বাদন করিতে সতত অগ্রসর হইতেছে; উহাকে তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া,—“জগদাদি-গুরুং ব্রজরাজসুতং” ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদানু—পতিতপাবনী গঙ্গার স্ফটিক-স্বচ্ছ জলের আস্বাদনে নিরত করিবে । তোমার মনোমদ স্বরভি-গন্ধের আশ্রাণ-মানসে উদ্গ্রীব নাসিকা, পুষ্পিত কুঞ্জ-কাননের পুষ্প-রেণুর মকরন্দ-পানে সতত উদ্গ্রীব রহিয়াছে; উহাকে তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া,—“তুলসীদলদামসুগন্ধিতনুং” ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ-পাদাজের তুলসীদল আশ্রাণে নিরত করিবে । তোমার প্রিয়স্পর্শলাভে সদা আকুঞ্চিত হৃক্, প্রণয়োন্যাদের সযত্ন-রচিত প্রমোদকাননে নবর্যোবনা কামিনীর কমণীয় কনক-কলেবরের স্পর্শ-স্থানুভাবে সদা প্রসারিত রহিয়াছে; উহাকে তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া,—“রতিনাথমনোহরবেশধরং” সর্বসৌন্দর্য্যধার ভগবান্ শ্রীহরির পরম প্রিয় ভক্তের গোপীচন্দন-চর্চিত সুকোমল কলেবর স্পর্শ করিতে নিরত করিবে । আর, তোমার বিষয়-লোলুপ মনকে বিষয়-পঞ্চক হইতে উদ্ধার করিয়া, ষোল আনা মনকে সেই যোগিধোয় সাধন-ধন অমূল্যরতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের—“ধ্বজবজ্রাকুশাক্ষিতপাদযুগং” যোগি-বৃন্দবন্দ্য পদারবিন্দ ধ্যানে সতত নিরত করিবে । এইরূপ পঞ্চস্তানে-ন্দ্রিয়কে পঞ্চ বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া,—“মণিনির্ম্মিতপঙ্কজমধ্য-গতং” ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়াই, আধি-ব্যাধি শোক-তাপে মুহুমান সংসারী জীব কৃতার্থ হয়; এ বিষয়ে বিচার করিবার আর কোনই প্রয়োজন নাই । অতএব, :—

সততনিরতচিন্তো বিষ্ণুপাদারবিন্দে,
বিতরণমনুশক্তি প্রীতয়ে তস্মৈ কুৰ্ঘ্যাৎ ।
নতিমতিরতিমস্ত্যাজিহ্রয়ে সংবিদধ্যাৎ,
স হি সুরবরলোকে পূজ্যতামাগ্নয়াচ্চ ॥

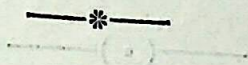
পদ্মপুরাণ । স্বর্গ, ৩২

[৪র্থ খণ্ড]

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

५७

যে ব্যক্তি বিষ্ণু-পদারবিন্দে সতত নিয়তচিত্ত হইয়া, তাঁহার প্রীতি উদ্দেশে শব্দানুরূপ বিতরণ করে; আর, তাঁহার যোগিবৃন্দ—মুনিবৃন্দ—বন্দ্য শ্রীচরণযুগলে নতি, মতি ও রতি সন্নিধান করে, সে নিশ্চয় প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য স্বরলোকে পূজ্যতা প্রাপ্ত হয়।

[illegible]

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

—০—

ধর্ম-বাজনে ও নাম-সাধনে সমতা জ্ঞান ।

——(০)——

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি পূর্বে বলিয়াছেন যে,—
‘সপ্তম নামাপরাধ ত্রত, হোমাদি ধর্ম-কর্মের সহিত নাম-সাধনকে
সমতা জ্ঞান করা ।’ সুতরাং ধর্ম-বাজনের সহিত নাম-সাধনকে সমতা
জ্ঞান করিলে, দোষ কি ? অনেকেই ত নাম-সাধনকেও ধর্ম-বাজন
বলিয়া মনে করে এবং ঐরূপ জ্ঞানে নাম-সাধন করিয়া থাকে ; তবে
কি তাহাতে তাহাদের অপরাধ হয় ?

বেদশ্রাদ্ধ্যয়নং যজ্ঞং তপোযোগঃ শমোদমঃ ।
কৃষ্ণনামসহস্রাংশৈ দেবর্ষে ন হি তুল্যকম্ ॥
জ্ঞানং দেবার্চনং ধ্যানং ধারণা নিয়মো যমঃ ।
প্রত্যাহারঃ সমাধিশ্চ হরেন্নামসমং ন চ ॥
গোবিন্দনামসদৃশং ন ত্যাগো ন ত্রতং মুনৈঃ ।
ন সঙ্কল্লো নাপি শৌচং ন পুণ্যং ন ফলং তথা ॥
বানপ্রস্থং ব্রহ্মচর্য্যং গার্হস্থ্যং কস্মিন্যাসকম্ ।
ধর্ম এব সদাচারো ন হরেন্নামতুল্যকঃ ॥
ন হরেন্নামসদৃশং কস্ম কিঞ্চিৎপশুত্বা ।
সর্ব্বতীর্থাটিনৈব চতুর্দ্ধা মুক্তিরেব চ ॥
শঙ্খপুরাণ । উত্তর ।

[৪র্থ খণ্ড]

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

৮৫

মহাবোগী মহেশ্বর দেবর্ষি নারদকে কহিয়াছেন,—“হে নারদ ! সাক্ষ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, কঠোর তপস্যা, যোগসাধন, শমোদম সাধন প্রভৃতি ধর্মকর্ম শ্রীকৃষ্ণনামের সহস্রাংশের একাংশেরও তুল্য নহে । জ্ঞানার্জন, দেবতার্চন, ধ্যান, ধারণা, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধন, প্রত্যাহার ও সমাধি প্রভৃতি হরিনামের তুল্য ফলদায়ক নহে । গোবিন্দ-নাম-সদৃশ ত্যাগ, কৃচ্ছাতিকৃচ্ছাদি ব্রত, সঙ্কল্প, শৌচ, পুণ্য-কর্ম প্রভৃতিও ফলদায়ক নহে । ব্রহ্মচর্যা, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস,—এই চতুরাশ্রম, ধর্ম ও সদাচার,—এগুলিও হরিনামতুল্য ফলদায়ক নহে । এমন কি, হরিনাম-সদৃশ কর্ম ইহলোকে কঠোর-কৃচ্ছ উগ্রা তপঃ-সাধনাদিও হইতে পারে না, অন্য তপঃ-সাধন বা সর্ববীর্ষ-পর্যটনাদি ধর্ম-কর্মের কথা বিশেষ কি আর কহিব,—সার্থি, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য প্রভৃতি চতুর্দা মুক্তিও সমান হইতে পারে না ।”

বাস্তবিক, যজ্ঞাদি ধর্ম-যাজনকে নাম-সাধনের সহিত তুল্য জ্ঞান করা মহা অপরাধ । ধর্ম-যাজন ও নাম-সাধন উভয়ই ভগবৎ-প্রাপ্তির কারণ বটে ; কিন্তু, তাই বলিয়া ধর্ম-যাজন ভগবৎ-প্রাপ্তির মুখ্য কারণ নহে ; নাম-সাধনই মুখ্য কারণ এবং ধর্ম-যাজন গৌণ কারণ । মহান্ সমুদ্র ও সামান্য নদীতে যে প্রভেদ, ধর্ম-যাজনে ও নাম-সাধনে সেই প্রভেদ । যেমন সামান্য নদী উত্তাল-তরঙ্গ অনন্ত মহার্গবের একদেশেরও তত্ত্ব জানিতে অক্ষম, তদ্রূপ ধর্ম-যাজন ভগবন্তের একাংশের একাংশ বিদিত করাইতেও অসমর্থ ; কিন্তু নাম-সাধনে ভগবন্ত সম্পূর্ণরূপে বিদিত হইতে পারা যায় । সুতরাং অনন্ত মহার্গবে ও সামান্য নদীতে যে প্রভেদ, বালুকণা ও পৃথিবীতে যে প্রভেদ, ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ডে ও হিমালয়ে যে প্রভেদ, মহানলে ও বিক্ষুলিজে যে প্রভেদ, সৌরজগতে ও পরমাণুতে যে প্রভেদ ; নাম-সাধনের সহিত ধর্ম-যাজনেরও সেই প্রভেদ । অতএব, ধর্ম-যাজন ভগবৎ-প্রাপ্তির কারণ হইলেও, নাম-সাধনের তুল্য হইতে পারে না ।

যজ্ঞ, দান, তীর্থ-পর্যটন, তপঃ-সাধন প্রভৃতি ধর্ম বা পুণ্য-কর্মগুলিকে নাম-সাধনের সহিত সমান জ্ঞান করা নামাপরাধ । রাজাকে প্রজার সমান মনে করিলে, হিমালয়কে বল্লীক-স্তূপের সমজ্ঞান করিলে, সাগরকে গোপ্পদের মত ভাবিলে, জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্যকে খটোতের মত বিবেচনা করিলে, কি অপরাধ হয় না ? ভগবান্নাম-সাধন অসীম কল্যাণের আকর ; আর, যজ্ঞ-দান-তীর্থপর্যটন প্রভৃতি পুণ্যানুষ্ঠান স্বল্প মঙ্গলকর । একদা পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— ‘হে ভগবন্ ! আপনি পরমদেব, সর্বযজ্ঞ, সর্বপূজিত ; ইন্দ্রাদি দেবগণ আপনাকে অতিমাত্র অর্চনা করিয়া থাকেন । আপনি সর্ব-শক্তিমান্ হইয়াও, সর্বদা কাহার ধ্যান করেন ? আপনি জটায়ুর ও ভাস্কর্য্যস্বরূপ হইয়া, কাহার নাম জপ করিয়া থাকেন ? হে দেবেশ ! আমার বড়ই কৌতুহল হইয়াছে, আমি যদি আপনার অনুগ্রহ-যোগ্যা হই, তবে আমার নিকট উহা প্রকাশ করিয়া বলুন ।’ তখন মহাদেব বলিলেন,— ‘হে শুভে ! উহা অতি গোপনীয় ; কাহারও নিকট পূর্বে আমি বলি নাই । কিন্তু, তুমি আমার ভক্তা এবং প্রিয়তমা, তাই তোমার নিকট ইহা বলিব । হে দেবি ! পূর্বে সত্যযুগে নিখিল মানব বিশুদ্ধচিত্তে একমাত্র ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকেই সর্বেশ্বর জ্ঞানে পূজা করিয়া, ঐহিক ও পারত্রিক পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । সমস্ত দেব ও সমস্ত ঋষি অতি ক্লেশেও যে গতি প্রাপ্ত হন না ; আমার মুখে বিষ্ণুর নাম শ্রবণে কৃতনিশ্চয় হইয়া, সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । বিষ্ণুভক্তিবিমুখ দেব-গণ, বেদ, পুরাণ ও বিভিন্ন দর্শনাদির আলোচনায় বিভ্রান্তচিত্ত জনগণ কি-তদ্ব্যক্তি পরমপদ কিছু নিশ্চিতরূপে অবগত হইতে পারে না ;—

তুলাপুরুষদানাতৈত্তরশ্বমেধাদিভিমথৈঃ ।

বারাণসীশ্রয়াগাদিতীর্থস্থানাদিভিঃ । প্রিয়ে ॥

গয়াশ্রাদ্ধাদিভিঃ পিত্র্যেবেদপাঠাদিভির্জপৈঃ ।

তপোভির্কঠৈর্নিয়মৈর্মৈত্ৰ্যৈর্ভূতদয়াদিভিঃ ॥

[৪র্থ খণ্ড]

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

৮৭

গুরুশুশ্রূষণৈঃ সেবৈব ধর্মৈব বর্ণাশ্রমায়িতৈঃ ।
 জ্ঞানধ্যানাদিভিঃ সম্যক্ চরিতৈর্জন্মকোটিভিঃ ॥
 ন যাস্তি তৎপরং শ্রেয়ো বিষ্ণুং সর্বৈশ্বরেশ্বরম্ ।
 সর্বভাবৈঃ সমাশ্রিত্য পুরাণপুরুষোত্তমম্ ॥
 অনন্তগতয়ো মর্ত্যাঃ ভোগিনোহপি পরন্তপে ।
 জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতাঃ ব্রহ্মচর্যাদিবর্জিতাঃ ॥
 সর্বধর্মোজ্জ্বিতাঃ বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজ্ঞানিনঃ ।
 স্তুথেন যাং গতিং যাস্তি ন তাং সর্বৈহপি ধ্যানিকাঃ ॥

পদ্মপুরাণ । উত্তর । ৭১

হে প্রিয়ে ! তুলাপুরুষাদি মহাদান, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, বারাণসী
 ও প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থে স্নান, গয়ায় কৃত পিতৃশ্রাদ্ধ, বেদপাঠ, জপ,
 অত্যাগ্র তপস্বী, যম, নিয়ম, ভূতদয়া, গুরুশুশ্রূষা, বর্ণাশ্রম-বিহিত
 ধর্ম্মাচরণ এবং কোটি কোটি জন্মার্জিত জ্ঞান ও ধ্যানাদি দ্বারাও সেই
 পরম-মঙ্গল-নিলয় বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে সকল মানব
 ভোগাসক্ত, জ্ঞান-বৈরাগ্য-বিরহিত, ব্রহ্মচর্যাদিহীন ও সর্ব-ধর্ম্ম-বর্জিত
 যদি অনন্তমনে তাহারাও সর্বভাবাবে, সেই পুরাণ-পুরুষবরকে
 আশ্রয় করিয়া, সর্বধর্ম্ম বিসর্জনান্তে একমাত্র বিষ্ণুর নামোচ্চারণেই
 নিরত হয়, তবে তাহাদের অনায়াসে যে গতি লাভ হইয়া থাকে, সে
 গতি ধার্ম্মিকদিগেরও ঘটে না। অতএব, সর্বদা বিষ্ণুস্মরণ কর্তব্য ;
 কদাচ তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। যে কিছু বিধি-নিষেধ, সমস্তই
 তাঁহার অধীন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং নিষ্পাপ ঋষিগণ সকলেই
 বিষ্ণু নামে নির্ভয়ে যথেষ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; আমিও নিজের যোগ্য
 পূজা প্রাপ্ত হইয়া, অহঙ্কৃত-চিত্তে তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদ কামনায়
 সম্যক্ হরিনাম সাধনা করিতেছি।

কলৌ বৈ হরিগীতন্তু স্বগৃহে বা বিশেষতঃ ।

সামগানসমং প্রোক্তং দেবার্চনসমাধিষু ॥

পদ্মপুরাণ । উত্তর । ৮০

কলিকালে হরিগান—বিশেষতঃ স্বগৃহে হরিণাম কীর্ত্তন দেবার্চন ও সমাধি-ব্যাপার সামগান হইয়া থাকে । অতএব, যে ব্যক্তি মিথ্যা বুঝিয়াও হরির নাম পাঠ ও জপ করে, সেও সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদে উপনীত হইয়া থাকে । যে সকল নর 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় নিত্য উচ্চারণ করে, সেই উচ্চারণ মাত্রেই সে মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই । এমন কি, নামোচ্চারণ মাত্রেই মানুষের কুরুক্ষেত্র, গয়া, কাশী ও দ্বারাবতী প্রভৃতি সর্ববতীর্থের সেবা করা হয় ; যে জন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই নাম জপ ও কীর্ত্তন করে, সে অস্ত্রে ইহলোক পরিহার-পূর্ব্বক কৃষ্ণসন্নিধানে বিহার করিয়া থাকে ।'

অতএব, জানা গেল যে, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, কঠোর তপস্যা, গো-হিরণ্য-ভূম্যাদি দান, শম-দম,—এ সকল ভগবন্মামের সহস্রাংশের তুল্যও নহে । সুতরাং মহামহিম অমৃতময় সুধাসিক্ত হরিনামের সহিত স্বল্পমহিম যজ্ঞ, তপঃ, দানাদিকে সমান মনে করিয়া, সর্বশক্তিমান্ নাম-মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিবার গর্ব্ব পোষণ করা কি অপরাধ নহে ? যে মুক্ত মানব, নামরূপী ভগবানকে সামান্য সামগ্রীর সঙ্গে তুলনা করে, তাহার দুর্ব্বুদ্ধির সীমা নাই ।



নবম পরিচ্ছেদ ।

—(০)—

প্রমাদ ।

—০—

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি পূর্বের বলিয়াছেন যে,—‘অষ্টম নামাপরাধ—প্রমাদ, এই প্রমাদ নাম-সাধনের অত্যন্ত অন্তরায়, নামে বিশ্বাস করিবার প্রত্যাবায় । এই প্রমাদ হৃদয়ে উৎপন্ন হইলে, নাম-সাধনে উন্নতি লাভ ত দূরের কথা, অবনতি সম্বন্ধে হইয়া থাকে । সুতরাং সর্ববতোভাবে ইহা পরিত্যাগ করিবে।’ অতএব, প্রমাদ কাহাকে বলে ?

কর্তব্যাকরণং যত্র সমর্থস্ত কচিদ্ববেৎ ।

উচ্যতে দ্বিতীয়ং তত্র প্রমাদোহনবধানতা ॥

শব্দরত্নাবলী ।

যাহা একান্ত কর্তব্য, সমর্থ সত্ত্বেও যেখানে অকরণ হইয়া থাকে, সেখানে সেই কর্তব্য কর্মের বিঘ্ন-স্বরূপে যে অনবধানতা উপস্থিত হয়, সেই অনবধানতাকেই প্রমাদ বলিয়া অভিহিত করা হয় । আবার বিরাগী জ্ঞানরসিক শঙ্করাবতার জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য, গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় নিজ শিষ্যকে কহিতেছেন,—

“প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্তব্যঃ কদাচন ।

প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥”

বিবেকচূড়ামনি ।

‘ব্রহ্মনিষ্ঠাতে অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠাতে কদাচ অমনোযোগী হইও না । কেন না, অনবধানতাই স্বীয় মৃত্যু-স্বরূপ ; দেবর্ষি সনকাদি ইহা

বলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মভাবে অর্থাৎ ভগবন্তাবে অনবধানতা অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞের অর্থাৎ ভগবন্তজ্ঞের অল্প প্রমাদ কিছুই নাই। যে হেতু, অনবধানতা হইতে মোহ, মোহ হইতে অহং-বুদ্ধি, অহং-বুদ্ধি হইতে সংসার-বন্ধন এবং বন্ধন হইতে যাতনা জন্মে। যেমন অসতী নারী নিজ প্রিয় জারকে বুদ্ধিকৌশলদোষে বিক্ষেপ করে, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও বিষয়ানুরাগী দেখিয়া, ভ্রান্তি-রূপিনী অবিद्या বুদ্ধি-দোষ দ্বারা তাঁহাকে বিক্ষিপ্ত করে। যেমন শৈবালরাশি লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ দ্বারা দূরীকৃত হইলেও, ক্রিয়ৎক্ষণ স্থির না থাকিয়া আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ মায়া স্ব-স্বরূপে বিমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিকেও আবরণশক্তি দ্বারা সমাবৃত করে। যেমন প্রমাদনিবন্ধন চ্যুত কেলিকন্দুক সোপানপংক্তি হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ যদি চিত্তলক্ষ্য চিন্তার অর্থাৎ ভগবন্তাব হইতে স্থলিত হয়, কিম্বা চিন্ময় অর্থাৎ ভাবময় ভগবান্ হইতে ঈষৎ বিমুখ হয়, তাহা হইলে, লক্ষ্যস্থান হইতে আশু পতিত হয়। চিত্ত প্রথমে বিষয়ে আবিষ্ট হয়, বিষয়ের গুণ-সমূহ শঙ্কল করে, ঐ শঙ্কল হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং ঐ কামনা হইতে পুরুষের সংসার-প্রবৃত্তি ঘটে। সংসার-প্রবৃত্তি হইতে স্বরূপের ধ্বংস হয়, স্বরূপবিভ্রষ্ট অধঃপতিত পুরুষের ধ্বংস ভিন্ন আর পুনরুত্থান দেখা যায় না; সুতরাং অখিল অনর্থের কারণ-স্বরূপ শঙ্কল আশু পরিত্যাগ করিবে। বিবেকী ব্রহ্মজ্ঞ অর্থাৎ ভগবন্তজ্ঞ ব্যক্তির সমাধি-বিষয়ে অনবধানতা ঘটিলে, তাহা ভিন্ন মৃত্যু-স্বরূপ আর কি আছে? অর্থাৎ উহাই তাঁহার মৃত্যু-স্বরূপ; কিন্তু সমাধি-বিষয়ে যিনি মনোযোগী, তিনি আশু সর্বথা। সন্ধি প্রাপ্ত হন; অতএব, তুমি সমাহিতমনা ও সতর্ক হও।' গরুড়পুরাণে স্ততমুনি কহিয়াছেন,—

“লোভপ্রমাদবিশ্বাসৈঃ পুরুষো নশতি ত্রিভিঃ।
তস্মাল্লোভো ন কৰ্তব্যঃ প্রমাদো নো ন বিশ্বসেৎ॥”

গরুড়পুরাণ। ১১৫

‘লোভ, প্রমাদ ও বিশ্বাস দ্বারা লোক বিনষ্ট হয়। অতএব, লোভ

[৪র্থ খণ্ড]

নবম পরিচ্ছেদ ।

৯১

ত্যাগ করিবে, সর্বদা সাবধানে থাকিবে এবং সাধারণের প্রতি বিশ্বাস করিবে না ।’ শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে উক্ত আছে যে,—“নামেতে অনবধান হয় মহাপাপ । তাহাকে পুরাণকর্তা বলেন প্রমাদ ॥” মূল কথা,—যদি প্রকৃত প্রেম-ধনে ধনো হইতে ইচ্ছা কর, শ্রেয়োলাভ করিতে চাও,—তবে প্রমাদকে বিসর্জন দাও । কেবল বিরাগীর কথা নহে । এক কথায় কি জ্ঞানী, কি ভক্ত, কি কৰ্ম্মী, কি ধৰ্ম্মী,—সকলেই নাম-সাধন করিবার নিমিত্ত নামাপরাধ প্রমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, অর্থাৎ সাবধান সতর্ক হইয়া, নাম-কীর্তনে নিরত হইবেন, নতুবা পদে পদে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে । একদিকে অন্তঃ-করণের আকর্ষণ থাকিলে অশুদ্ধিকে অবধান করা কঠিন হয় । ভগবানের নামে যাহাদের অবধান নাই, বুঝিতে হইবে, তাহাদের মন, সংসারচিন্তায় আক্রান্ত,—কামিনী-কাঞ্চনের অন্বেষণে সর্ববন্ধন ব্যাকুলিত ; তাহারা ভোগে আসক্ত ও বিমুক্ত এবং ধনোপার্জন-পরায়ণ হইয়া, সংসারমার্গে যদৃচ্ছাক্রমে নিরত ভ্রাম্যমাণ, জ্ঞী-পুত্রাদিতে একান্ত অনুরক্ত, আত্মীয়-স্বজনগণের ভরণ-পোষণার্থ নিরন্তর ব্যগ্রচিত্ত ও বিষাদযুক্ত এবং তাহার প্রাপ্তি বাসনায় অহর্নিশ ব্যাকুলিত রহিয়াছে । বিষ্ঠাভোজী শূকর, যেমন কুস্থমকাননের সুগন্ধিসম্ভারে অনবধানতা প্রকাশ করিয়া, বিষ্ঠাতেই নির্ভা পোষণ করে, সংসারসুখমত্ত মানবও, তদ্রূপ হরিনামে অনবধান হইয়া, সংসারসাধনে সাবধান হইয়া থাকে । এই শ্রেণীর মানবই শাস্ত্রের দৃষ্টিতে প্রকৃত পশু । কেন না,—

অহিতহিতবিচারশূন্যবুদ্ধেঃ ,

ঐতিসময়ে বহুভিস্তিরস্কৃতস্ত ।

উদরভরণমাত্রতুষ্টবুদ্ধেঃ .

পুরুষপশোশ্চ পশোঃ কো বিশেষঃ ॥

গরুড়পুরাণ । পৃঃ ১১৫

যাহার হিতাহিত বিবেচনার শক্তি নাই এবং স্বীয় উদরের পোষণমাত্রেই যে ব্যক্তি সম্ভ্রষ্ট অর্থাৎ যে ব্যক্তি শিশ্নোদরপারায়ণ হইয়া, আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত ভোগ্যবস্তুতে সদা আসক্ত, সেই পুরুষপশু ও বন্যপশুর প্রভেদ কি ? আকৃতিতে অনেক মানুষ আছে বটে ; কিন্তু সকলে ত প্রকৃত মানুষ নয় । মানুষের আকার থাকিলেই মানুষ হয় না । মানুষের দেহ ধারণ করিয়া, মানুষের মত দুই পায়ে চলিয়া বা মানুষের মত হাসিয়া, কথা কহিয়া বেড়াইলে যে মানুষ হয়, তাহা নহে । মানব এ সকল স্থূল লক্ষণ ছাড়া, যখন একটা বিশেষ উচ্চতর উপাদানের অধিকারী হয়, তখনই সে প্রকৃত মানুষ হয় । এ সকল দৈহিক শক্তির বিকাশ ব্যতীত যখন আর একটা অপূর্ব সামগ্রী মানুষ আয়ত্ত করিতে পারে, তখনই সে যথার্থ মানুষ হয় । সেই অপূর্ব উপাদান সামগ্রী কি ? কবি কহিয়াছেন,—“উন্মুক্ত সবার তরে, এ নিখিল সংসারে, মনুষ্যত্ব মহত্বের পথ শ্রেষ্ঠতর ।” কবি বলিয়াছেন, মনুষ্যত্বের উপার্জনে সকলেরই সমান অধিকার । ইহার উপার্জনে সহায়, সম্পদ নিষ্প্রয়োজন । বিদ্যালয়ের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম বা কোন উপাধিরও আবশ্যক করে না ;—আবশ্যক, কেবল সংপ্রবৃত্তির ও সংযমাদির । সংযম-শিক্ষাই মনুষ্যত্বের কারণ ; এই মহাশক্তি-বলেই পশু-পক্ষী অপেক্ষা মানবের শ্রেষ্ঠতা ! যখনই প্রকৃত মনুষ্যত্বের আবির্ভাব ঘটে, তখনই মানবের প্রাণে এই জগতের ও জীবনের প্রতি বিষম বিরক্তি জন্মে । তখন এই জীবনের—এই জগতের আর কিছুই তাহার ভাল লাগে না । এই অবস্থায় মানব আপনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে,—‘এই দুর্লভ মানব-দেহ ধরিয়া কি করিব ?—এই মানব-জীবন বহিয়া কি ফল লাভ করিব ?—এই মানব-জীবনের কর্ম কি—ধর্মই বা কেমন ?’ এই যে জিজ্ঞাসা, ইহাই মানব-জীবনের অতি শুভ জিজ্ঞাসা । এই জিজ্ঞাসার নামই ‘আত্ম-জিজ্ঞাসা ।’ এই আত্ম-জিজ্ঞাসা হইতেই মনুষ্যত্বের রহস্য-মর্ম উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে ।

[৪র্থ খণ্ড]

নবম পরিচ্ছেদ ।

৯৩

মানব-তত্ত্বের মৌলিক উপাদান ইহা হইতেই বিশ্লেষিত হইয়া যায় । মানবের স্বাভাবিক ধর্ম-কর্ম, প্রকৃত সুখ-সৌভাগ্য—এই আত্ম-জিজ্ঞাসা হইতে সমুদ্ভূত ও মীমাংসিত হইয়া থাকে । মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব—মনুষ্যত্বের মহিমা—এই আত্ম-জিজ্ঞাসায় প্রকটিত । কেন না, এই আত্ম-জিজ্ঞাসা,—স্থূল-ভাব, স্থূল-তত্ত্ব হইতে, মানবকে সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-তত্ত্বের দিকে ফিরাইয়া দেয় । মানব তখন আপনি আপনাকে দেখিতে পায়, আপনার মহত্ত্ব বুঝিতে পারে । অতএব, মনুষ্যত্ব অনন্য সুখের আশ্রয়, সে সুখের জন্য বাহ্য উপকরণ নিষ্প্রয়োজন । সে সুখের প্রসবণ আপনিই উথলিয়া উঠে । আমরা হেলায় তাহা হারাইয়া থাকি । মহামহিমাম্বিত বিশ্ব-শ্রষ্টা সৃষ্টিকর্তার অপার কৃপায়, ইতর প্রাণী না হইয়া, যখন সৌভাগ্যবশতঃ নর-রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ; তখন কি অসার জড়পিণ্ড নশ্বর সংসারে, বিনশ্বর শোণিত-মাংস-মজ্জাময় মলপিণ্ড শরীরে তির্য্যগ্জাতির প্রায় আহার-বিদ্রা ভয়-মৈথুনাди সংসার-স্থূলভ বিষয়-ভোগে দুর্লভ মানব-জীবনের অপব্যবহার করা উচিত ? আমরা যদি কেবল আহার-নিদ্রা ভয়-মৈথুনাदि লইয়া থাকিব, তবে কেন ভগবান্ আমাদিগকে চতুষ্পদ না করিয়া, দুইখানি পায়ের উপর ভর দিয়া চলিবার শক্তি দিয়া, দ্বিপদ-বিশিষ্ট পঞ্চজ্ঞানে-দ্রিয়যুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ? এবং দুই হস্তের দ্বারা ঐহিক-পারত্রিক কার্য্য করিবার সামর্থ্য দিয়াছেন ? কেনই বা ইতর-প্রাণীর পক্ষে দুর্লভ বিবেক-শক্তিতে ভূষিত করিয়া, পঞ্চজ্ঞানেদ্রিয় সন্নিবেশ-পূর্ব্বক, এই মানব-শরীরকে মুক্তির সোপান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ? ফলতঃ যদি মনুষ্যত্ব লাভ করিতে না পারিব, তবে কেন মনুষ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ? স্বয়ং ভগবান্ নর-রূপে বহুধা অবতীর্ণ হইয়া, মনুষ্যত্বের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন । এস, সকলে সমবেতভাবে সেই উন্মুক্ত পথের পথিক হইয়া, গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবার প্রয়াস পাই । সেই পথ অতি দুর্গম ;—অধিকন্তু, সে পথ সংশয়-

জন্মলে পূর্ণ। তাহার উপর দস্যুর ভয়,—সে পথে চলিতে হইলে, কাম-ক্রোধ প্রভৃতি দস্যু সকল পথিকের চির-অর্জিত প্রেম-ভক্তি-ধন অপহরণপূর্বক অন্তর্হিত হয়। মায়া-রাক্ষসী তথায় নিত্য নূতন মায়াজাল বিস্তার করিয়া, পথিককে গ্রাস করিতে আসে। একটু অসতর্ক হইলে, প্রমাদ ঘটিলে, অধর্ম-রূপ হিংস্র জন্তুর করাল কবল হইতে আর নিস্তার পাইবার উপায়ান্তর নাই। সে পথে চলা ভার; কিন্তু, তথাপি সেই পথের পথিক হইতে হইবে। মানুষই এই পথের পথিক হয়, -পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সে পথের পথিক নয়। অতএব, আমি আপনাকে মানুষ বলিয়া, পরিচয় দিয়া থাকি,—বিবেক ও চেতনাশক্তি লইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছি; এ অবস্থায় পশুর কার্য করিয়া, সত্যপথ হইতে চ্যুত হই কেন? পশু পশুর কার্য করুক, আমি মানুষ, মনুষ্যোচিত কার্য না করিয়া, কেবল পশুর কার্য লইয়া থাকি কেন?

চিন্তং ন যন্ত তু নরন্ত হরেঃ কথায়াং,
সম্প্রীয়তে দুর্জিতদুর্জয়সংপ্রসঙ্গাৎ ।

ধিক্ তং নরং পশুসমং ভূভারভূত—
মেবং বদন্তি মুনয়ঃ কিল পূর্বসিদ্ধাঃ ॥

পদ্মপুরাণ । উত্তর । ১১৫

পূর্বের সিদ্ধ মুনি-ঋষিগণ বলিয়াছেন,—‘অসং প্রসঙ্গ-বশে যে মানবের দুর্জিতদুর্জয়চিন্ত হরিকথায় প্রীত না হয়, ভূভারভূত অর্থাৎ পাপভারে পৃথিবীকে যে ব্যক্তি অতি-ভারাক্রান্ত করে, সেই পশুসম মানবকে ধিক্।’ বাস্তবিক, যে ব্যক্তি দুর্দম্য প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসমান হইয়া, কার্য্যাকার্য্য বিবেচনাশূন্য হয়, সে ব্যক্তি মানব-দেহধারী হইলেও, পশু-প্রকৃতি-বাচ্য হইয়া থাকে। কেন না, প্রবৃত্তি দমন করিয়া, নিবৃত্তি-পথে চলাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, জগতে যে মানব প্রবৃত্তি উপর যতদূর কর্তৃত্ব করিতে সক্ষম, তাহাকে তত উন্নত বলিয়া মনে করিতে হইবে। প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য করিয়া, নিবৃত্তি অর্থাৎ

[৪র্থ খণ্ড]

নবম পরিচ্ছেদ ।

৯৫

সংঘম-শিক্ষা করিতে পারে বলিয়াই, মানুষ সর্বজীব হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারিয়াছে । ইহাই মনুষ্যের মনুষ্যোচিত ধর্ম ; ধর্ম ছাড়া মানুষ থাকিতে পারে না । যে মানবে ধর্ম নাই,—যে মানব ধর্মহীন হয়, সে মানুষের স্বদয়ে মনুষ্যত্ব তিষ্ঠিতে পারে না । সেই মনুষ্য, মনুষ্য-চর্যাচ্ছাদিত হইয়া, লোম-লাঙ্গুলহীন পশু-রূপে পরিণত হয় । অর্থাৎ,—

স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মচর্যঞ্চ দানং যজ্ঞনমেব চ ।

অকাপণ্যমনায়াসোদয়াহিংসাক্রমাদয়ঃ ॥

জিতেন্দ্রিয়ত্বং শৌচঞ্চ মাজ্জল্যং ভক্তিরচ্যুতে ।

শক্রে ভাস্করে দেব্যাং ধর্মোহয়ং মানবঃ স্মৃতঃ ॥

বামনপুরাণ । ১১

স্বাধ্যায়, ব্রহ্মচর্য, দান, যজ্ঞ, অকাপণ্য, ক্লেশ-রাহিত্য, দয়া, অহিংসা ও ক্ষমা প্রভৃতি, এতদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শৌচ, শুভাচার এবং ভগবান্ শকর, ভগবান্ ত্রীবিধু, জ্যোতিষ্ক-জীবন ভাস্কর ও কালী-তারা-মহাবিদ্যা প্রভৃতির প্রতি ভক্তি, এই সমস্ত মানবধর্ম । ইহাতে সকল জাতীয় সকল মনুষ্যের সমান অধিকার । এই মানব-ধর্মগুলি সম্মিলিত হইয়া, যাহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তিনিই প্রকৃত মানুষ । যাহাতে ইহার মধ্যে সকলগুলিই নাই, সে বিকলাঙ্গ মনুষ্য ; আর যাহাতে কিছুই নাই, সে মনুষ্য হইয়াও পশু । তাহার অন্তরে পশুভাব ; আর বাহিরে মনুষ্যভাব । কেন না, তাহার অন্তরে আজন্ম-সঞ্চিত পশুভাব, যে পশুভাব তাহার জন্ম-সংস্কার-লব্ধ-সম্পত্তি, পশু-সাধারণ কতকগুলি বৃত্তি রহিয়াছে । বিবিধ পশু-যোনিতে ভ্রমণ করিয়া মনুষ্য-যোনিতে আসিয়া, মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও, তাহার জন্মজন্মান্তরের অভ্যাসবশতঃ পশুসাধারণ-বৃত্তির পরিচালনাই তাহার প্রিয়, তাই অনেকে আহার-নিদ্রা ভয়-মৈথুনাदि লইয়াই ব্যস্ত থাকে । কেন না, অভ্যাস প্রশ্রয় পাইলে, স্বভাবে

পরিণত হয়। ফল কথা—ধর্মই জগতে মনুষ্যত্ব-বিকাশের মূল। এই নানাজীবসঙ্কুল সুবিশাল জীব-জগতে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, ধর্মের শরণাপন্ন হইতে হয়। একবার আত্মাকে শাস্ত করিয়া, জগতের পানে চাহিয়া দেখ দেখি,—জগতে যখন যে জাতি উচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়াছে, তখন সেই জাতির মূলে ধর্মভাব নিহিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইবে। সুতরাং সর্বকালে সর্বসমাজে জনসাধারণের মধ্যেই ধর্ম সংরক্ষিত। যে সমাজে জনসাধারণ ধর্মহীন হয়, সে সমাজ জগতে কখনই তিষ্ঠিতে পারে না। ফলতঃ মানব-আত্মার জন্ম—মানব-সমাজের জন্ম—ধর্ম অন্ন-জল অপেক্ষাও প্রয়োজনীয়। ধর্মহীন মানব-আত্মা নরকের পৈশাচিক ছায়া। ধর্মহীন মানব-সমাজ শ্মশানের চিতাগ্নি—তাহাতে নন্দনের পারিজাত পুড়িয়া ছাই-ভস্ম হইয়া যায়। অতএব, ধর্মই মানব-জীবনের, মানব-আত্মার, মানব-সমাজের অন্ন-জল-বায়ু। ইহাই ধর্মের সত্যতার প্রমাণ। এক কথায় ধর্মই ধর্মের প্রমাণ। তজ্জন্ম প্রমাণান্তর অনাবশ্যক—অধিকন্তু, এই মানব-ধর্ম, যে মানবে নাই, সে পশুরও অধম। যেমন কাঠের মানুষ—আকৃতিতে ঠিক মানুষ; বস্তুতঃ কাঠ বৈ আর কিছু নয়। সেই প্রকার সে ব্যক্তি আকৃতিতে মানুষ হইলেও, প্রকৃতিতে পশু। সুতরাং মানুষ! তোমরা সকলেই বুদ্ধি-নৈপুণ্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান—মুক্তির সোপান পাঞ্চভৌতিক ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব-সম্পন্ন মানব-শরীরধারী মানুষ, তোমরা নর, বানব বা ইতর নও। সকলে মনুষ্য। সকলেরই দুই হাত, দুই পা, দুই চক্ষু ইত্যাদি—এক কথায় তোমাদের ঈশ্বরদত্ত বস্তু সব সমান। এমন সাম্য ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব শরীর পাইয়াও, যদি নাম-সাধন করিয়া, মুক্তি-পথের পথিক হইতে না পার, সংসার-বিপন্নে বারংবার বিপন্ন হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। যদি তুমি এই বিপদ-সঙ্কুল সংসার-কানন হইতে পরিভ্রাণ পাইবার এমন জ্ঞান-বুদ্ধি-নৈপুণ্য অস্ত্র-শস্ত্র-সুসজ্জিত দ্রুতগামী যান-স্বরূপ মানব শরীর

[৪র্থ খণ্ড]

নবম পরিচ্ছেদ ।

৯৭

প্রাপ্ত হইয়াও পরিত্রাণ লাভ করিতে না পার, তবে তোমার মত অজ্ঞ
অন্ধ পশু আর কে আছে ? শাস্ত্র বলেন,—

আজন্মাত্রমপি যেন শঠেন চিত্তং,

সম্যঙ্ নিয়ম্য ভুবি কৃষ্ণকথা ন পীতা ।

চাণ্ডালবচ্চ পশুবদন্ত তেন নীতং,

মিথ্যা স্বজন্ম জননী ভূশমর্দিতা চ ॥

পদ্মপুরাণ । উত্তরঃ । ১৯৫

মানুষই মুক্তিপথের পথিক,—পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সে পথের
পথিক নয় । এ পথে চলিতে চলিতে মানুষ ! তুমি যদি বিপন্ন হও,
তবে পশু অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ কিসে ? তুমি যে পশু হইতে আপনাকে
শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, মানব-পদ-বাচ্য হইয়া, আত্মাভিমানে বড় হইতেছ,
তাহার একমাত্র কারণ, তুমি ভগবানের উপাসনা করিয়া, এই সংসার
হইতে—এই ‘সার্ক্সত্রিহস্ত পরিমিত গণ্ডী’ হইতে মুক্তি লাভ করিতে
পার বলিয়াই, পশু হইতে আপনাকে শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া, তুমি পরিচয়
দিতে পারিয়াছ । যদি তুমি ভগবানের নাম সাধনায় অবধান না করিয়া,
হরিনামে অনবধান হইয়া, সংসারের গৃহমেধী সুখ-সাধনে সারধান হও
অর্থাৎ নামরূপী ভগবান্ কৃষ্ণ তোমার কর্ণপথের পথিক না হন;
তবে তুমি গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দভের দ্বারা সংস্কৃত পশুবিশেষ
অর্থাৎ ঐ সকল পশুসম বিপদ-বিশিষ্ট নর-পশু । বস্তুতঃ যাহাদের
সর্বসারাৎসার ক্রীহরিতে অনবধানতা ; আর, অনিত্য অসার জড়পিণ্ডে
সার-ধারণা, তাহারা প্রমাদময় পশুদের পথে বিচরণ করে, কখনও
প্রেমময় নাম-সাধন জন্ত মনুষ্য-মন্দিরের স্বর্ণদ্বার উন্মোচন করিতে
প্রয়াস পায় না । এমন অনেক পাষণ্ড আছে, যাহারা নাম-কীর্ত্তন
শুনিতে বসিয়া, গৃহস্থালীর গল্পে মগ্ন থাকে, কীর্ত্তনের একটি পদও শুনে
না ; সে দিকে তাহারা আদৌ মনও দেয় না । নাম কাণে যায় ;

কিন্তু, অন্তরে প্রবেশ না করিয়া, প্রাণে না যাইয়া, বাহিরে পলায় । অহো, কি আশ্চর্য্য ! এই সুবিশাল নরবাস ধরাধামে যে জন আজন্ম একমাত্র শার্ঠ্যে চিত্ত নিয়ন্ত্রিত করিয়া, ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথামৃত পান করে নাই, সে ব্যক্তি চণ্ডাল বা পশুসম ; কেন না, তাহার জীবন চণ্ডাল ও পশুর স্থায় অতিবাহিত হইয়াছে ;—সে ব্যক্তি জন্ম বুঝা অতিবাহিত করিয়াছে । আর, তথাবিধ ব্যক্তি জননীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া, জননীকে দারুণ যন্ত্রণা দিয়াছে ! মহামুনি মহামনা শৌনক কহিয়াছেন,—

“আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুত্তমস্তং চ যন্নসৌ ।
তত্ত্বৰ্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃ শ্লোকবার্ত্তয়া ॥
তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভদ্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত ।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোহপরে ॥
শ্ববিড্ বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবত । ২ । ৩

‘মানব ! তোমার মাথার উপর—অনন্ত উর্দ্ধে আকাশ-মণ্ডলে জ্যোতিষ্ক-পথে—ঐ দেখ, জ্যোতিরঙ্গ্যোতিঃ—উজ্জ্বলতার কৌস্তুভ-মণি—আলোকের পবিত্র-রাশি—আলোক-রূপী ভগবান্ জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য, প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হইতেছেন ; আর, তাহার সঙ্গে সঙ্গেও তোমাদের অসার আয়ুঃ তিনি হরণ করিতেছেন । সুতরাং তোমাদের অসার আয়ুঃও তাহার সহিত প্রত্যাহ বুঝা ব্যয়িত এবং অনিত্য জীবনী-শক্তি ক্ষয়িত হইতেছে ; তোমরা কি তাহা দেখিতেছ না,—বুঝিতে পারিতেছ না ? অতএব, এই অনিত্য-অসার জড়পিণ্ড সংসারে আসিয়া, যাহারা ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরির নাম-সাধনে—গুণ-কীর্ত্তনে সারাজীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদেরই অসার আয়ুঃ কেবল সফল হয় । কেন না, অচেতন

[৪র্থ খণ্ড]

নবম পরিচ্ছেদ ।

f ৯৯

পাদপগণও তোমার মত আয়ুজ্ঞান, তাহাদিগেরও তোমার মত জীবন আছে ; কিন্তু, তাহারা অচেতন অবস্থায় জীবনাবিবাহিত করে, তবে তাহাদের সহিত সচেতন জীব তোমার সহিত কি পার্থক্য থাকিল ?—পাদপদিগের কি জীবন নাই ? তুমি যেমন অসার আয়ুর উন্মত্ততায় অহর্নিশ শ্বাস-প্রশ্বাস আদান-প্রদান কর, তেমনি নির্জীব ভক্তাও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করে ; সুতরাং তাহার সহিত তোমার আর কি পার্থক্য আছে ? ভক্তা কি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসবৎ বায়ু ত্যাগ করে না ? গ্রামবাসী অপরাপর পশুরাও আহার-নিদ্রা বা স্ত্রী-সঙ্গম করে না ? তোমার জন্ম কেবল আহার-নিদ্রা বা স্ত্রী-সঙ্গম করিবার নিমিত্ত নহে ; তুমি ক্ষুদ্র কীট নয়—অভিব্যক্তির অতি উচ্চ পরিণতির স্বরূপ অতি উচ্চ জীব মানুষ ; ইচ্ছা ও যত্ন করিলে, তুমি অনায়াসেই এই সংসার-শাশানেই অমৃত-আনন্দের অধিকারী হইতে পার ;—ভগবান্ শ্রীহরির নাম-সাধনায় নিরত হইয়া সুখ-শান্তি-আনন্দ-সলিলে অভিষিক্ত হইতে পারিলেই, তোমার মনুষ্যজন্ম লাভ সফল হইবে । কেন না, সুখ-শান্তি-আনন্দ লাভ করাই মনুষ্যজন্মের ও মানব-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য । নাম-সাধনার মহাফল—চরম-সুখ, চির-শান্তি স্থায়ী আনন্দ । অতএব, যে জীবনে ভগবান্নাম-সাধন আদৌ না ঘটে, তাহা জড় বা মৃত । যে কেবল আহার-নিদ্রা ভয়-মৈথুনাди লইয়া, কামিনীর কমনীয় আনন্দ্য কান্তি দর্শনে মোহিত হইয়া, স্থূল লইয়া ভুলিয়া থাকে—সে ভাবসৌন্দর্য্যধার সচ্চিদানন্দময় সূক্ষ্মরূপ ভগবানের সূক্ষ্ম-তত্ত্বের সন্ধান কোন কালে পায় না । সে কখনও আপনাকে ভগবানে যুক্ত করিতে পারে না—যুক্তও করিতে পারে না ; কেন না, তাহার হৃদয়ে ভাব নাই, ভক্তি নাই, ভাবনা নাই । যাহার হৃদয়ে ভাব-ভক্তি নাই, তাহার আবার, শান্তি-সুখ কোথায় ? বাস্তবিক, ভগবান্ শ্রীহরির অমৃতময় সুধাসিক্ত নাম যাহার কর্ণপথে কখনও প্রবেশ করে নাই, সে ব্যক্তি ও পশুতুল্য ; পশুতুল্যও নহে, পশু

অপেক্ষা অধম। কুকুর, গ্রাম্য-শূকর, উষ্ট্র ও গর্দভ হইতে তাহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। কারণ, কুকুর যেরূপ প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া, কুকুরীর পশ্চাৎ খাবমান হয়, কামাক্স মানুষও সেইরূপ আপনার প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া, মৃত্যুকে ভুলিয়া, অসার আশুর উন্মত্ততায় যৌবন-বিজ্ঞপ্তিত মোহের বশে—আপাতঃ প্রিয়দর্শনা পরিণাম কালভুজঙ্গিনী বিলাসিনীর বিলাসভোগে আসক্ত হইয়া, যাহা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, ভগবানে আত্মলীন করিতে সমর্থ হয় না। শূকর যেমন রম্য কুসুমকাননে প্রবিষ্ট হইয়া, বিষ্ঠা খুঁজিয়া বেড়ায়, কুসুমের সুগন্ধ-সম্ভারে অনবধানতা প্রকাশ করিয়া, বিষ্ঠাতেই নিষ্ঠা পোষণ করে, সংসার-সুখোন্মত্ত বিষয়াসক্ত মানবও তদ্রূপ সংসারারণ্যে প্রবেশ করিয়া, সংসার-অবস্করে মুক্ত হইয়া, সংসারসুখ-ভোগে আসক্ত থাকিয়া, হরিনাম সুধারসে অনবধানতা প্রকাশ করে। উষ্ট্র যেরূপ কণ্টকাক্ষিত সমিধ-বৃক্ষ-পত্র ভক্ষণে স্বীয় মুখ কত-বিক্ষত করিয়াও, রক্তাক্ত মুখে বারংবার সমিধ-বৃক্ষের কণ্টক চর্বণ করে, সংসারাসক্ত মানবও তদ্রূপ বারংবার জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসারে প্রতিজন্ম-দুঃখদ স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া, সংসারের পার্থিব সুখৈশ্বর্য লইয়া টানাটানি করিয়া থাকে; অথচ, সুখের আকর, চির-শান্তির লীলা-নিকেতন—আনন্দ-ভবন ত্রিতাপহারা ভগবান্ শ্রীহরির অমৃতময় সুধাসিন্ধু নামে তাহার অনবধানতা উপস্থিত হয়। আর, গর্দভ যেরূপ চন্দন-ভার বহন করে; কিন্তু সে চন্দনের সুগন্ধ-সম্ভারে অনবধানতা প্রকাশ করিয়া, চন্দনকে ছেঁয় বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ সংসারাসক্ত মানবও সংসারের সার আনন্দ-অপার হরিনাম-সুগন্ধে অবধান না করিয়া, সংসার-ভার বহন করিয়া থাকে; —“হা হা লোকা বিমূঢ়াঃ সুখরসবিমূঢ়াঃ কেবলা দুঃখভারাঃ।” ফলে—ইহারা সকল প্রকার সুখরসে বঞ্চিত হইয়া, কেবল দুঃখভার মাত্র বহন করিতেছে। নাম ত্যজিয়া, নামে প্রমাদ করিয়া, সংসারে

[৪র্থ খণ্ড]

নবম পরিচ্ছেদ ।

১০১

মজিয়া থাকিলে, তাহাকে পরিণামে হরিপ্রেমে বঞ্চিত হইয়া, আজন্ম-
সঞ্চিত স্তূপীভূত দুঃখের ভুযানলে দগ্ধ হইতে হইবে, ইহা পূর্ণ সত্য ।
কেন না, ইহারা নামাপরাধী । দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারকে ভিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন,—‘সনৎকুমার ! প্রিয়সাহস, বিবেক-বৈরাগ্য-বিবর্জিত,
দেহাজ্ঞ-প্রিয়ার্থ-পরাস্বর্ণ জনগণের প্রমাদবশতঃ উক্ত অপরাধসকল
কিরূপ করিলে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না ?’ তদুত্তরে সনৎকুমার
বলিলেন,—

“জ্ঞাতে নামাপরাধে তু প্রমাদে তু কথঞ্চন ।

সদা সঙ্কীৰ্ত্তয়নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥

নামাপরাধযুক্তানি নামান্তেব হরন্ত্যমম্ ।

অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্তেবার্থকরাপি যৎ ॥”

পদ্মপুরাণ । স্বর্গ । ৪৮

‘প্রমাদবশতঃ কোনরূপে নামাপরাধ জন্মিলে, সদা নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন
করতঃ তদেকশরণ হইবে, নামাপরাধজ পাপসকল নামেই হরণ করে ;
সেই নামসকলই অবিশ্রান্ত সর্বার্থসাধক হয় ।’ তাৎপর্য্য এই যে,
প্রমাদবশতঃ যদি কোনরূপে নামাপরাধ জন্মে, তবে সর্বভয়ভঞ্জন
ভক্তবৎসল ভগবানের শরণাগত হইয়া, ঐকান্তিক ভক্তি-সহকারে
একাগ্রতার সহিত তন্ময়ভাবে অহর্নিশ নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে হইবে ।
তাহা হইলে, প্রমাদবশতঃ নামাপরাধ খণ্ডিত হইবে ; যেহেতু,
নামাপরাধ-জন্মিত পাপ-রাশি নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনেই নাশ পাইয়া থাকে,
নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন ব্যতীত নামাপরাধ খণ্ডাইবার উপায়ান্তর নাই । অতএব,
অবিশ্রান্ত-ভাবে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন করিবে, নামই জীবের সর্বার্থসাধক ;
তত্ত্ব জীবের মঙ্গলকর আর দ্বিতীয় নাই ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

নামে অপব্যবহার ।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি পূর্বে বলিয়াছেন যে,—‘নবম নামাপরাধ—নাম-সাধনে শ্রদ্ধাহীন হওয়া এবং বিমুক্ত অনধিকারী নাস্তিকমতি দুর্নীতিপরায়ণ অভক্ত অভাজনকে নাম উপদেশ দাওয়া,—ইহাও নামাপরাধ ।’ কিন্তু, পাষণ্ড জগাই মাধাইও ঐ শ্রেণীর, তবে যিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনি কি তাহাতে অপরাধী হইয়াছিলেন ?

উপদেশো হি মূর্খাণাং বৃথা বৈ নগনন্দিনি ।

তথৈব বিষ্ণুভক্তেহি উপদেশো বহিস্মুখে ॥

অহিনা চ পয়ঃ পীতং তৎপয়ো হি বিষায়তে ।

তথা বৈ চান্ধভক্তানাং বিষ্ণুভক্তিবিষায়তে ॥

পদ্মপুরাণ । উত্তর । ১০২

মহাযোগী মহেশ্বর, মহেশ্বরীকে কহিতেছেন,—‘অয়ি পার্বতি ! দুর্নীতিপরায়ণ নাস্তিকমতি অভক্ত অভাজন মূর্খদিগকে উপদেশ দাওয়া যেমন বৃথা, তেমনি ভক্তি-বহিস্মুখে জনে হরিনাম-সাধনের উপদেশ করিলে, তেমনি বৃথাই হইয়া থাকে । সর্প দুগ্ধ পান করে; কিন্তু সে ভাণ্ডের অবশিষ্ট দুগ্ধ বিষাক্ত হইয়া থাকে । এইরূপ যাহারা অন্যদেব-ভক্ত, তাহাদের বিষ্ণুভক্তি অর্থাৎ নাম-সাধন বিষের গ্যায়ই প্রতিভাত হয় ।’ অতএব, যে জন নামে শ্রদ্ধাশূন্য, যে জন নামে

[৪র্থ খণ্ড]

দশম পরিচ্ছেদ ।

১০৩

বিমুখ ; আর, যে অভক্ত অভাজন সুধাসিন্ধু নাম শুনিতেও
 অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে নামোপদেশ দাওয়া নামাপরাধ । যিনি এইরূপ
 অসম্মত কর্ম করেন, তিনি যথার্থই অপরাধী । বাস্তবিক, পবিত্র নির্মল
 সুস্বাদু উপাদেয় আহার্য্যকে যদি কেহ পুতিগন্ধময় অপবিত্র মলপূর্ণ
 স্থানে নিক্ষেপ করে, তবে কি সে অপরাধী হয় না ? অবশ্যই তাহাতে
 তাহাকে অপরাধী হইতে হয় । যে নরাদম, সুধাসিন্ধু হরিনামের কদর
 জানে না, গুরু-গোবিন্দ মানে না ;—অমৃতময় রসাল সুধাসিন্ধু
 হরিনামকে বিষবৎ জ্ঞান করিয়া, নামের অনাদর করে, তাহাকে
 নামোপদেশ করিলে, উপদেশকেরই পাপ হয় । তাহাতে তাঁহারই
 নামের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করা হয় ; কেন না,—“চন্দনোহনল-
 সংদন্ধো ন ভস্ম সুরভি কচিৎ ।” সুগন্ধিত চন্দন কাষ্ঠ অনলে পুড়িয়া,
 ভস্মীভূত হইলে, সেই অনলদগ্ধ চন্দন কাষ্ঠভস্ম কদাপি সুরভি প্রদান
 করে না অর্থাৎ অভক্ত অভাজনকে নামোপদেশ করিলে, তাহাতে
 মহিমাময় হরিনামেরই মহিমার লাঘব হয় ; নাম তাহাতে মহিমা
 প্রকাশ করেন না,—কাজেই তখন তাহারা ঘোর নাস্তিকতায় মস্তক
 উন্নত করিয়া, আশ্ফালনের সহিত কহিয়া থাকে,—‘নামটা শুধু কথা ।’
 কিন্তু যাহারা দিব্যচক্ষে দেখিয়াছেন, যাহারা অনেক স্থলে পরীক্ষা
 করিয়াছেন, তাহারা নাস্তিকের চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বলিয়াছেন,
 —“যেই নাম, সেই নামী নাহিক অন্থথা । মুঢ়জনে ভাবে মনে, নাম
 শুধু কথা ।” যদি বল,—দুর্নীতি-পরায়ণ দুর্ন্যতিদিগকে নাম সাধন
 করিতে যদি উপদেশ না দাওয়া যায়, তবে যে পাষণ্ডের দলই বুদ্ধি ও
 পুষ্টি হইতে থাকিবে, তবে অন্ধ-আতুর অনাথ-নিরাশ্রয় পাপী-তাপী
 জনের উদ্ধার হইবে কিরূপে ? পূর্বের বলা হইয়াছে যে, ঘোর পাষণ্ডও
 নাম সাধনের অধিকারী এবং নাম-সাধন করিলে, তাহারাও উদ্ধার
 পাইবে ; সুতরাং তাহাদিগকে উপদেশ দাওয়া কর্তব্য হইতেছে ।
 সত্য কথা, উহাদিগকে উপদেশ দিয়া, অগ্রে ধীরে ধীরে সংপথে

১০৪

সুগম সাধন-পন্থা ।

আনয়ন করিতে হইবে, তৎপরে বিমুণ্ডভক্তির উপদেশ করিতে হইবে ।

শৈশবের চ যথা মাতা গুড়ং স্তোকং দদাতি বৈ ।

পুনর্বাচতি বৈ বালো গুড়ং বৈ লোভকারণাৎ ॥

পদ্মপুরাণ । উত্তর । ১৩২

শৈশবকালে, স্নেহময়ী জননী যেমন বেগবান্ স্নেহাতুৰ আদর-কম্পিত মধুর স্বরে সন্তানকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া, তাহার দ্বারা কোন কার্য্য করিবার মানসে আদরতরে অল্প অল্প গুড় প্রদান করেন; পরে লোভহেতু বালক তাহা পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিলে, মাতা তাহাকে গুড়ের লোভ দেখাইয়া, তাহাকে কণ্ঠে নিরত করেন, বালকও অবাধে গুড়ের লোভে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে, অনিচ্ছা প্রকাশ করে না; তদ্রূপ নাস্তিকমতি দুর্নীতিপরায়ণ অভক্ত অভাজন মূঢ়দিগকে প্রথমে প্রলোভন দেখাইয়া, সংপথে আনিয়া, তাহাদিগকে সংপথে নিয়ত করিতে হয়; তাহারা ইচ্ছা করিয়া, সংপথে চলিলে, তাহাদের চিত্ত সদা সচ্চিন্তায় সংকথায় আবিস্ট হইলে, তৎপরে উত্তরোত্তর বিমুণ্ডভক্তির উপদেশ তাহাদিগকে দিতে হয় । তাহাদের চিত্ত যদি ঐরূপে সদা সংপন্ন হয়, মন যদি সংবস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারে, তাহা হইলে, তাহাদের হৃদয়ের অশ্রুস্রাব, জ্ঞানকাণ্ড, অভক্তি, দুর্মতি আপনা-আপনিই দূরে অপসৃত হয় । তখন তাহাদের হৃদয় ভক্তিরসে আশ্রুত হয়, ভক্তি-ভরে সুখাসিক্ত হরিনাম সাধনে নিরত হইয়া; নামের প্রভাবে, ভক্তির বিভবে, প্রেমের মহিমায় তাহাদের হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে;—“সর্বং ত্যক্ত্বা বিরাগী নিজহিতনিরতঃ সৌখ্যলাভে প্রসক্তঃ ।” তখন সেই বিরাগী পুরুষ পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পত্তি সুখৈশ্বর্য্যের গাঢ় আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল একমাত্র নিজ পারলৌকিক হিতসাধনে নিরন্তর অনুরক্ত ও পরম সুখ লাভ জন্ম সতত নাম-কীর্ত্তনেই নিযুক্ত হইয়া থাকেন । পাপিষ্ঠ দুর্মতি জগাই-মাধাইকে

[৪র্থ খণ্ড]

দশম পরিচ্ছেদ ।

১০৫

মহাপ্রভু এইরূপেই সৎপথে আনিয়া, সংশিক্ষা দিয়া, নাম-কীর্তনে নিরত করিয়া, তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। অতএব, নাম-সাধক ! এইরূপেই শ্রদ্ধাহীন, অভক্ত-অভাজন পাষণ্ডদিগকে অগ্রো সৎপথে আনিয়া, তাহাদিগকে সছুপদেশ দিয়া, সদা সৎ-বস্তুর প্রতি তাহাদের চিত্তকে আবিষ্ট করিয়া, তৎপরে তাহাদিগকে নাম-সাধনায় নিরত করিতে হয়। তাহা না করিয়া, তাহাদিগকে প্রথম হইতেই নাম-সাধনায় নিরত করিতে চাহিলে, তাহাদের চিত্ত তাহাতে আবিষ্টও হইবে না, এবং যিনি তাহাদিগকে নামোপদেশ প্রদান করিবেন তিনিই তাহাতে অপরাধ-ভাগী হইবেন, সংশয় নাই। শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসহীন অভক্ত-অভাজন পাষণ্ডের হৃদয়ক্ষেত্র যে মরুভূমি-সদৃশ ! কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ, হিংসা-দ্বेष প্রভৃতি উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ তৃণ-গুন্ম-পরিশূণ্য বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ন্যায়—সদাই ধূ ধূ করিতেছে!—এ যে সাহারার ভীষণ ক্ষেত্রের ন্যায় অনুর্বর উষর ক্ষেত্র—শস্ত্র-উৎপাদিকা-শক্তি-বিরহিত;—এ যে সর্বসাধারণ-বিবর্জিত ! পূর্বে যে নবদ্বীপের পূর্ণচন্দ্র, কলিপাবন প্রেমাবতার শ্রীগৌরচন্দ্র, জগাই-মাধাই হেন পাষণ্ড অনধিকারীকে নাম উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন সেই কলি-পাবন মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শে তাহাদের হৃদয় পবিত্র হইয়াছিল; সে একদিন ছিল—পতিতোক্কারের সময়। মরুভূমি তখন পুণ্যভূমিতে পরিণত ছিল। এই অনুর্বর উষর ক্ষেত্র, তখন উর্বরতার আদর্শক্ষেত্রে পর্যাবসিত ছিল। পবিত্রতার অমৃত-উৎসে, ভক্তি-মন্দাকিনীর পূত-প্রবাহে, ফল-ভারাবনত প্রেম-কল্প-পাদপের স্নিগ্ধচ্ছায়ায়—বিশুদ্ধ হৃদয়-ক্ষেত্র তখন কাম্য-কাননের মনোমদ মূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে হৃদয়-ক্ষেত্রে বীজ বপন হইবে না ত হইবে কোথায় ?—আর, অধুনা পাষণ্ড-হৃদয়-ক্ষেত্র যে, সর্বসাধারণ-বিবর্জিত ! দয়ার জলনিধি অধুনা তাহা হইতে দূরে—বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। বিশ্বাসের একটা ক্ষুদ্র প্রস্রবণ ছিল; সেও

বহুদিন হইল, বিশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ভক্তি-মন্দাকিনী “কচিচ্ছিন্না কচিচ্ছিন্না” হইয়া কেথায় মিশিয়া লোপ পাইয়াছে। সমবেদনার পাদপ-
ছায়া হিংসা-দেষ-তক্ষক-দংশিত বিষ-বিশুদ্ধ পত্র-কাণ্ড-পরিত্যক্ত,—তাহা
শ্রান্তপ্রাণে শাস্তিদানে আর সমর্থ নয়! উপকারীর প্রতাপকার-লালসা,
ক্ষীণা লতিকার ন্যায়, তরু-শিরে আশ্রয় লইতেছিল; কিন্তু বৃক্ষ
আপনিই উচ্ছেদিত—আশ্রিতা লতা থাকিবে কোথায়? সত্যের স্নিগ্ধ
চন্দ্রমা, মিথ্যা-মার্ত্তণ্ডের খর করে—তীব্রতাপে দৃষ্টি-বহিভূত হইয়া
পড়িয়াছে। সরলতার ক্ষুদ্র নিবারণ, আজি কুটিলতার কালকূটে
পরিপূর্ণ। এ হৃদয় ক্ষেত্রে কি শস্যোৎপাদন সম্ভবপর?—বীজ ভেজস্বী
ও অমোঘ; কিন্তু, ক্ষেত্র যদি অপকৃষ্ট ও আবর্জনা-পূর্ণ বা শুষ্ক হয়,
উষর বা উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ মরু হয়, তবে অকুরের আশা কোথায়?
হৃদয়-ক্ষেত্রে কৃষ্ণ-প্রেমাকুরের আশা করিলে, অগ্রে হৃদয়-ক্ষেত্রের
কাম-ক্রোধ হিংসা-দেষ প্রভৃতি অবস্কার জঞ্জালগুলিকে দূর করিবার
জ্ঞান সাধুসঙ্গ-রূপ লাজল দ্বারা ক্ষেত্র পরিষ্কার করিতে হইবে। ক্ষেত্র
পরিষ্কৃত হইলে তাহাতে বিশ্বাসরূপ খত দ্বারা ক্ষেত্র উর্বর করিয়া
প্রযত্ন-সেচনী দ্বারা বিবেক ও বৈরাগ্য-বারি প্রাণপণে সেচন করিতে
হইবে। তাহার পর সেই উর্বর সরসক্ষেত্রে নামের বীজ বপন
করিলে, অচিরে প্রেমাকুর প্রকাশ পাইবে। তখনই বৃক্ষে মোক্ষময়
নিত্যজ্ঞান ফল ফলিবে, তাহা হইতে ‘অমৃতত্ব’ লাভ হয়; ইহা
নিশ্চিত। উষর অনুর্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া, বীজের অপব্যবহার
করা যেমন অগ্নায়, পাষণ্ডকে নামোপদেশ করাও তেমনই অগ্নায়
অপরাধ হয়। যে যাহার আদর জানে না, কদর বুঝে না, তাহাকে
তাহা দেওয়া কি দরের জিনিষের অনাদর করা নয়? পবিত্র নিষ্ঠালা
যদি কেহ পূতিগন্ধপূর্ণ পায়খানায় ফেলিয়া দেয়, তবে সে কি তাহাতে
অপরাধী হয় না? যাহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম জানে না, দেবতা-গুরু মানে
না;—তুচ্ছ অভিমানের দাবদাহে যাহাদের প্রাণ সদা জর্জরীভূত,—

[৪র্থ খণ্ড]

দশম পরিচ্ছেদ ।

১০৭

অবিশ্বাসের অস্বাস্থ্যকর পুতিগন্ধে—সংশয়ের দারুণ আধারে বাহাদের অস্তঃকরণ চির-সমাবৃত ; যাহারা শিশ্নোদর-পরায়ণ, তাহারা ত নরধম, বানর বা বনমানুষ বিশেষ । মুক্তাহার যদি কেহ বানরের গলায় পরাইয়া দেয়, তবে কি সে ব্যক্তি অপরাধের ভাগী হয় না ? অতএব, নাম-সাধক ! এরূপ পাষণ্ডকে নামোপদেশ প্রদান কবিয়া নামের অপব্যবহার করিও না । অনেকে কহিয়া থাকেন,—‘শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু সকলকেই নামোপদেশ প্রদান করিয়া, নাম-কীৰ্ত্তনে নিরত করিতেন ।’ সত্য কথা ; কিন্তু, তোমার জানা উচিত যে, নরকে মন্দাকিনী-ধারা বহাইয়া, স্বর্গে পরিণত করিবার জন্য যাহাদের আবির্ভাব, যাহারা যুগপৎ চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় উদ্ভিত হইয়া, অসাধ্য হুসাধ্য করিয়া, অসম্ভব সম্ভবে মিশাইবার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে কাহার তুলনা হইতে পারে ? নাম-সাধকেরই নামাপরাধ হয় । তাঁহারা নাম-সাধক নহেন, তাঁহারা সাধকের সাধনার ধন অমূল্য রতন ছিলেন । তাঁহাদের নামাপরাধ হইতে পারে না, নামাপরাধের ভয় নাম-সাধকের—সাধকের অপরাধ অমার্জ্জনীয় । একদা দেবর্ষি নারদ, সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—‘যদি কেহ ভ্রম-বশে অভক্ত-অভাজন পাষণ্ডকে নামোপদেশ দিয়া নামাপরাধী হয়, তবে তাহার সেই অপরাধ কিরূপে বিনাশ হইবে ?’ তদুত্তরে সনৎকুমার কহিলেন,—

“সৰ্ব্বাচার বিবৰ্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো ভ্রাত্যা জগদ্বন্ধকা—
 দস্তাহঙ্কৃতিপানপৈশুনপরাঃ পাপাশ্চ যে নিষ্ঠুরাঃ ।
 যে চাত্রে ধনদারপুত্রনিরতাঃ সৰ্বেহধমাস্তেহপি হি,
 শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দশরণাঃ শুদ্ধা ভবন্তি দ্বিজ ॥”

পদ্মপুরাণ । স্বর্গ । ৪৮

‘হে গোবিন্দ-প্রিয় গোবিন্দধর্ম্মবিৎ নারদ ! যাহারা সৰ্ব্বাচার-বিবৰ্জিত, শঠ-বুদ্ধি, ভ্রাত্য অর্থাৎ পতিত, জগদ্বন্ধক, দস্ত, অহঙ্কার,

পান ও গিশুনতা-পরায়ণ, পাণী ও যাহারা নির্ভুর; আর ধন-দার-পুঞ্জ-
নিরত যে সকল অধম আছে, তাহারাও শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দ-শরণ
লইলে, শুদ্ধ হয়। ইহজগতে যাহারা সেই দেববর স্থাবর-জঙ্গমাত্মক
জীবের মুক্তিকর পরম করুণাকরকে অতিচরণ করিয়া অপরাধপর হয়,
কেবল নামই তাহাদিগকে রক্ষা করে।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

সংসারে রতি ও নাম মাহাত্ম্যে অরতি ।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি পূর্বে বলিয়াছেন যে,—‘দশম নামাপরাধ—নাম-মাহাত্ম্যে শুনিয়াও নাম-কীর্তনে প্রীতি না করিয়া, সংসারে প্রীতি করা এবং অহঙ্কার-মমাকারে মত্ত হইয়া, নাম-মাহাত্ম্যে অশ্রদ্ধা করা, নামাপরাধ ।’ কিন্তু, জগতে সকলেই ত স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া, নাম-মাহাত্ম্যে প্রীতি স্থাপন করিতে পারে না ; তবে কি তাহাদেরও অপরাধ হয় ? তাহা হইলে কি তাহারা গৃহ পরিত্যাগ করিবে ?

মানন্দং সদনং স্তুতাশ্চ স্তুধিয়ঃ কান্তা ন দুর্ভাবিনী,

সমিত্রং স্ত্বধনং স্বযোষিতি রতিশ্চাজ্ঞাপরা সেবকাঃ ।

আতিথ্যং শিবপূজনং প্রতিদিনং যুষ্টানুপানং গৃহে,

সাধুসঙ্গমুপাসতে হি সততং ধনো গৃহস্থাশ্রমঃ ॥

গৃহত্যাগ করিয়া, জন-সমাগম-শূন্য বিকট স্থাপদ-সঙ্কুল ঘনারপেয়-যাইতে হইবে না ; গৃহেই থাকিয়া, গৃহমেধী স্তুতৈশ্বৰ্য্যে রতি না করিয়া, নাম-সাধনে রতি করিতে হইবে, ইহাই বলা হইয়াছে ; কেন না, সংসার বিষয়ে নিরত থাকিলে, নাম-মাহাত্ম্যে রতি জন্মে না,—এই জন্মই গৃহাশ্রম নিন্দনীয় । কিন্তু, গৃহস্থাশ্রম নিন্দনীয় হইলেও, অধিকারী-বিশেষে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় । অর্থাৎ যাহাদের হৃদয়াকাশ বৈরাগ্য-ভাস্করের তীব্র রশ্মিতে সতত সমুজ্জ্বলিত, তাহাদের পক্ষে গৃহস্থাশ্রম হেয় বটে ; কিন্তু, যাহাদের হৃদয়-কন্দর

অজ্ঞান-অন্ধকারে—মোহ-কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন, বৈরাগ্য-ভাস্করের
 রক্ষিকার লেশমাত্রও সম্প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, তাহারা গৃহস্থাশ্রম
 পরিত্যাগ করিলে, তাহাদিগকে বিপথগামী হইয়া, উভয়-ভ্রষ্ট হইতে
 হয়। সুতরাং গৃহস্থাশ্রম হেয় হইলেও, তথাবিধ অবিরাগী অনুরক্ত
 জনগণের পক্ষে শ্রেয়। কেন না, তাহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া,
 পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে স্বায়ত্বাধীন ও দুর্জয় রিপুচয়কে বশীভূত করিয়া
 বিবেক-বৈরাগ্যে হৃদয় দীক্ষিত হইলে, গৃহমেধী সুখনিচয়ে যুগা জন্মে,
 তৎকালে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিবার অধিকারী হয়, তদবস্থায়
 গৃহত্যাগ দোষের কারণ হয় না। কিন্তু পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও রিপুনিচয়
 অবশীভূত অবস্থায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, লোকতঃ বৈরাগ্য গ্রহণপূর্বক
 বনে গেলে,—“বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাম্” অর্থাৎ যাহারা
 পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়পঞ্চকে একান্ত অনুরক্ত, ষড়রিপুর একান্ত
 আত্মবহ চিরকিঙ্কর, তাহারা পুত্র-পরিজন আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত,
 আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্বৃত ভোগ্য-বিষয় ও ধন-সম্পত্তি সুসজ্জিত
 শোভন-সৌন্দর্য্যময় গৃহমেধী সুখশান্তির লীলা-নিকেতন, আনন্দ-ভবন
 —গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, সংসার-কলোন্মল-কোলাহল
 গুণ্ণগোলের অন্তরালে, বিকট ব্যাঘ্র-ভল্লুক-সমাকুল বিজন বিপিনে
 ঘনারণ্যে গিয়া বসবাস করিলেও, রক্ষা নাই,—তাহাদের নির্জ্ঞন
 বনমধ্যেও নানাবিধ দোষ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্র বলিয়াছেন,—
 “গৃহেহপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ” যাহারা পুত্র-পরিজন—
 আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত, প্রভূত ধন-সম্পত্তি-সমম্বিত সুখ-
 ধরলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্যাবলীতে বসবাস করিয়া,
 অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া, অনেকের উপর প্রভুত্ব করিয়া,
 ভোগস্বখের তুঙ্গ-সীমায় উপনীত হইয়াও, তাহাতে না মজিয়া, পুত্র-
 পরিজনের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সুখ-দুঃখ-মান-অভিমান প্রভৃতি
 দৃন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া, মায়ার গণ্ডী ভেদ করিয়া, দুর্দান্ত

[৪র্থ খণ্ড]

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

১১১

পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চ-বিষয় হইতে চিত্তকে ধীরে ধীরে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, রুদ্ধেন্দ্রিয় হইয়া, দুৰ্জ্জয় রিপুগণকে স্ববশে রাখিয়াছেন, তাঁহার। সংসার-কল্লোল-কোলাহল-গণ্ডগোলের মধ্যে গৃহস্থাত্মমে থাকিয়াও কঠোর-কৃচ্ছ্র উগ্র তপঃ-সাধনার ফল লাভ করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহাদের তাদৃশ পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহই কঠোর-কৃচ্ছ্র তপস্তা বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব সুখ-শান্তির আগার গৃহস্থাত্মমকে পরিত্যাগ করিয়া, বনবাস করিবার কোনই প্রয়োজন নাই; গৃহস্থাত্মমে থাকিয়া, দুৰ্দ্ধমমায় পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া,— “অকুৎসিতে কৰ্ম্মণি যঃ প্রবর্ততে”, যিনি নিম্নিত কাৰ্য্য পরিত্যাগ-পূৰ্ব্বক সংসার-কাৰ্য্য নির্বাহ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বিরাগী ও বীর-সাধক; তাদৃশ—‘নিবৃত্তরাগস্ত গৃহং তপোবনম্’ নিবৃত্তি-রাগ বিরাগভাজন পুরুষের পক্ষে উল্লোণ-কোলাহলময় গৃহস্থাত্মম ও নির্জ্জন তপোবন উভয়ই সমান। সুতরাং যাঁহার অন্তঃকরণ হইতে বিষয়ানুরাগ দূরীভূত হইয়াছে, মন পাপকৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, যিনি পুত্র-পরিজন-পরিবেষ্টিত বৃহৎ সংসারের মধ্যে থাকিয়াও সংযমী জ্ঞিতেন্দ্রিয় ও তপস্বী; তাঁহার সেই বাসগৃহই তপোবন বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং তিনি সংশিক্ষা দ্বারা সন্তান-সন্ততিদের চরিত্র গঠন করিয়া, তাহাদের অন্তঃকরণকে পবিত্র করিয়াছেন, সংশিক্ষা সহুপদেশ পাইয়া, পুত্র-কন্যাগণও চরিত্রশীল সদগুণসম্পন্ন হইয়াছে; সহুপদেশ সংশিক্ষা দ্বারা তাঁহার পত্নীও সুভাষিনী হইয়াছে; তিনি সুমিত্রলাভে চরিতার্থ হইয়া, সদা সৎপ্রসঙ্গে সাধুসঙ্গে সদালাপে জীবন যাপন করিতেছেন; স্বধৰ্ম্মে থাকিয়া ধনোপার্জন করিতেছেন এবং পরদার-বর্জিত হইয়া স্বদারে রত থাকেন; তিনি কাহার প্রতি কখনও দুৰ্ভাষা প্রয়োগ করেন না; সেবকগণ সতত তাঁহার আজ্ঞাকারী; তাঁহার গৃহে প্রতিদিন অতিথি-সমাগম হয় ও যথাযোগ্য সৎকার হইয়া থাকে; তিনি প্রত্যহ ভগবানের অর্চনা না করিয়া,

আহার করেন না এবং আমিষ-বর্জিত বিশুদ্ধ পবিত্র সন্তুগ্নসম্পন্ন ষথালক্কি
অন্ন-পানীয় আহাৰ্য্য ভোজন করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন ; তিনি ভগবৎ-
পরায়ণ হইয়া সতত, ভগবানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ভগবন্তের
সেবা করিয়া থাকেন ; তাঁহার সেই গৃহ অতি উৎকৃষ্ট । অতএব
যাঁহার গৃহ এতাদৃশ গুণযুক্ত, তিনি স্বগৃহে বসবাস করিয়াও
পুরুষোত্তম,—তাঁহাকে তাদৃশ গৃহস্বাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, আশ্রমাস্তর
গমন করিতে হইবে না ; কেন না,—“গৃহেহপি মোক্ষঃ পুরুষোত্তমানাম্”
তিনি গৃহস্বাশ্রমেই বসিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন ; সুতরাং—
“ধনো গৃহস্বাশ্রমঃ ।” তনে কথা এই যে,—

“দারাস্তে যে ভজনসহায়াঃ,

পুত্রাস্তে যে তদ্বনকায়াঃ ।

ধনমপি তদ্বন্ধরিভজনার্থং,

নো চেদেতৎ সর্বং ব্যর্থম্ ॥

তাঁহাকেই দারা বলা যায়, যে জায়া ভগবন্তজনে সহায়া হয় ;
সুতরাং যে জায়া ভগবন্তজনে সহায়া নহে, সে জায়া নয়, তাঁহাকেই
মায়া বা মায়াবিনী রাক্ষসী বলিয়া জানিবে । সেইজন্য মায়ামুক্ত
অবধূত অংশাবতার দত্তাত্রেয় কহিয়াছেন,—“নারী প্রত্যক্ষরাক্ষসী ।”
আর, তাঁহাকেই পুত্র বলা যায়, যে পুত্র পরকালের সজ্জের সম্বল হয়, ।
তাহা কি ? ধর্ম্মার্জিত ধন অর্থাৎ ধর্ম্মপাথে থাকিয়া বা ধর্ম্মে মতি
রাখিয়া, যে ধন উপার্জন করা যায় সেই ধনকেই পুত্র বলে ; আর
অন্য যে পুত্র, ইহাকে পুত্র বলে না,—ইহা মূত্র । তাঁহাকেই প্রকৃত
ধন বলা যায়, যে ধন ভগবন্তজনের সহায়ক হয় ; যে ধনের বিনিময়ে
প্রেমধন মিলে, সেই ধনই প্রকৃত ধন । নতুবা যে ধনের অর্জনে ভয়,
রন্ধনে ভয় এবং ব্যয় হইলে মনস্তাপ ভোগ করিতে হয়, যে ধন
সঞ্চিত হইলে, কাৰ্পণ্য, দম্ভ, অভিমান, অহঙ্কার উপস্থিত হয়,
ধনাধিক্যে অকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, তাঁহাকে ধন বলা যায় না,—তাঁহাই

[৪র্থ খণ্ড]

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

১১৩

দরক,—ভক্তিপথের কণ্টক এবং মুক্তিপথ অবরোধক । অতএব, দারগ্রহণে, পুত্রোৎপাদনে ও ধনার্জনে মানবের সুখ কোথায় ? ‘অজৈয় অমেয় দুঃখ, হা হতাশ—মনঃপীড়া—আন্তরিক যাতনা ।’ কেবল কি তাহাই ?—‘হৃদয়ের অন্তস্তলে চিন্তানলে সদাঙ্গলে, সুশান্তি আরাম গত শুধু মনোবেদনা ;’ সুতরাং জানা গেল যে—‘দারাদনাগারশরীরবান্ধবাঃ’ এই সকলে মানবের সুখ নাই, কেবলই দুঃখ—কেবলই যন্ত্রণা !—কেবল কি একজন্মে ইহারা দুঃখদ ?—‘এতে ভবন্তি প্রতিজন্মদুঃখদাঃ’ প্রত্যেক জন্মেই না জানি কত জন্মে যে ইহারা দুঃখ প্রদান করিয়া আসিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে ? অতএব,—‘দারাপুত্রে কোথা সুখ ?—অসুখই কেবলই ;’ কেবল দেখিতে সুন্দর ! এই সকলে সুখ নাই—শান্তি নাই ;—‘হীরকে অমৃত কোথা ?—গরলই সকলি ।’ তবে কেন মোহান্ব মানব, ঐ সকলে আসক্ত হইয়া পড়ে ?—নিশ্চয় জানিও,—‘যেখানে আসক্তি নাই, সেই ত সুখের ঠাই ।’ বেশ বুঝা যায়,—‘যেখানে আসক্তি আছে সেইখানে যাতনা !’ অতএব, মূঢ় মানব ! একবার ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, ষড়রিপু সংযত করিয়া, ভাব, বুঝিতে পারিবে,—‘পলে পলে আসক্তির ভয়ঙ্কর ঘটনা !’—কিন্তু, তথাপি ‘আপাত সুখের তরে, শত শত বিজ্ঞ নরে, পরিণাম ভুলি করে আসক্তির সাধনা ;’ যখন আসক্তি করে, তখন অজ্ঞ নর কিছু বুঝিতে পারে না ;—‘কিন্তু অবশেষে হয়, কাঁদে সদা যন্ত্রণায়, জীবনের আশা ছাড়ি, মৃত্যু করে কামনা !’—অন্ধ মানব ! আসক্তির পরিণাম কি ভীষণ বুঝিলে ত ? অতএব, যদি ইহ-পরলোকে সুখী হইতে চাও, তবে দারা-পুত্র-ধন প্রভৃতিতে আসক্তি করিয়া, দুঃখের মাত্রা বাড়াইও না, অনিত্য অসার তুচ্ছ ধনের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সেই নিত্য ধনার্জনে দার গ্রহণে ও পুত্রোৎপাদনে ব্যাপ্ত হও, যে ধন-দার-পুত্র ইহলোকে সুখ-শান্তি-আনন্দপ্রদ এবং পরলোকে ভগবৎ-পদ-পঙ্কজ-পঙ্করাস্ত্রে প্রবেশ

করিবার সহায়তা করে, তাহাই অর্জন কর । জ্ঞানবান্ বিরাগরসিক ভক্তিভাজন মহাজন বলেন.—“বদক্ষরপদদয়ান্তরগতং ধনং তদ্বনম্ ।” মানব, ভোগের নিমিত্ত আত্যন্তিক চেচ্চা-সম্মত ভোগ্য বস্তু আহরণে অনায়াসেই সক্ষম হয়, দূর প্রবাহিনীর বা সমুদ্রের পারে যাইবার জন্য বুদ্ধি নৈপুণ্যে অর্ণব-পোতাди নিৰ্ম্মাণে তৎপর হয়, দুৰ্ভেদ জঙ্গল ভেদ করিয়া সুপ্রশস্ত পথ আবিষ্কারের উপায় করে ; কিন্তু নিত্যানিত্য সারাসার বস্তুর নির্ণয়োলক্ষে তাহার বুদ্ধির কার্যকারিণী শক্তি পরাহত হইয়া উঠে । বিষ্ঠাভোজী শূকর, যেমন সুগন্ধি কুসুম-কাননে প্রবেশ করিয়া, কুসুম-কাননের সুগন্ধ-সম্ভারে নিষ্ঠা না করিয়া, পুতিগন্ধময় বিষ্ঠাতেই নিষ্ঠা পোষণ করে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত-চিত্ত মোহাক্ষ মানবও উদ্ভ্রপ সংসার-কাননে প্রবিষ্ট হইয়া, কেবল কামিনী-কাঞ্চনের অন্বেষণ করিতে থাকে এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে, তুচ্ছ অসার অনিত্য সুখলাভে ক্ষণিক আনন্দে বিভোর হইয়া পড়ে এবং ক্ষণপরে অনন্ত দুঃখ সাগরে ভাসিয়া কঁাদিতে থাকে । মানব যে কেবল দুঃখ ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই,—কেবল কঁাদিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, তাহা একবার ভ্রমেও সে বুঝিবার চেচ্চা করে না, কেবল কামিনী-কাঞ্চনেই আসক্ত হইয়া, কঁাদিয়া কঁাদিয়া মানব-লীলা সম্বরণ করে । অতএব, বুঝা গেল যে,—

মতি ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা,
মিথোহভিপাঠেত গৃহত্ৰতনাম্ ।
আদাস্ত গোভির্বিশতাং তমিস্রং,
পুনঃপুনঃচৰ্ব্বিতচৰ্ব্বিতানাম্ ।

শ্রীমদ্ভাগবত । ৭ । ৫

গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি, স্বতঃই হউক, পরতঃই হউক ; আর, পরস্পর হইতেই হউক, কোন-রূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত হয় না । তাহার অশাস্ত-ইন্দ্রিয় বলিয়া, পুনঃপুনঃ সংসার-প্রবিষ্ট হইয়া, চৰ্ব্বিত-চৰ্ব্বণ করিয়া থাকে ।

[৪র্থ খণ্ড]

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

১১৫

বাস্তবিক যাহারা গৃহাসক্ত, যাহাদের অন্তঃকরণ বিষয়ে আসক্ত, তাহারা প্রিয়তমা প্রণয়িনীর সহিত নির্জজন-সংসর্গে মনোহর আলাপাদিতে, বন্ধুবর্গের স্নেহ-বন্ধনে এবং কলভাষী শিশুদিগের আশ্বস্ত্র শ্রবণে মোহিত হইয়া পুত্রাদিতে সতত অনুরক্ত হয়। সুতরাং তাহাদের মমতা এবং মমতাময়ী জায়ার মায়া পরিত্যাগ করিয়া, কোন্ ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত নিরত করিতে পারে? পুত্র-কন্যা, মিত্র-কলত্র, মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব, ভ্রাতা-ভগ্নী, খশুর-সম্বন্ধী, কুলক্রমাগত জীবিকা এবং পশু ও ভূত্যবর্গ ও ধন-সম্পত্তি, প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি বিভব-বৈভব সুখৈশ্বর্যে যাহাদের চিত্ত আসক্ত, তাহারা কি কখন এ সকলের আসক্তি ছাড়িয়া, ভগবানে আসক্ত হইতে পারে? ভগবান্ কে ভাবে? কৈ ভাবে? ভাবিলে, ভাগবত ফেলিয়া, ভামিনীর চরিত্র-বর্ণিত নাটক নভেল পড়ে কেন? কৃষ্ণকে ভুলিয়া, কামিনীর রূপ ধ্যানে মগ্ন কেন? ভগবৎ-প্রেম ছাড়িয়া যুবতীর প্রেমে বিভোর কেন? যাহারা যুবক, তাহারা না হয়, অসার আয়ুর উন্মত্ততায় যৌবন-বিজ্ঞপ্তিত মোহের বশে, ভগবান্কে ভুলিয়া যুবতীর প্রেমে বিভোর হয়, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু যাহারা আমল-শয্যাশায়ী অশীতিপর বৃদ্ধ—জীবন-নাট্যের যবনিকা-প্রান্তে অন্তর্জলীর পূতক্রোড়ে শায়িত—বিশ-রঙ্গমঞ্চে জীবনাবসান-রূপ দৃশ্যের শেষ যবনিকায় দাঁড়াইয়া আছে, পরকাল যাহাদের কাছাকাছি, দিন যাহাদের ঘনাইয়া আসিয়াছে, আয়ুঃ যাহাদের ফুরাইয়া গিয়াছে, মহাকালের দূত যাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, মহাকাল যাহাদের শিয়রে দাঁড়াইয়া অট্টহাসি হাসিতেছে, তাহারা তখনও জী-পুত্রাদির আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, ভগবান্কে চিন্তা করিতে পারে না। তাই বড় ক্ষোভে আবালবিরাগী শঙ্করাবতার জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,—

“বালস্তাবৎক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবস্তরুণীরক্তঃ

বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্নঃ ॥

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মৃত্যুতে ।

প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে ।”

চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্র ।

‘যাবৎ বাল্যকাল থাকে, তাবৎ ক্রীড়া-কৌতুকে আসক্ত হয়, পরে যৌবনকাল উপস্থিত হইলে, যৌবন-পথে পা দিয়া অমনি যুবক অসার আয়ুর উন্মত্ততায় যৌবন-বিজৃম্বিত মোহের বশে যুবতীর প্রেমে আত্মবিস্মৃত হয়, অবশেষে বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, জীবনাবসান দৃশ্যের শেষ যবনিকায় মৃত্যুর কোলে বসিয়া, নানাপ্রকার চিন্তায় মগ্ন হয় ; সুতরাং কেহই আর পরাৎপর পরমব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর চিন্তনে অনুরক্ত হয় না । অর্থাৎ বালকগণ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, যুবকগণ যুবতীর সহিত আমোদ-প্রমোদে অনুরক্ত হইতেছে এবং আসন্ন-শয্যাশায়ী অশীতিপর বৃদ্ধ—জীবন-নাট্যের যবনিকা-প্রাপ্তে অন্তর্জ্বলীর পূতক্রোড়ে শায়িত হইয়াও, অসার-সংসার চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে ; সুতরাং জগতে পরমব্রহ্ম ভগবানে কেহই আর মনোনিবেশ করিতেছে না । অতএব, হে মৃত্যুতে ! সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সর্বদা ভগবান্ গোবিন্দের আরাধনা কর, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, কেহ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না । তুমি যে “ডুকৃঞ্ করণে” ইত্যাদি ধাতু বিচারপূর্বক শাস্ত্রালোচনা করিতেছ, মরণ-সময় উপস্থিত হইলে, কিছুতেই তোমার মরণ-নিবৃত্তি হইবার নহে । সেই “ডুকৃঞ্ করণে” তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ।

অতএব, যে মানব নাম-মহিমা শুনিয়াও সংসারে আসক্তি করিয়া, নামে-রতি বা প্রীতি করে না, কেবল—‘আমি ও আমার’ ভাবে বিভোর হইয়া, সংসারেই রতি বা প্রীতি করে, সে নিশ্চয় নামাপরাধী । আমি ও আমার এই অহঙ্কার—মমাকার, সকল প্রকার অমঙ্গলের নিদান । সংসারে রতিমান্ কুটুম্ব-সম্পন্ন পুরুষের মন ধনের প্রতি, ও

[৪র্থ খণ্ড]

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

১১৭.

ঐশ্বর্যের প্রতি এতাদৃশ আসক্ত যে, সে পরধনাপহরণে পরকালে নরক এবং ইহকালে রাজদণ্ড প্রভৃতি প্রধান-দোষ অবগত হইয়াও, লোভ-সম্বরণে অপারকতাবশতঃ হরণ করে। এইরূপে গৃহাসক্ত ব্যক্তি গৃহাদিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া, কুটুম্ব-পালনে রত থাকিলে, নাম-সাধন করিতে সমর্থ হয় না ; প্রত্যুত বিমূঢ় হইয়া,—‘ইহা আমার, ইহা অপরের’ এইরূপ বিভিন্ন ভাবনা করিয়া তমোভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং—

ঐশ্বরোহমহমেবরূপবান্

পণ্ডিতোহস্মি স্তভগঃকোহপরঃ ।

মৎসমোহস্তি জগতীতি শোভতে,

মানিতা তদনু রাগিণঃ পরম্ ॥

শিবস্তোত্র ।

‘আমিই সর্বশক্তিমান, আমিই রূপবান, আমিই বিদ্বান, আমিই বুদ্ধিমান, আমিই ভোগবান, আমিই জনবান, আমিই ধনবান, আমিই বলবান, আমিই সুখভাক্,’ ইত্যাদিরূপ আমিষের মহান্ বোঝা বুকে করিয়া, আমিষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, জগৎকে জগতের স্বাবর জঙ্গমাত্মক জীব সমুদয়কে তাচ্ছিল্য জ্ঞানে ঘৃণা করিয়া, আপনাকে ঐশ্বর, আপনাকে রূপবান, আপনাকে বিদ্বান, আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া, আপনাকে ভুলিয়া, সংসারকে ভুলিয়া, আপনাকে সর্বশক্তিমান্ ভাবিয়া, আত্মপূজায় নিরত থাকে। এরূপ আমিষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, যাহারা আমিষের প্রসার বিস্তারে সচেষ্ট, তাহাদের হৃদয়ে ‘আমি ও আমার’ এই দুইটিরই একাধিপত্য, সেখানে রতি বা প্রীতির স্থান কোথায় ?—কিন্তু, ‘আমি ও আমার’ এই দুইটিই মানুষকে মনুষ্যত্ব হইতে ধাপের পর ধাপ নামাইয়া মূঢ়ত্বে—অন্ধত্বে, অবশেষে পশুত্বে পরিণত করে,—“ অয়ং নিজঃ পরোবেতি ” এই ব্যক্তি ‘আমার’ নিজের, ঐ ব্যক্তি ‘পরঃ’ এই ‘আমার’ শব্দই

ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া, 'আমিহে' পরিণত হয়। 'আমার ও আমিহ' আরও সঙ্কীর্ণ-ভাবাপন্ন হইয়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্যামাত্রে পর্যাবসিত হয়। কোথাও বা কেবল 'আমি' মাত্র বোধক হইয়া পূর্বভদ্র 'আমার' শব্দের বিদ্রুপাত্মক হইয়া উঠে এবং নাম সাধনায় সর্ববিশেষ আনিয়া উপস্থিত করে। এই 'আমি ও আমার' হইতেই স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি হয়, স্বার্থ-সংস্পর্শে হৃদয়স্থ প্রেম-প্রীতি রতি-ভক্তির বিনাশ হইয়া থাকে। তখন একবারও আর হৃদয়ের দিকে তাকাইতে সময়ও হয় না, অবসরও পায় না, প্রবৃত্তিও থাকে না, সাহসও কুলায় না। ইহাকেই বলে মানসিক দুর্বলতা—এই দুর্বলতাই পাপের জননী। দুর্বল হৃদয় পাপ-প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষায় অক্ষম। দুর্বল হৃদয়ে সার্বজনীন উদার ভাবের মলয়-মারুত বহে না,—সেখানে কেবল স্বার্থের পুতিগন্ধ। এই স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা কি সাংসারিক কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক, কি দৈনন্দিন—সকল জীবনেই মানবের জ্যেষ্ঠাভার অন্তরায়। কিন্তু মহাপুরুষদিগের হৃদয়ে 'আমার ও আমার' প্রভুত্ব নাই, তাই তাহাদের হৃদয়ে স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা স্থান পায় না,—স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা তাহাদের হৃদয় হইতে অনেক দূরে সরিয়া যায়; তাহারা জগৎকে আপন বলিয়া ভাবিয়া থাকেন;—“উদারচরিতানাং বস্তুধৈব কুটুম্বকম্।” ‘আমার মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, বন্ধু-বান্ধব, সুহৃদগণ, আত্মীয়-স্বজন ও অপরাপর সকলেই আমার মধ্যে এবং আমিও তাহাদের ভিতরে; আমার পিতা আমাতে—আমি তাহাতে, আমার পুত্র আমাতে—আমি তাহাতে, আমার দৌহিত্র আমাতে—আমি তাহাতে, আমার স্বজাতি আমাতে—আমি তাহাতে এবং অপর,— এমন কি স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীব সমুদয় আমাতে—আমি সেই সকলে,—এইভাবে আমার সমগ্র দেশবাসী আমাতে এবং আমি তাহাদের মধ্যে আছি; ক্রমেই আমার এই আমিহ, নদ-নদী যেমন অনন্ত মহার্ণবের নীলাশ্ব-রাশিতে মিশে, তেমনি প্রসারিত হইয়া বিশ্বজীবনে

[৪র্থ খণ্ড]

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

১১৯

মিশিয়াছে। অতএব, আমার—“বহুধৈব কুটুম্বকম্” আমার জ্ঞান ও
অজ্ঞান, সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্য, ধর্ম ও অধর্ম, কল্যাণ ও
অকল্যাণ কেবল আমার নয়,—এই বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে এ সকল
জড়িত। তটিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার সম্বন্ধ যেমন অনন্ত বারিধির
পর্বত-প্রমাণ যোজন-দূর-বিস্তৃত উন্মিরামির সহিত,—অর্গল-বন্ধ
কুটীরের ক্ষীণ রশ্মি-কণার সম্বন্ধ যেমন সেই বৃহৎ অংশুমালী
জ্যোতিষ্ক-জীন সূর্যের সহিত,—আমার নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সামান্য
বায়ুরামির সহিত যেমন মত্ত প্রভঞ্নের সম্বন্ধ, সেইরূপ আমার সকল
সম্বন্ধ এই বিশ্ব-জগতের সকল স্থাবর-জঙ্গমাঙ্ক প্রাণী বা বস্তুর
সহিত। ঐ যে রাজ-রাজেশ্বর রাজাধিরাজ মর্ম্মর-নির্ম্মিত সুধা-ধবলিত
অভ্রচূড়স্পর্শী সুরমা হর্ম্ম্যাবলী দাস-দাসী সমন্বিত রাজ-প্রাসাদে কনক-
সিংহাসনে দুঃক্ষফেনসম কোমল আন্তরণোপরি সুখে বসিয়া আছেন ;
আর, আমি এই শতছিদ্র জীর্ণ-শীর্ণ পলালাবশেষ তৃণপত্রাচ্ছাদিত
উটজ পর্ণকুটীরে বসিয়া, ভগবানের চিন্তা করিতেছি, উহার প্রাণে
আর আমার প্রাণে ত কোন তফাৎ নাই।’

তাই বলি,—মানুষ ! কেবল তোমার আমার বা পিতা-পুত্রের
নয়,—স্থাবর-জঙ্গমাঙ্ক সর্ববজীবের প্রাণ যে “সূত্রে মনিগণা ইব”
একসূত্রে আঁখিত। বাতায়নের সুর বাঁধা থাকিলে, তাহার একটি যন্ত্রে
সুর যোজনা করিলে, যেমন অপরগুলি আপনা হইতেই বাজিয়া উঠে,
—জলাশয়ে একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, যেমন সমস্ত জলাশয়ের
জল কম্পিত হয়,—আকাশে নিঃশ্বাস ফেলিলে, সমগ্র বায়ুমণ্ডল স্তরে
স্তরে কাঁপিয়া উঠে, তেমনি প্রাণের মধ্য হইতে যাহা বহির্গত ও
নিঃসৃত হয়, তদ্বারা অপর সমস্ত প্রাণ নাচিয়া উঠিবেই উঠিবে।
পুল্লশোকাতুরা জননী যখন গভীর নিশাথে শৃগাল-কুকুর-সমাকুল, কর্ণ-
কুহরবিদারণ-মুখরিত ভীষণ শ্মশান-ভূমিতে প্রজ্জ্বলিত চিতানলে
প্রাণাধিক হৃদয়-রত্ন আনন্দের হৃদয়-গ্রন্থি পুত্রকে বিসর্জন করিয়া, সারা-

১২০

জুগম-সাধন-পদ্মা ।

১৯৩৭

জীবনের আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া, উচ্ছল নয়না-আলুলায়িত-কেশা
 হইয়া নৈরাশ্র-মাথা উৎকট হাহাকারে মস্তকে করাঘাত করিতে করিতে,
 তপ্ত-শোকাশ্রুতে বক্ষাঞ্চল সিক্ত করিয়া, করুণ-কণ্ঠে করুণ-বিলাপে
 ক্রন্দন করিয়া উঠেন, তখন কোন্ পুত্রশোক-বিহ্বলা হতভাগিনী
 আপনার নয়নের অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন? পতি-বিয়েগ-বিধুরা
 সাক্ষী রমণী যখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, আপনার হৃদয়গত
 শোকের অভিব্যঞ্জনা করেন, তখন কোন্ বিধবার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ
 না হয়? প্রেমিক তদগতচিত্ত তন্ময় ভগবন্ত্ত, যখন অতি দীনভাবে
 দীন-শরণ শ্রীহরির শরণাগত হইয়া, আর্তস্বরে অশ্রুপ্লুত নয়নে—“হা
 বিপদভঞ্জন! হা করুণা-জলনিধে!” বলিয়া, উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে
 থাকেন, তখন কোন্ ভক্তের হৃদয় পুলকে নাচিয়া না উঠে, শরীর
 রোমাঞ্চিত না হয়? তাই বলি,—এই অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের
 বাবতীয় প্রাণ—সূত্রে মণিগণা ইব” এক যোগসূত্রে গ্রথিত। অতএব,
 বুঝা গেল যে,—

“কি রাজা কি প্রজা, কি ধনী, কি দীন,

কি দয়ালু, দয়াহীন ;

কিবা বর্ষীয়ান, কিবা শিশুপ্রাণ,

কিবা স্থূল, কিবা ক্ষীণ

কিবা নরনারী, কিবা ক্লীবজাতি,

কিবা মূর্থ, কিবা জ্ঞানী ;

এই পৃথিবীতে সবাই সমান

সবাই একই প্রাণী ॥”

আমার প্রাণের ক্ষুদ্র ভাব-বিভাব, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞান ও
 মোহ, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণরাজ্যকে
 পাইয়া স্পর্শ না করিয়া অথবা তাহা উল্লসিত কিংবা বিকূর্ণ না
 করিয়া, থাকিতে পারে না। চন্দ্রবদন শিশু পুত্রকে অঙ্কে ধারণ

[৪র্থ খণ্ড]

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

১২১

করিয়া, স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ে যে পুলক-প্রবাহ প্রবাহিত হয়, সেই পুলক সমগ্র বিশ্বের বিশ্বজনীন মাতৃহে রোমাঞ্চ উপস্থিত করে ; মাতৃভাব এমন মধুর ! মাতৃভাবেও প্রত্যেক নারীর সহিত বিশ্বের “সূত্রে মণিগণা ইব” মিল আছে । নর-পিশাচ তাহা বুঝিতে পারে না বলিয়াই, রমণী দর্শনে হৃদয়ে কামভাব পোষণ করিয়া থাকে । হা নর-পিশাচ ! রমণীর কমনীয় দেহের রূপ-লাবণ্য দর্শনে তুমি হত-চেতন ও ভোগ-লালসায় বিগতবুদ্ধি ! নারী কি তোমার জননী নয় ? তাহার সহিত মাতৃভাবই তোমার সর্বপ্রথম ও আত্মবিস্মৃতির ভাব নহে কি ? সে পবিত্র-জীবন-ভাবকে কেন বড় করিয়া তুলিতে পার নাই ? এই রমণীকে দর্শন করিয়া, হয় ত অপর এক হৃদয়ে মাতৃ ভাবের উদয়ে শান্তি-ধারা প্রবাহিত হইতেছে ; আর, হৃদয়ে কুভাব পোষণ করিয়া, তাঁহাকে কুদৃষ্টিতে দেখিয়া, আপনি আপনার অধঃপাতের পথ পরিষ্কার করিতেছ ? তুমি তাঁহাকে যেমন ভাবিয়াছ, তিনি তোমার নিকট তেমনি হইয়াছেন । সে দোষ তাঁর, না তোমার ? তোমার মনে কামনা-লালসা-বহি জ্বলিতেছে, সে বহির সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া, তুমি নিজেকে এমনি গঠিত করিয়াছ যে, তদ্ব্যতীত তোমার দ্বিতীয় গতি নাই । অগ্নি দ্বারা জগতের কত উপকার সাধিত হইতেছে ; কিন্তু যদি কোন দুৰ্জ্জন অপরের গৃহদাহের জন্ত সেই অগ্নির প্রয়োগ করে, তবে তজ্জন্ত কি অগ্নি দোষী ? এ তোমার দোষ বস্তুর অপব্যবহারে । অপব্যবহার মানসিক দুর্বলতা-প্রসূত । রমণীর স্কন্ধে সকল দোষের ভার আরোপ করিয়া, শুধু যে দুর্বলতা প্রকাশ করিতেছ, তাহা নহে ; সত্যেরও অপলাপ করিতেছ,—নিজের অক্ষমতায় কর্তব্য-দায়িত্ব অস্বীকার করিতেছ । এখন হৃদয় হইতে কুভাবকে দূরীভূত করিয়া, কুটিলতাকে সরাইয়া দিয়া সরলতাকে বরণ কর ; আর, জগতের সকল নারীতে মাতৃভাব

স্থাপন কর; বুঝিতে পারিয়া, তখন নিজেই বলিবে,—“ত্রিজগৎ যে মায়ের মূর্তি, জেনেও মন, তা জান না?” যে ব্যক্তি আপন মায়ে বা পরের মায়ে ও বিশ্ব-প্রসবিনী জগদমায় প্রভেদ দেখেন না, তিনিই বুঝিতে পারেন, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বাবতীয় নারী মাতৃ-মূর্তি, সকলেই—“সূত্রে মণিগণা ইব” এক সূত্রে গ্রথিত। এই যাঁহার হৃদয়ে মাতৃভাব স্ফুর্তি পায়, তিনি এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট, শোক তাপ-সঙ্কুল, জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, মুক্তি বা অমৃতত্ব লাভ করেন। অতএব, বেশ বুঝা যায় যে, দীন দরিদ্র ভিখারী বুড়ুকার জলন্ত হৃদাশনে দক্ষীভূত হইয়া, যখন ‘হা অন্ন—হা অন্ন’ বলিয়া, আর্ন্তস্বরে গগনবিদারী হাহাকারে চীৎকার করে, তখন সে করুণধ্বনি বিশ্বজনীন করুণধ্বনির মর্মে আঘাত করে। এই ভাবে আমি বা আমরা, তুমি বা তোমরা, প্রতিনিয়ত যাঁহা কিছু ভাবি বা করি না কেন, তাঁহা তৎক্ষণাৎ সমগ্র বিশ্ব-জীবনে যাইয়া প্রতিধ্বনি করে। কারণ সর্বশক্তিমান্ বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ বিরাট-পুরুষ ভগবানের শক্তি এক, সেই শক্তি বিশ্বের সর্ব-পদার্থে ওতঃপ্রোতঃভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন,—

“সমারূপেণ বর্ণেন তেজসা বয়সা দ্বিষা ।

যশসা বাসসা মূর্ত্যা ভূষণে গুণেন চ ॥

স্মিতেন বীক্ষণেনৈব বচসা গমনেন চ ।

মধুরেণ স্বরেনৈব নয়েনানুনয়েন চ ॥”

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ । প্রঃ । ৩৫

‘ঐশা শক্তি রূপে, বর্ণে, তেজে, বয়সে, প্রভায়, যশে, বস্ত্রে, আকারে, ভূষণে, গুণে, হাস্যে, দর্শনে, বাক্যে, গমনে, মধুরস্বরে, নীতিতে এবং অনুনয়ে—ঠিক সমান ভাবে বিদ্যমান। অতএব আমাতে, তোমাতে, তাহাতে সর্বত্রই সেই একই শক্তি বিদ্যমানা;

সুতরাং—‘আমি অত্যুচ্চ প্রাসাদবাসী উপাদেয়-ভোজ্য-পুষ্ট, দুঃ-
ফেননিভ—শয্যাশায়ী অযুতদাসদাসী-পরিবেষ্টিত মহারাজচক্রবর্তী,—
আমার উদরে ক্ষুধা, শরীরে ব্যাধি, অন্তরে শোক উপস্থিত হইলে,
আমি যেমন কাতর হই, ঐ ছিন্ন-বসন-পরিহিত বুভুক্ষিত অন্ধ
ভিখারীও সেইরূপ ক্ষুধায় কাতর, ব্যাধিতে যন্ত্রণাগ্রস্ত ও শোকে
মুহমান হয়,—এই ধারণা যাঁহার আছে, তাঁহার নিকট আমাতে
তোমাতে, তোমাতে আমাতে, আমার পুত্রে, তোমার পুত্রে, আমার
দুঃখে তোমার দুঃখে, আমার সুখে, তোমার সুখে কোন প্রভেদ
নাই। তিনি দেখেন,—

“ একং জ্ঞানং নিত্যমাদ্যন্ত শৃণুং,
নাশুং কিঞ্চিৎ বর্ততে বস্ত সত্যং ।
যন্তেদোহস্মিন্মিত্তিরোপাধিনা বৈ,
জ্ঞানশ্রায়ং ভাষতে নাশুথৈব ॥ ”

শিবসংহিতা ।

“ সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম ; ” আর, জগৎ আনন্দময় । বিশ্বের স্বাবর-
জঙ্গমাত্মক সর্বজীবই এক, দ্বিতীয় কিছুই নাই । আমরা এই সহজ
সত্যটুকু বুঝিয়াও বুঝি না বলিয়া, অহর্নিশ ‘আমার আমার’ করিয়া
পাগল হই ; কিন্তু, যিনি আপনার বা পরের শিশু পুত্রে ও কোটি-
মদন-বিমোহন অশেষ-চিত্তাকর্ষক সহজ-মধুর-তরল-লাবণ্যায়ত-পারা-
বার, মহানুভবগণের অনুভূয়মান শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজমান মদন-
গোপালে প্রভেদ না দেখেন, তিনি অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে,
প্রান্তরে, প্রস্তুরে — অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে, জল-স্থল-
মরুদ্ব্যোম-বিশ্বচরাচরে সর্বত্র, এমন কি,—এই আসমুদ্র-হিমালয়
পৃথিবীর বালুকণাটি, সকল সামগ্রী মাঝেই ভগবচ্ছক্তি বিद्यমান
অনুভব করিয়া, প্রেমানন্দে মাতিয়া, সেই “ একমেবাদ্বিতীয়স্ ”
সর্বেশ্বর সর্বাধার সর্ব-স্বরূপ ভগবানের অনাময় পদে শ্রণত হইয়া

থাকেন । প্রভাতের শিশির-স্নাত নব-দুর্বাদলের উপরে, শ্যাম-কপোলে নির্মল ঘর্ম্মবিন্দুর গায় যে শিশির-বিন্দু ফুটিয়া থাকে, তাহাতে যেমন এই অসীম আকাশের সর্ববনৌলিমা প্রতিবিস্তৃত হয়,—বাতায়ন-উন্মুক্ত প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে অলোক-সামান্য অনিন্দ্য-সুন্দরীর মুখারবিন্দে যেমন সর্বব্যাপী পূর্ণেন্দুর প্রতিবিস্তৃত প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ আমাদের প্রত্যেক জ্ঞান, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যে, আমরা একলা নহি,—এই বিশ্ব-সঙ্কেতটি লুকাইয়া রহিয়াছে । সুতরাং,—‘আমি ও আমার আমার’ বলিয়া যতই কেন আমরা আপনাকে বিশ্ব-সম্বন্ধ হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন রাখিবার চেষ্টা করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে ততই উর্গনাভের জালের গায় আমরা তাহাতে আরও বিজড়িত হইয়া পড়িতেছি । বস্তুত এ সংসারে সবাই যখন ভগবানের অংশ,—সবাই যখন এক,—সবাই যখন বড়,—সবাই যখন অনন্ত,—সবাই যখন অমৃতের পুত্র, তখন কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে । এই মহাসত্য আমরা বুঝি না বলিয়াই ত — ‘তুমি ছোট, আমি বড় ;’ ‘তুমি অস্পৃশ্য, আমি পবিত্র ;’ ‘তুমি দরিদ্র, আমি ধনী ;’ ‘তুমি অপকৃষ্ট, আমি উৎকৃষ্ট ;’—এই অহমিকার অন্ধকারে ডুবিয়া থাকি । এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, নবদ্বীপচন্দ্র প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব । তিনি ‘জীবে দয়া — নামে রুচি’ একত্বের উপাসনা করিয়া, পরকে আপন জন বলিয়া কোলে টানিয়া লইতেন,—পতিতকে অবজ্ঞার চক্ষে না দেখিয়া, তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্ত হস্ত প্রসারণ করিতেন,—ভেদজ্ঞানের তুমুল-তুফানকে উপেক্ষা করতঃ আপনার লোক বলিয়া,—বন্ধু বলিয়া,—স্বজন বলিয়া গ্রহণ করিতেন,—তাঁহার নিকট পণ্ডিত-মুখ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, সকলেই সমান আদর পাইত । তাই তিনি দুই বাছ মেলিয়া, আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণকে হরিনাম বিলাইয়াছিলেন । এ সত্য জানি না বলিয়াই ত—‘এ আমার আপন, ও আমার পর, এ আমার মিত্র, ও আমার শত্রু’ এই ধারণা হৃদয়ে

[৪র্থ খণ্ড]

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

২২৫

পোষণ করিয়া, অহোরাত্র সংসার দাবানলে দগ্ধ হইতেছি । যখন আমার সকলেই এবং আমি সকলের এই জ্ঞান হৃদয়ে উদ্ভিত হয়, তখন আমার সকল অহঙ্কার, সকল প্রভুত্ব জল-বুদ্বদের ন্যায় কোথায় মিলিয়া যায় । গরুড় পুরাণে উক্ত আছে যে,—

অহমিত্যঙ্কুরোৎপত্তৌ মমোতি স্কন্ধবান্ মহান্ ।

গৃহক্ষেত্রোপশাখাশ্চ পুত্রদারাদি পল্লবঃ ॥

ধনধান্য মহাপত্রোহনেক কালৈর্হি বর্দ্ধিতঃ ।

পুণ্যাপুণ্যসপুষ্পশ্চ

সুখদুঃখমহাফলঃ ॥

গরুড়পুরাণ । পূর্ব্ব । ২৩০

প্রথমতঃ অহঙ্কার-রূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া, এই বস্তু—আমার, ইত্যাকার জ্ঞান-স্বরূপ মহান্ স্কন্ধ জন্মে । উক্ত জ্ঞানদ্বয়ই অজ্ঞান-বৃক্ষের অঙ্কুর ও স্কন্ধ । ঐ বৃক্ষের গৃহক্ষেত্রাদি শাখা দারা-পুত্র প্রভৃতি পল্লব, ধন-ধান্যাদি পত্র; উহা সুদীর্ঘকালে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । পাপ-পুণ্য তাহার পুষ্প-স্বরূপ; সুখ-দুঃখই সেই মহাতরুর মহাফল-স্বরূপ । সংসার-পথে পরিশ্রান্ত হইয়া, সুখ-শান্তি-কামনায় যাহারা এই তরুর ছায়া আশ্রয় পূর্ব্বক ভ্রান্তিজন্যে আকুল হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকে, প্রকৃত সুখ-শান্তির অনুসন্ধান করে না; সেই সকল মুগ্ধ মানবগণের সেই ভ্রান্তি-সম্ভূত ক্লগিক সুখ-শান্তি ব্যতীত আত্যন্তিক সুখ-শান্তির সম্ভাবনা কোথায়?—কিন্তু, যাহারা বিচাররূপ কুঠার দ্বারা উক্ত বৃক্ষকে ছেদন করিতে পারেন, তাঁহারাই এই ভীম-ভবান্বিত পার হইয়া, সেই প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়া, নির্মূল ব্রহ্মরস পান করিতে থাকেন । প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উক্তরূপ ব্রহ্মরস পান করিয়াই পরম নিরুত্তি লাভ করেন, অথ কোন বিষয়ে তাঁহাদের তখন স্পৃহা থাকে না; তখন এই মূর্ত্তিমান্ ইন্দ্রিয় সকল বিলীন হয় ।

মানুষ ভ্রমের দাস, সংসারের দাস, কামিনী-কাঞ্চনের দাস,

তাহাদের আবার, জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসার হইতে উদ্ধার পাইবার বুদ্ধি কোথায় ? তাহারা ত সেই সংসার-নাথের—জগন্নাথের—সুধাসিন্ধু তারকত্রঙ্গ নামে রতি না করিয়া, সংসারে, কামিনী-কাঞ্চনে রতি করিয়া, সংসার-পথে চলিতেছে, তাহারা জগন্নাথের নিকট অপরাধী। বাস্তবিক, তাহারা কামের ও মোহের কিস্কর হইয়া, মনের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া পড়িয়াছে,—মনের উপর তাহাদের প্রভুত্ব নাই, মনের তাহারা ভৃত্য হইয়াছে,—তাহারা মনের হইয়াছে,—মন তাহাদের নহে,—তাহারা মনের আজ্ঞাবহ ভৃত্য, কিস্কর, দাস। দাসের ভাগ্যে সুখ কোথায় ? দাস প্রভুত্ব-জনিত সুখে চির-বঞ্চিত। ক্রৌতদাসের মত বিষয়াকর্ষণ যেদিকে লইয়া ষাইতেছে, সেই দিকেই তাহারা ধাবিত হইতেছে। বিলাসিনীর বিলাস-ভোগে মজিয়া, ভগবানকে ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া, কামিনীর ক্রোড়া-মৃগ হইয়া, — “লগ্নেহং কুত্র দর্ভং স্মরণমনুদিনং চিন্তয়া ব্যাকুলাত্মা” হইয়া, সংসার-চিন্তায় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। পরম ভাগবত দৈত্য-কুল-সূর্য্য প্রহ্লাদ বয়স্মগগকে কহিতেছেন,—

“রায়ঃ কলত্রং পশবঃ স্তূতাদয়ো—

গৃহা মহৌ কুঞ্জর কোশভূতয়ঃ ।

সর্ব্বেহথ কামাঃ ক্ষণভঙ্গুরায়ুষঃ,

কুর্ব্বন্তি মর্ত্তস্য কিয়ৎ প্রিয়ং চলাঃ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবত । ৭। ৭

হে অশ্বর বালকগণ ! অধোক্ষজের আশ্রয় গ্রহণই ইহ-সংসারে মলিনাশয় শরীরীর সংসার-চক্রচ্ছেদক এবং তাহাই মোক্ষ-সুখ বলিয়া পণ্ডিতগণ অবগত আছেন ; অতএব তোমরা হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্ধামী ঈশ্বরের ভজনা কর। স্ব স্ব হৃদয়ে আকাশবৎ অবস্থিত স্বীয় আত্মার সখা ভগবান্ শ্রীহরির উপাসনাতে বিশেষ প্রয়াস কি আছে ? পক্ষা-স্তরে সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণ বিষয়ার্জ্জনে ফল কি ? ধন-সম্পত্তি, কলত্র,

[৪র্থ খণ্ড]

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

১২৭

পশু, পুত্রাদি, গৃহ, ভূমি, হস্তী, ধনাগার, ঐশ্বর্য, অর্থ এবং কাম,—
এ সমস্তই নশ্বর ; এতদ্বারা অস্থির-জীবন মানবের কতটুকু প্রীতি
সাধন হয় ? এইরূপ যজ্ঞলব্ধ, অস্থায়ী এবং পরস্পর তারতম্য-সম্পন্ন
এই সমস্ত স্বর্গাদি লোকও নির্মল নহে ! কেন না, যাবৎ পুণ্য থাকে,
তাবৎ স্বর্গ-সুখ ভোগ হইয়া থাকে, পুণ্য ক্ষীণ হইলে, পুনরায় মর্ত্য-
লোকে ফিরিয়া আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় । অতএব, বাহার দোষ
শ্রুত বা দৃষ্ট হয় না, আত্মলাভার্থ যথোক্ত ভক্তি-সহকারে সেই
পরমেশ্বরকে ভজনা কর । হে বয়স্য সকল ! পণ্ডিতমানী ব্যক্তি ইহ-
সংসারে যে জন্ম বারংবার কৰ্ম্ম করে, তাহা হইতে অব্যর্থ বিপরীত
ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এ সংসারে ক্রিয়াবান্ মানবগণের সুখলাভ
অথবা দুঃখ মোচনই সম্ভব থাকে ; কিন্তু, সে যখন কৰ্ম্ম করে নাই,
তখন কৰ্ম্ম করা অপেক্ষা সুখী ছিল,—কৰ্ম্ম করায় সর্বদা দুঃখ পায়।
এ সংসারে পুরুষ বাহার জন্ম কাম্য কৰ্ম্ম দ্বারা ভোগ কামনা করে,
সেই দেহও পরিণামে শ্মশান-প্রান্তরে শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য-বিশেষ
অথবা শ্মশান-ক্ষেত্রের ভস্মস্তূপ এবং ক্ষণভঙ্গুর ; — কখন যায়, কখন
আইসে । এই হিম-বিন্দুর ন্যায় অচিরস্থায়ী সুখ-দুঃখের ভোগায়তন
দেহ হইতে দূর-সম্বন্ধ মমতাস্পদ অপত্য, মমতাময়ী কলত্র, মৰ্ম্মর-
নির্মিত সুখ-ধবলিত আকাশভেদী সুরমা হৰ্ম্যাবলী, অগণিত ধন-
সম্পত্তি, সুবিশাল রাজ্য, যাবদর্থ-সম্পদের কোষাগার, হস্তী, আজ্ঞা-
বহ অমাত্য, বশীভূত ভৃত্য, বিশ্বস্ত ব্যক্তি,—ইত্যাদির ত কথাই নাই ।
ইহারাও অন্ধকার জলদ-জালে সৌদামিনী সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর দেহের সহিত
নশ্বর এবং নশ্বরবৎ প্রতীয়মান এ সকলি অতি তুচ্ছ । এ সকলের
দ্বারা নিত্যানন্দ-রস-জলধির কি হইতে পারে ? অতএব, অর্থ কাম ও
ধৰ্ম্ম বাহার অধীন, তোমরা নিকাম হইয়া, সেই নিরীহ-আত্ম ঈশ্বর
ভগবান্ শ্রীহরিকে ভজনা কর । ভগবান্ শ্রীহরি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক
সকলের অন্তর্ধ্যামী ;—স্বর, অস্বর, মনুষ্য, যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব,—

যেই কেন হউক না, মুকুন্দ-চরণ ভজনা করিলে, সকলেই আমার
 জায় মঙ্গল লাভ করিতে পারে । হে অম্বর-তনয়গণ ! দ্বিজস্ব, দেবস্ব,
 ঋষি, চরিত্র বহুজ্ঞতা, দান, তপস্বী, যজ্ঞ, শৌচ এবং ব্রত, —এ
 সকলের কোনটিই ভগবান মুকুন্দের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ নহে ;
 নির্মল ভক্তি দ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হন । অতএব, তোমরা
 সকলেই আত্মবৎ বোধ করতঃ স্থাবর-জঙ্গম সর্ববভূতের আত্মা—ঈশ্বর
 ভগবান্ শ্রীহরিতেই ভক্তি কর ।’

তাই বলি, সংসারাসক্ত মানব ! তুমি একবার ভাবিয়া দেখ দেখি,
 —কিণ্ড আত্মাকে শাস্ত করিয়া, ঘড়িরপু সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের
 পথ রুদ্ধ করিয়া, আড়ম্বরের মিথ্যা ভাণ ছাড়িয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া
 একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, ঐ বহুদূর-বিস্তৃত অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে
 ঐ যে চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান ধর্ম্মের আলোক-স্তম্ভ—উহারই প্রতি
 লক্ষ্য করিয়া, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, — তুমি এই জগতে কি
 নিমিত্ত আসিয়াছ ? —এই বিরাট-বপু সুবিশাল বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে কি জন্ম
 অবতীর্ণ হইয়াছ ? আপন উদ্দেশ্য ভুলিয়া, তোমরা সকলে নিঃশঙ্কভাবে
 কি করিতেছ ? কেন অসার আয়ুর উন্মত্ততায় যৌবন-বিজৃম্বিত মোহের
 বশে মদন-বাণে পরিহত হইয়া, কামিনীদিগের সহিত আমোদ-
 প্রমোদে সর্বদা ব্যাপ্ত আছ ? যে জন্ম ভবে আসিয়াছ, — যে জন্ম
 ভবে আসিয়া মানব-দেহ ধারণ করিয়াছ, সেই পরকালের পন্থা কিছুই
 ত দেখিতেছ না ! পরকালের কি উপায় করিলে ? এই মহান্ মানব-
 জীবন লাভ করিয়া, এই ছলভ মানব-দেহ ধরিয়া, সংসার-রঙ্গমঞ্চে
 কেবলই যে তোমার সং সাজাই সার হইবে, প্রথম হইতে অভিনয়
 করিতে করিতেই যে অসার আয়ু ফুরাইয়া যাইবে, দিনে দিনে দিন
 যে ঘনাইয়া আসিবে, পরকাল যে কাছাকাছি হইয়া পড়িবে, প্রতি-
 ক্ষণেই যে পরমাযু ক্ষয় পাইতেছে, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না ?
 তুমি সংসার-রঙ্গমঞ্চে অবতীহইর্গ বার পরদিন হইতেই অভিনয় আরম্ভ

করিয়া, ক্রমান্বয়ে—বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় প্রভৃতি অভিনয়
অতিবাহিত করিয়া, শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া, পরে এই সকল দশার পট-
পরিবর্তন করিয়া, শেষপ্রান্তে যে বার্কিক্যে উপনীত হইয়া বার্কিক্য অভিনয়
করিতে হইবে, সে কথা কি একবার ভাবিয়াছ ? সে পট অতি ভীষণ !
কবিকুলতিলক রাজকুলমুকুটালঙ্কার-হীরক ভর্তৃহরি কহিয়াছেন,—

“ক্ষণং বালো ভূত্বা ক্ষণমপি যুবা কামরসিকঃ,

ক্ষণং বিত্তেহীনঃ ক্ষণমপি চ সম্পূর্ণবিভবঃ ।

জরাজীর্ণৈর্দৈন্যে নট ইব বলীমণ্ডিত তনুঃ,

নরঃ সংসারান্তে বিগতি যমধানী যবনিকাম্ ॥”

ভর্তৃহরি শতক ।

‘অনাদি অনন্ত দুঃখবহুল সংসারাগত মনুষ্য, স্বভাবতঃ সুখপ্রিয়তা
নিবন্ধন সংসার-বিত্তের আপাত মাধুর্যা দেখিয়া, আত্মহার্য হইয়া,
মরীচিকা-দর্শনে তৃষ্ণার্তের মত সুখ-মরীচিকাময় সংসারে আকৃষ্ট-চিহ্ন
হইয়া, সংসার রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করিয়া, নট-নটীর ন্যায় নানারূপ অভিনয়
করিতে থাকে । কখন বালক সাজিয়া, বাল্য ক্রীড়ায় রত হইয়া,
অহর্নিশ বাল্যক্রীড়া করিয়া বেড়ায় ; কখন যুবক সাজিয়া, অসার আয়ুর
উন্নততায় যৌবন-বিজৃম্বিত মোহের বশে,—সংসার প্রহেলিকায় বিভোর
হইয়া, প্রণয়োন্মাদের সযত্ন-রচিত প্রমোদ-কাননে—নিরুপম নিকুঞ্জবনে
শীতল-মুহূল-মধুর নৈশ-সমীরণোৎথাপিভ সুধাকর সুধাময় কিরণ-শোভিত,
ভরঙ্গমালা মনোরম বিশ্বাভিরাম রমণীকেশ-বৃন্দ-সদৃশ-কমনীয়-মধুকরশ্রেণী
সমলঙ্কৃত, কমল-কুমুদ-শোভিত-সরোবর-তীরে, আমোদাগারে—প্রমোদ
ভানে, রূপময়ী নৌদর্য্যময়ী আকর্ষণশালিনী যুবতীর সহিত আমোদ-
প্রমোদে ব্যাপ্ত হইয়া, যুবক-হৃদয়-লক্ষ্মী-কামিনী-নূপুর-রব-মিশ্রিত
বীণা-বেণু-সারঙ্গ-সপ্তস্বরার সমবেত সুস্বর-লহরী—স্তবকে স্তবকে স্তূপে
স্তূপে কর্ণ-কুহরে ঢালিয়া, কমনীয় কান্তি কোমল কণক-কলেবরা

কামিনীর কোমল-কঠোচ্চারিত বিহগ-বীণা-বিনিন্দিত সুখা-স্বর-তরঙ্গ শ্রবণে অনুরক্ত হইয়া, যৌবনের মাধুর্য্যে বিলাসিনীর বিলাসে অমূল্য আয়ু ক্ষয় করিয়া, সূঠাম সুন্দর সুস্থ সবল দেহকে রোগাকীর্ণ করিয়া, আধি-ব্যাধির নিৰ্ম্মম কশাঘাতে ক্লিষ্ট এবং মথিত হইয়া, ব্যাধির দংশনে কাতর হইয়া,—“জীবনের আশা ছাড়ি, মৃত্যু করে কামনা ।” আবার, কখন প্রোঢ় সাজিয়া, সুখ সমৃদ্ধির তুঙ্গ-সীমায় উন্নীত হইয়া, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে হৃদয় আপ্ত করিয়া, মায়া-মমতা, আশা-ভরসা, শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্তই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া, উন্নত মস্তক পরমেশ্বরের পরম পদে নমিত করে । এই রূপে, মানুষ কখন রাজ-রাজেশ্বর মহারাজ-চক্রবর্তী সাজিয়া, মৰ্ম্মর-নিৰ্ম্মিত সুখা-ধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হৰ্ম্ম্যাবলীতে পুত্র-পরিজন-আত্মীয়-স্বজন অযুত দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া, অতুল ঐশ্বর্য্যে কোষাগার পরিপূরিত করিয়া, হাতী-ঘোড়া আস্তাবলে বাঁধিয়া, আশ্রাবহ ভৃত্য ও বশীভূত অমাত্যগণ সহ—“আরবীয় বেগগতি ঘোড়া ঘোড়া যুড়ে, হাঁকায় চ্যারেট বগী কেহ যায় উড়ে ।” আবার কখন মানুষ, মৰ্ম্মর-নিৰ্ম্মিত সুখা-ধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হৰ্ম্ম্যাবলী পরিত্যক্ত ও যথাসৰ্ব্বস্ব লুপ্তিত হইয়া, প্রিয়তমা প্রণয়িনীর বিরাগ-ভাজন হইয়া, প্রাণাধিক পুত্র-কন্যা,—স্নিগ্ধ বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন হারাতিয়া, দুর্ভাবনা-হুচিন্তার ছুরিকাঘাতে, অভাব অনটনের তীব্র তাড়নায়, অষ্টপ্রহর রুধিরাক্ত হইয়া, দুঃখ-দৈন্যের নিৰ্ম্মম কশাঘাতে ক্লিষ্ট এবং মথিত হইয়া, মমতাময়ীদের নিৰ্ম্মমতায় ভগ্নহৃদয় হইয়া, পথের ভিখারী হইয়া,—“কত বা যুটে না অন্ত কতু অর্দ্ধাশন, চির পরিধান এক মলিন বসন” লইয়া,—‘হা পরমেশ্বর ! ক্ষুধায় প্রাণ যায়’ বলিয়া হাহাকার করিয়া, একমুষ্টি আন্নের জন্য ধনীর দ্বারদেশে বসিয়া রোদন করে । এইরূপে, মানুষ কখন অযুত দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত অত্যাচ্ছ রাজ-প্রাসাদে দুঃক্ষেণ-

নিভ স্তূথের শয্যায় শায়িত হইয়া, উপাদেয় ভোজ্যপুষ্ট এবং প্রভূত ধন-সম্পদ লাভে আনন্দিত হইয়া, প্রচুর ধন ব্যয়ে ফল-ফুলের বাগান বসাইয়া, এক ঘোড়া, দুই ঘোড়া, চারি ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া, গায়ে ফু দিয়া, হাওয়া খাইয়া বেড়াইয়া থাকে ; কখন বা দরিদ্রের শতছিদ্র জীর্ণ-শীর্ণ পলালাবশেষ পর্ণকুটিরে, দারিদ্র্যের দুঃখ-দাবদাহে দগ্ধীভূত হইয়া, ছিন্ন কস্থার অভাবেও ধূলি-শয্যায় শয়ন এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া, অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বরের চরণ-প্রান্তে লুটাইয়া গড়াগড়ি যায় । এইরূপে, মানুষ কখন ধনী সাজিয়া, ক্ষীর-সর-নবনী ভক্ষণে উদর শীতল করে, কখন বা একমুষ্টি অন্নের জন্য ধনীর চরণ-প্রান্তে লুটাইয়া গড়াগড়ি যায় । কখন প্রতি নিঃশ্বাস-পাতে কাঁদে, কখন হাসে ; কখন প্রাণাধিক পুত্র-কন্যা হারায়, কখন লাভ করে ; কখন পুত্র-কন্যার পরিণয়ে মহোৎসব করে, কখন তাহাদের অদর্শনে আর্তনাদে হাহাকার রব করে ; কখন বন্ধু-বান্ধবের সহিত আমোদ-আহ্লাদে সদা কাল যাপন করে, কখন তাহাদের অদর্শনে শোকে সন্তাপিত মন হয় ; কখন প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের আশ্বরে কর্ণ-কুহর শীতল করে, কখন তাহার মৃত শরীরে শোকাশ্রু বর্ষণ করে । কখন সুস্থ শরীর, কখন বা রোগে অস্থির ; কখন পুত্র-পরিজন-স্বাক্ষীয়-স্বজন বিয়োগে আকাশ-বিদীর্ণ করিয়া কাঁদে, কখন বা তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া হাসিয়া থাকে, — এইরূপে সংসার-রঙ্গক্ষেত্রে মানুষ ভূমিষ্ঠ হইবার দিবস হইতে নানারূপ দৃশ্যপট পরিবর্তন করিয়া, নানাবিধ অভিনয় করিতে থাকে । এইরূপে অভিনয়ে মাতিয়া, মানুষ ক্রমাগত একটির পর একটি পট পরিবর্তন করিতে করিতে, — বালা, কোমার, কৈশোর, যুবা ও প্রৌঢ় পট পরিবর্তন করিয়া, বার্কাক্য পটে উপনীত হয় এবং জরা-রাক্ষসীর করাল কবলে নিপতিত হইয়া, জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার শরীরে সং সাজিয়া, মমতাময়ীদের নির্মমতায় ভগ্ন-হৃদয় হইয়া, মর্ন্মবাতী অভিমানে জর্জরিত হইয়া, মর্ন্মস্তদ

অশ্রু-প্রবাহে বিশাল বক্ষ ভাসাইয়া,—“অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দন্ত-
বিহীনং জাতং তুণ্ডম্” হইয়া, দণ্ড ধারণ করিয়া, অতিকষ্টে গমন করিতে
করিতে, সংসার-রঙ্গমঞ্চে জীবনাবসান-রূপ দৃশ্যের শেষ যবনিকায়
দাঁড়াইয়া পশ্চাত্তাপ করিয়া, “শোকাগ্নিনা দহ্যমান” হইয়া কহিয়া থাকে,
—“যাবদ্বিত্তোপার্জনম্ সত্ত্ব স্তাবন্নিজপরিবারোরক্তঃ । তদনু চ জরয়া
জর্জর দেহে, বার্তাং কোহপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥” ‘হে ভগবন্তজন-বহির্মুখ
সংসারাসক্ত মানব ! তুমি যাবৎ ধনোপার্জনে সমর্থ হইবে, তাবৎ কাল
কি পুত্র, কি কলত্র সকলেই অনুরক্ত থাকিবে; কিন্তু, যখন তুমি আমার
মত বৃদ্ধাবস্থায় জরা দ্বারা জর্জরিত হইবে, তখন আর কেহই তোমার
প্রতি ফিরিয়াও চাহিবে না—এমন কি, আর কেহ জিজ্ঞাসাও করিবে না।
অতএব,—“মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশান্তুবিদিত্বা” এই
নিখিল বিশ্ব মায়াময় জানিয়া, ইহাতে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক ভব-
পারাবারের কাণ্ডারী ভগবান্ শ্রীহরির অনাময় পদে শরণ গ্রহণ কর;
নিরাময় হইতে পারিবে। অতএব,—“ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ
গোবিন্দং মুঢ়মতে । প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃৎকরণে”
সংসারে রতি পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানে রতি মতি নতি কর, “মৃত্যু-
সংসারসাগরাৎ” উদ্ধার হইতে পারিবে।’ সংসারাসক্ত মোহাক্ষ মানব
সকলকে এইরূপে সংসারে রতি পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানে রতি স্থাপন
করিতে উপদেশ দিয়া, সংসার যে অনিত্য এবং সংসারের পুত্র-কলত্র
যে স্বার্থপর ও কেহ কাহারও নয়, তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে আপন দৃষ্টান্ত
দেখাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, চক্ষুজলে বক্ষ ভিজাইয়া, সংসার-রঙ্গভৌমিক
অভিনয়-রঙ্গলীলা পরিসমাপ্ত করিয়া, জীবন-নাট্যের যবনিকা-প্রাপ্তে
অন্তর্জলীর পূতকোড়ে শায়িত হইয়া, শমন-ভবন-রূপ শেষ যবনিকা-
ভ্যস্তরে প্রবেশ করে,—তাহার যবনিকা পতন হয়; অমনি সঙ্গে সঙ্গেই
দূরন্ত কৃতান্তের দূতগণ আসিয়া, তাহার হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া, অতি

[৪র্থ খণ্ড]

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৩৩

দুর্গম পথে লইয়া যায় এবং রোষাঘ্রিত হইয়া, বিক্ষারিত-নয়নে দন্ত
কড়মড়ি করিতে করিতে, আশ্বালনে कहিয়া থাকে—

“জানাসি সম্বলমলং বলমধ্বগানাং,

নোহিসম্বল প্রযততে পরলোকগতৌ ।

গন্তব্যমস্তি তব নিশ্চিতমেব তেন

মার্গেণ যেন ন ভবেৎ ক্রয়বিক্রয়োহপি ॥”

গরুড়পুরাণ । উত্তর ৬।

“হে পরলোক-পথিক ! তুমি জ্ঞান না কি ? পথে গমন করিতে হইলে,
সঙ্গের সম্বল আবশ্যিক ; কিন্তু, দেখিতেছি, তোমার সঙ্গে কিছুমাত্র
সম্বল নাই। অথচ, তোমাকে সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গল ভেদ করিয়া, অতি
দুর্গম পথে গমন করিতে হইবে,—যে পথে ক্রয়-বিক্রয় হয়, এমন স্থান
নাই,—পাথেয় সংগ্রহ করা যায়, এমন উপায়ও নাই। সুতরাং
তুমি সে পথে কিরূপে গমন করিবে ?” এই বলিয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন
করিয়া, আবার বলে,—‘ঐ দেখ ! যাহারা পথের সম্বল সংগ্রহ করিয়াছে,
তাহারা সুখে সেই পথে যাইতেছে ; কিন্তু, তুমি পামর ! কখন
ক্ষুধার্তের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি কর নাই, বিপন্নের আপহৃদ্বারের চেষ্টা পাও
নাই। তুমি সতত আত্ম-সুখে নিরত হইয়া, নয়ন-মুগ্ধ কামিনীর সুবর্ণ
মূর্তি পূজা করিয়াছ, কখন ভগবানের পূজা কর নাই ; তুমি সতত
আত্ম-চিন্তায় বিভোর হইয়া, যুবতীর চিন্তায় জীবন যাপন করিয়াছ,
কখন ভগবচ্চিন্তা কর নাই। তুমি ভগবৎ-প্রেম ছাড়িয়া, যুবতীর প্রেমে
বিভোর হইয়া, আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাইয়াছ ; এখন তাহার ফল
ভোগ কর। তুমি অলীক আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া, প্রাণপাত করিয়াছ,
ঐহিক সুখের মোহিনী মূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছ ; কিন্তু, কখনও
পারত্রিক সুখের নিমিত্ত কোনও দিন কিছুই কর নাই ; সুতরাং এখন
তাহার ফল ভোগ কর।’ এই বলিয়া, দ্রুত দূতগণ মুদগর-মুষ্টি গ্রহণ

করিতে করিতে, হাত পা বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যায়,—তখন সে রোদন করিতে করিতে বলে,—

“ন জ্ঞানমার্গো ন চ যোগমার্গো—

ন কর্মমার্গো ন চ ভক্তিমার্গঃ ।

ন সাধুসঙ্গাৎ কিমপি শ্রুতং ময়া,

শরীর-হে নিস্তর যত্নরা কৃতম্ ॥”

গরুড় পুরাণ । উত্তর । ৬

‘আমি জ্ঞানমার্গ’ অবলম্বন করিয়া, জ্ঞানিগণের সেবা দ্বারা জ্ঞানার্জনও করি নাই অথবা যোগমার্গ’ অবলম্বন করিয়া, যোগিজনের সেবা দ্বারা যোগাভ্যাসপূর্বক ক্ষিপ্ত আত্মাকে শাস্ত করিয়া, ষড়রিপু সংযত করিয়া ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিন্ত হইয়া, স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে জ্যোতির্ময় ভগবানের কমনীয় মূর্তির ধ্যান করিয়া, সমাধিস্থ হই নাই ; কিংবা কর্ম-মার্গ’ অবলম্বন পূর্বক যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি নিকাম কর্মানুষ্ঠান করিয়া, ভগবানের পূজা-অর্চনাও করি নাই ; কিংবা ভক্তি-মার্গ’ অবলম্বন করিয়া, ভগবন্তের সেবা দ্বারা ভগবন্তক্তি শিক্ষা লাভ করিয়া, ভক্তিপ্রিয় ভগবানের উপাসনাও করি নাই ; কিংবা পতিত-পাবন সাধু-মহাজনের সঙ্গ করিয়া, তাঁহার সেবায় নিরত রহিয়া, ভগবন্তের কোন কিছুই শ্রবণ করি নাই । হে শরীর ! তুমি সংসারে থাকিয়া, এই সকল শ্রেয়োলাভের উপায় ভুলিয়া, যাহা করিয়াছ, অধুনা তাহা নিস্তীর্ণ হও ।’ এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে, ইতস্ততঃ চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, চতুর্দিক্ শূন্য দেখিয়া, পুনরায় আর্তস্বরে কহিয়া থাকে ;—“হা মাত হীপিতভ্রাতঃ স্মৃত হা হা মম জিয়ঃ । যুস্মাভি নোঁপদিষ্টোহহমবস্থাং প্রাপ্ত দৈদৃশম্ ॥” ‘হে মাতঃ ! হা পিতঃ ! হা ভ্রাতঃ ! হা পুত্রগণ ! হা পত্নি ! আমি যে এরূপ দুঃস্বস্থায় পতিত হইয়াছি, তোমরা তাহা

[৪র্থ খণ্ড]

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

১৩৫

জানিতেছে না ?' তাহার এই প্রকার বিলাপ শ্রবণে যমদূতগণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলে,—‘মূর্থ ! তোর পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও বান্ধব এখানে কোথায় ? নিজ কন্মোপার্জিত ফল ভোগ কর । চল্ বিলম্ব করিস্ না ।’ এই বলিয়া, আবার মুদগর ও মুষ্টি প্রহার করিতে থাকে । অতএব, যাহারা সংসারে আসিয়া, সংসারে মজিয়া, কেবল সংসারবিন্দু পিতা-মাতা প্রভৃতিতে রতি করিয়া, পারলৌকিক চিন্তা করে না, ভগবানে রতি মতি স্থাপন করে না, তাহাদিগকে অন্তিমে এইরূপই যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়;—ইহা নিশ্চিত । যে সকল পরলোক-পথিকের পুণ্য আছে, তাহারাই সে পথে সুখে যাইতে পারে; যাহার সে সম্বল নাই, তাহারা অতিশয় কষ্ট পায় । তাহার সে পথে যাইতে যাইতে যমদূতগণের শূলাগ্রে বিক্ষত-গাত্র হইয়া, এইরূপ বিলাপ করিতে থাকে,—‘হায় ! কোথায় যাই, কি করি ! প্রাণও ত যাইতেছে না ! হায় ! মৃতের আবার মরণ নাই !’ ধৃত-যাতনা-দেহ সেই-জীব এইরূপ করিতে করিতে, বিচিত্র নগরে যাইয়া উপস্থিত হয় । অতএব জানা গেল যে, এ সংসারের কোন পদার্থও পরলোকে সহায়ক নহে ; সুতরাং—“সর্বং মিথ্যা মরণ সময়ে ধর্ম একঃ সহায়ঃ ।” বাস্তবিক,—

ধনানি ভূমৌ পশবচ্চ গোষ্ঠে,

ভার্য্যা গৃহদ্বারি জনঃ শ্মশানে ।

দেহশ্চিভায়াং পরলোকমার্গে,

কর্মানুগো গচ্ছতি জীব একঃ ॥

সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার ।

প্রাণাস্তিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া মানুষ যে ধন উপার্জন করে, সেই অগণিত ধন-সম্পত্তি মরণকালে সঙ্গে যায় না, মরণান্তে সেই ধন-সম্পত্তি উত্তরাধিকারীরা বিভাগ করিয়া লয়; অতএব, যে মৃত ধন-লালসায় ভ্রূক্ষ্ম করে, তাহার চিত্ত দূষিত হইয়া থাকে, ইহাই তাহার

পুরস্কার । কেন না, অগণিত ধন-সম্পত্তিকে ভূতলে, অসংখ্য পশুসকলকে গোষ্ঠে এবং প্রাণসম প্রিয়তমা পত্নী ও পুত্র-ধরিজন—আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে শৃগাল-কুকুর-সমাকুল ভীষণ শ্মশান-ভূমিতে পরিত্যাগ করিয়া, —যে সুঠাম-সুন্দর দেহের মায়ায় মোহিত হইয়া, যে দেহে পুনঃ পুনঃ গন্ধানুলেপন জন্ত ব্যাকুল হইত, যে দেহের আজ এত রমণীয়তা, সেই দেহকেই শ্মশান-ক্ষেত্রে প্রজ্জ্বলিত চিত্তানলে আহুতি প্রদান করিয়া, স্বনির্মিত আদরের সুন্দর অট্টালিকা ও সমস্ত-রচিত সুরম্য ভড়াগ প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্বক কৰ্ম্মের অনুগামী হইয়া, জীব একাকী পরলোক-মার্গে গমন করে । অতএব,—

ভো মানবাঃ শৃণত মদ্বচনং সমস্তাঃ,

মৰ্ত্ত্যে সুধাস্তি শুলভা ন তু সা ভবন্তিঃ ।

কুর্নাস্তত্র ভবতামুপকারকারী,

নামামৃতং, পিবত তৎ পরমাদরেণ ॥

হে সংসার-তাপে মুহমান মানব সকল ! তোমরা সময় থাকিতে সাবধান হও,—সতর্ক হও,—“উত্তীর্ণত জাগ্রত” অলস শয্যায় শয়ন করি কেন বৃথা আয়ুঃক্ষয় করিতেছ ? এক্ষণে অলস-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হও । তোমাদের পরলোকোপকারকারী শ্রুতি-রঞ্জন শ্রবন-ভূষণ প্রকৃত কথা বলি শ্রবণ কর, এই সংসার-শ্মশানে—মাটির মর্ত্যভূমে,—নরাবাস ধরাধামেই সুখা বিद्यমান আছে, তাহা সকলেরই পক্ষে শুলভ কিন্তু তোমরা এমন দুর্ভাগা যে, তোমাদের ভাগ্যে তাহা পাইতেছে না । তোমাদিগকে পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন,—সুখার দর্শন, স্পর্শন, অশন দুর্ভাগ্য ছরদৃষ্ট-সাপেক্ষ; পুণাপুঞ্জ সঞ্চয় করিতে না পারিলে,—কঠিন-কঠোর-রূপে আত্মলীন হইতে না পারিলে বা পূর্ণ-পবিত্র আত্মজ্ঞান না জন্মিলে, অমৃত সন্নির্কষ সুদুর্লভ এবং তাহাতে অনেক ধ্যান-ধারণা জ্ঞান-গরিমার আবশ্যক । এই প্রকার পণ্ডিতদিগের কাল্পনিক কাহিনীতে কর্ণপাত করি না,—কপোল-কল্লিত ভাষার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অমৃত

বিসর্জন দিও না;—“বুধাস্ত মুখা বদন্তি ।” তোমাদের শরীর ক্ষণ-বিক্ষণসী। কোন্ মুহূর্তেই যে তোমাদের ঐ স্থঠাম-সুন্দর দেহখানি ধূলি-কণায় বা শ্মশান-ক্ষেত্রের ভস্ম-স্বরূপে পরিণত হইবে অথবা শ্মশান-প্রান্তরে শৃগাল-কুকুরে ক্ষুদ্র অন্নপিণ্ড জ্ঞানে ভক্ষণ করিবে; সুতরাং ভবিষ্যৎ তোমাদের সংস্রাব্য কীর্ণ অন্ধকার। অতএব, বর্তমানই তোমাদের লক্ষ্য, বর্তমানই তোমাদের ভোগ্য হওয়া উচিত। তুমি ভবিষ্যতের আশায় কেন আবুল হইতেছ? এই ভবিষ্যৎ যতক্ষণ বর্তমানে পরিণত না হইবে, ততক্ষণ ত তোমরা ভবিষ্যৎ-স্থখে বঞ্চিত থাকিবে! ভবিষ্যৎ চিরকালই ভবিষ্যৎ থাকিবে না, ইহা বর্তমানে বিলীন হইবে। বর্তমানকে তোমরা কেন পদদলিত করিতেছ? এই বর্তমানই একদিন তোমাদের ভবিষ্যৎ ছিল, যে ভবিষ্যতের জন্ত তোমাদের অন্তঃকরণ আলোড়িত হইত। ভবিষ্যৎ আগমনোন্মুখ বর্তমান মাত্র; আর, বর্তমান সমাগত ভবিষ্যতের নামান্তর মাত্র। সুতরাং বর্তমানকে উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের উপাসক হইলে, উপহাসাস্পদ হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু বর্তমানের নিশ্চয়তা সম্বন্ধেও ত নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি না,—বর্তমান শু অচিরেই অতীতে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তই-দৃষ্টিমাত্রই অদৃশ্য হইতেছে। এবম্বিধ অস্থায়ী মুহূর্তের সম্মুখগত যেমন অসম্ভব, সম্ভাবহারও তদ্রূপ। অতএব বর্তমান অনিশ্চিত, ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত,—তবে একমাত্র নিশ্চিত যে আমাদের জীবন অনিশ্চিত,—ইহা মাত্র অনিশ্চিত নহে; ইহার ব্যাপ্তি অতি দীর্ঘ হইলেও অতি ক্ষুদ্র,—যাহা একেবারে অনিশ্চিত এবং অস্থায়ী; সুতরাং অমৃতকে উপেক্ষা করিয়া, সে জীবনের উপাসনা করা বাতুলতা মাত্র। অতএব ঐহিক স্থখে বিগত-স্পৃহ হইয়া, অনন্ত সুখের জন্ত প্রস্তুত হও। সুতরাং তোমরা যাহা নও, তাহাই যদি হইতে চাও, তোমরা মৃত, যদি অমৃত হইতে অভিলাষ কর, তোমাদের যাহা নাই, তাহাই যদি পাইতে

চাও, তবে তোমাদের পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন, বিভব-বৈভব, সুখৈশ্বর্য, ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি যাহা আছে, তাহাতে অসন্তুষ্ট হও । বিবেক-বৈরাগ্যে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে চিন্তা স্থাপন করিয়া তোমাদের বাসনা-নিচয়ের বিশ্বগ্রাসী লেলিহান জিহ্বা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেল । তোমাদের অন্তঃকরণ যদি যুবতী-প্রেমে ভুলিয়া, ভগবৎ-প্রেমে অনুপ্রাণিত না হয়, তবে তোমাদের বক্ষপঙ্কর ভেদ করিয়া, হৃৎপিণ্ডগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও । তাই আবার বলি,—যদি প্রকৃত অমৃত পাইতে চাও, যাহাতে সন্তাপ নাই, বিরাম নাই, যদি তাহার অধিকারী হইতে চাও, তবে পার্থিব ঐহিক সুখৈশ্বর্যের মোহিনী মূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইও না,—আত্মহারা হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না । ঐহিক সুখৈশ্বর্যে বীতম্প্রহ হইয়া, সেই কারুণ্যামৃতধারা,—তারুণ্যামৃতধারা,—লাবণ্যামৃতধারা,—কোটি-মদনবিমোহন অশেষ-চিন্তাকর্ষক সহজ-মধুর-তরল-লাবণ্যামৃত-পারাবার,—সৌন্দর্য্য-কুসুম, মহাভাব-চিন্তামণি ত্রৈলোক্য-রক্ষামণি গোপাল চূড়ামণি, ঘাঁহার—“অধরং মধুরং বদনং মধুরং, হাসিতং মধুরং চলিতং মধুরম্ । হৃদয়ং মধুরং বচনং মধুরং, মথুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥” ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের—“নামামৃতং দোষহরং পিবন্তু” সর্বদোষহর নামামৃত পান কর, তাহা হইলে, তোমাদের অমঙ্গলের অবসান হইবে, অজ্ঞান-অন্ধকার দূরে যাইবে, জ্ঞানায়ি প্রজ্জ্বলিত হইবে, চিরসুখ শান্তিময় অমৃতান্বাদনে সমর্থ হইবে, তোমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবে । অতএব উঠ, আলস্য ত্যাগ কর,—পৌরুষ প্রদর্শন কর,—উৎসাহান্বিত হও,—পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে থাক, কেন প্রাপ্ত হইবে না ? হইবেই । কখনও ভাবিও না যে অমৃত দুঃসম্পাদ্য । কখনও ভাবিও না, আবালবিরাগী জ্ঞাননিষ্ঠ বৈরাগ্য-রসিক শুকদেব, ভগবদংশাবতার মহাজ্ঞানী ভগবান্ ব্যাসদেবাদি পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয় করিয়া, —কঠিন-কঠোর-রূপে আত্মলীন হইয়া,—পূর্ণ পবিত্র আত্মজ্ঞান দ্বারা ধ্যান-ধারণা জ্ঞান-গরিমায় সমুন্নত শম-দম-সাধন-সম্পন্ন মহাপুরুষেরা

[৪র্থ খণ্ড]

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৩৯

যাহা লাভ করিয়াছেন, তাহা কোন্ আধুনিক অজ্ঞিতেন্দ্রিয় শিশ্নোদর-
পরায়ণ সংসারাসক্ত মোহান্বিত ব্যক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে? এই
ভুল বিশ্বাস ত্যাগ কর,—ভগবানের দিকে লক্ষ্য করিয়া, পুরুষার্থ
প্রয়োগ কর, কেন না শাস্ত্র কহিয়াছেন,—“পুরুষপ্রযত্নস্ত অসাধ্যঃ
কিঞ্চিন্নাস্তীহ লোকে” এই জগতে পুরুষকারের অসাধ্য কিছুই নাই।
সংসারে যে যাহা চায়,—“সম্যক্ প্রযুক্তাং সর্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে”
যথাযোগ্যরূপে পুরুষার্থ প্রয়োগ করিলে, সর্বথা তাহাই প্রাপ্ত হয়;—
তোমরাও পাইবেই, প্রযত্ন কর। সহায় ও উৎসাহ-সময়িত দৃঢ়াভ্যাসী
যত্নশীল পুরুষগণ মেরু পর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে পারে, প্রাক্তন পৌরুষ-
রূপ আনন্দ, অনিচ্ছা, দুষ্কৃতি খণ্ডনের আবার কথা কি? অতএব,
তোমাদের অভিমত ফল-সিদ্ধি হইবে,—“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত”—আর,
প্রতিজ্ঞা কর,—“মত্তং বা সাধ্যৈম শরীরং বা পাত্যৈম।” মত্ত, কর্ম-
সাধনের কৌশল মাত্র। উপায় জানিয়া কর্ম-সম্পাদন জন্য তীব্র
পুরুষার্থ অবলম্বন করিতে হইবে। মত্ত সিদ্ধ করিতে হইবে, তজ্জন্য
শরীর যায় যাউক। শরীরের কষ্ট হইবে বলিয়া, এখন থাকুক—এরূপ
শিথিলতা আদৌ করিও না। কার্য সাধন করিতে গেলে, শত বিঘ্ন
উপস্থিত হইবে,—“শ্রেয়াংসি বহবো বিঘ্নাঃ” শত অনিষ্টপাত,—এমন কি,
মৃত্যুও হইতে পারে। সে সময়ে মনে করিতে হইবে, পূর্বকৃত
অনিষ্টজনক দুষ্কর্ম অনেক আছে; কিন্তু প্রাক্তন দোষ ঐহিক কর্মদ্বারা
নিশ্চয়ই পরাস্ত হয়। নিত্যকর্ম দ্বারা যতক্ষণ না উপস্থিত অশুভ
দূর হয়, ততক্ষণ প্রবল বেগে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিবে,—এ চেষ্টা
কখনই নিষ্ফল হয় না। মহামতি স্মৃতমুনি কহিয়াছেন,—

ধিক্ ধিক্ শরীরস্থখলালিতপালিভেষু,

মা খেদয়েদ্বলকুশং কটকং কটেন।-

শৌদাস রাম নলপাণ্ডুসুতাঃ শ্রুতান্তে,

‘দুঃখংবিহায় পুনরেষ সুখং প্রাপন্নাঃ ॥’

গরুড় পুরাণ । পূর্ব । ১১১

‘কোন কারণে অথবা সাধন-ভজনে ক্লেশ উপস্থিত হইলে, তাহাতে বিষন্ন হইবে না; কেন না, সময়ে অবশ্যই সকলের সেই বিপদের অবসান হয় । চন্দ্রকে রাহুগ্রাস করে বটে ; কিন্তু, পুনর্ব্বার সেই চন্দ্রের কি উদয় হয় না ? যাহারা নিয়ত শরীরকে পালন করে, তাহাদিগের প্রতি ধিক্ ! শরীর কোন কারণে ক্লেশ হইলেও, তাহাতে খেদ করিবে না,—ইহা সকলেই শুনিয়াছে যে, পাণ্ডবগণ সপরিবারে ঘোর বিপদে পতিত হইয়াও, পুনর্ব্বার তাঁহারা সম্পদ পাইয়াছেন । ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা সৌদাস একা মৃগয়া করিবার সময় ব্যাঘ্ররূপী ভূই রাক্ষসকে দেখিতে পাইয়া, তাহাদের একজনকে বিনাশ করেন অপর একজন প্রতিহিংসা করিবে, এইরূপ ভয় দেখাইয়া অস্তহিত হয় । একদা রাজা সৌদাস অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছিলেন, এই যজ্ঞে বশিষ্ঠ যাজকতা করেন । পলায়িত রাক্ষস বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া রাজার নিকট সমাংস অন্ন-ভোজন প্রার্থনা করিলে, রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তোগ করিয়া দেন ; তখন রাক্ষস গোপনে সমাংস অন্নের সহিত নরমাংস মিশ্রিত করিয়া দিলেন । ঋষি বশিষ্ঠ ভোজনের সময় নরমাংস প্রদত্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, রাজাকে অভিশাপ দিলেন,—‘যে খাদ্য আমায় দিয়াছ, তাহাই তোমার খাদ্য হউক ।’ বিনা অপরাধে এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া, রাজাও অভিশাপ দিবার জন্য জলগণ্ডু ব লইলে, মহিষী ইহাকে নিরস্ত করিলেন । তখন তাঁহার পাদদেশে সেই তেজযুক্ত জল পতিত হইলে, তাঁহার চরণদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল । তদবধি তাঁহার নাম হইল ‘কল্মষপাদ ।’ এই কল্মষপাদকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে এবং দুঃখ ভোগান্তে আবার আপন রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ভগবান্ রামচন্দ্র স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর এবং মহারাজচক্রবর্তী দশরথের তনয় হইয়াও,

[৪র্থ খণ্ড]

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

১৪১

অশেষ ক্লেশ-ভোগান্তে আবার রাজাধিরাজ মহারাজার আসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যপালন করিয়া গিয়াছেন । এইরূপে নলরাজাও অশেষ দুঃখ-দৈত্বে নিৰ্ম্মম কশাঘাতে ক্লিষ্ট এবং মথিত হইয়া, সুখের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন । অতএব, সাধন করিতে করিতে, কোন প্রকারে শরীর কৃশাদি বা কোন প্রকার অশুভ উপস্থিত হইলে, তাহাতে ভীত বা পশ্চাৎপদ হইবে না; বরং আরও উত্তম করিবে,—অবশ্যই আশাহুরূপ ফল লাভ হইবে । এইরূপ বিবিধ-বিষয়ক আলোচনায় প্রতীত হয় যে, ভগবৎ-সাধনায় কোনই অমঙ্গল নাই,—ভগবদ্ভজন সর্বমঙ্গল বিধায়ক । ভগবান্ স্বয়ং অৰ্জুনকে কহিয়াছিলেন,—“ন হি কল্যাণকং কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ।” সুতরাং কল্যাণকর ভগবদ্ভজনে অমঙ্গল নাই, অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, ভগবদ্ভজন সর্বমঙ্গলময় । কিন্তু, ঐশ্বর্যের বিষয়, ভগবদ্ভজন বা ভগবন্নাম কীৰ্ত্তন অধিকাংশ লোকের নিকট অপ্রিয় । যাঁহারা শিক্ষিত, প্রতিভাশালী, প্রতিষ্ঠাবান্ ও জ্ঞানবান্, তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—‘আমি একটা নেহাৎ বাজে লোক নই,—আমি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, রূপবান্, গুণবান্, কুলশীলমান, ধনবান্, মান-সহায়-স্বজন গাড়ী-ঘোড়া আমার না আছে কি? আমি নিতান্ত সাধারণ লোকের মত “হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ” বলিয়া চোঁচাইলে মান-মর্যাদা থাকে কিরূপে? পলালাবশেষ জীর্ণ-শীর্ণ পৰ্ণকুটীরবাসী ভিখারীর নাম কীৰ্ত্তনে যোগ দিলে, মৰ্ম্মর-নির্ম্মিত আকাশভেদী সুরম্য হৰ্ম্ম্যারলী-নিবাসী অতুল ঐশ্বর্যের অধিশ্বরের প্রভুত্ব-প্রতিপত্তিশালী লোকের কাছে মুখ দেখান দায় হইবে ।’ পরন্তু, এরূপ ভাব লইয়া, অহঙ্কার মমাকারের সেবায় মত্ত থাকিলে, অহঙ্কারের মহান্ বোঝা, অভিমানের বিশাল পর্বত বৃকে করিয়া, অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর সাজিলে, পাপের কবলে পড়িতে হইবেই । অহঙ্কারী—অভিমানী মানব ! হরিনাম সর্বমঙ্গল-বিধায়ক, হরিনামের নিকট ভেদজ্ঞান

নাই, ছোট-বড় নাই, উচ্চ-নীচ নাই ; হরিনামের নিকট সব সমান । হরিনাম যে কি তাহা সাধারণে বুঝিবে কেমন করিয়া ? ভেদজ্ঞানের ঢুলী খুলিয়া ফেল, দেখিবে—সম্মুখে কি মহিমা-মণ্ডিত অপার্থিব হরিনামের বিমল-জ্যোতিঃ কি রাজ-রাজেশ্বরের সুধা-ধবলিত আকাশভেদী সুরমা হর্ষ্যাবলীতে, কি দরিদ্রের জীর্ণ-শীর্ণ পলালাবশেষ পর্ণকুটীরে, সর্বত্র উদঃরভাবে সুধার ধারা বর্ষণ করিতেছেন । দেখিলে, তোমার হৃদয়ের সঙ্গীর্ণতা ঘুচিয়া যাইবে, পার্থক্য পলাইবে, দীনের প্রতি হীন-দৃষ্টি ও ঘৃণা অম্লহিত হইবে । তখন স্বয়ং বুঝিতে পারিবে,—হরিনাম কি প্রভাবান্বিত, কিরূপ পতিতপাবন !—যেখানে দাসত্বের শৃঙ্খল, হরিনাম সেখানে স্নেহের বন্ধন ; যেখানে শতছিদ্র ছিন্নবাস, হরিনাম সেখানে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ; যেখানে জ্বালাময় তিরস্কার, হরিনাম সেখানে স্নেহাশীর্বাদ ; যেখানে জীর্ণ-শীর্ণ পর্ণকুটীর, হরিনাম সেখানে সুরমা হর্ষ্য । অতএব, হরিনামের মহিমা—হরিনামের শক্তি—হরিনামের ঐশ্বর্য্য সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই অক্ষুণ্ণ । হৃদয় যখন তোমার যৌবনের মাধুর্য্য-মুগ্ধ, শরীর যখন তোমার সুস্থ ও সবল, যখন তুমি সমৃদ্ধির তুঙ্গ সীমায় উন্নীত, তখন ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে তোমার হৃদয় আশ্রুত হয় ; তখন স্বতঃই তোমার উন্নত মস্তক পরমেশ্বরের পরম পদে নমিত হয় সত্য ;—কিন্তু, তাহা হইলেও, যখন দুঃখের নির্ম্মম কশাঘাতে ক্লিষ্ট এবং মথিত হইতে থাক, ব্যাধির দংশনে কাতর হইয়া পড়, কিম্বা যখন নিঃসঙ্গ হইয়া জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত হও, তখনই হরিনামের প্রভাব যথার্থ অনুভূত হয়,—তখনই তোমার মায়া-মমতা, আশা-ভরসা, শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্তই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দাও । তখন তোমার হৃদয়ে এক অভিনব শক্তির সঞ্চার হয়, যে শক্তির অস্তিত্ব বোধ হয়, পূর্বে তুমি কখনও অনুভব কর নাই অথবা যে শক্তি একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া তোমার ধারণা ছিল ।

হরিনামের আনন্দ সকল প্রকার পার্থিব আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মহৎ ও উচ্চ। হরিনামে অবিস্থান করিলে, ভাগ্যবান সুখে বঞ্চিত হইবে, হত-ভাগ্যের দুঃখ আরও দুর্বিষহ হইবে। মাতেশ্বরী শ্রুতি বলিয়াছেন,—“আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন।” আনন্দ আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এ আনন্দ-ব্রহ্মকে অবগত হও,—তোমার সকল ভয় দূর হইবে। তুমি মুক্তাঞ্জয় হইয়া যাইবে। আনন্দই ব্রহ্ম,—আনন্দ সীমামুক্ত,—আনন্দ নিত্য। আনন্দ জীবের জীবন। অপিচ,—“ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নৈতাবুপাশ্রিতৌ ॥” প্রাণ-অপানের জীবন ধারণকেই জীবন বলে না; কেন না, ইতর জীবই প্রাণ-অপান দ্বারা জীবিত থাকে। মনুষ্যের জীবন কেবল প্রাণ-অপান নহে;—মনুষ্যের জীবন আনন্দ। সকল জীবেরই জীবন আনন্দ। কিন্তু, ইতর জীবের ইহা বুঝে না,—মানব ইহা বুঝিতে পারে। যে হতভাগা মুঢ় মানব প্রাণ-অপাণ-রূপ শরীর রক্ষার উপায়কে, উদ্দেশ্য আনন্দের সহিত এক করিয়া ফেলে,—সে উপায়ের ঘরে আটকাইয়া যায়। যাহা হইতে আনন্দ নভঃস্থলে ও ভূতলে স্ফূরিত হইতেছে, সর্ব জীবের জীবন, সেই আনন্দ ব্রহ্ম। নভঃস্থলে ও ভূতলে কোন্ আনন্দ স্ফূরিত? বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ,—ইহারাই বিষয়। বিষয়-বাসনাই চিত্তকে ব্যাকুল করে;—যাহার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয়, তাহা যখন প্রাপ্ত হয়, তখন সেই ভোগ-প্রাপ্তিতে চিত্ত ক্ষণকালের জন্য নিশ্চিন্ত হয়। সেই সময়ে চিত্ত অন্তর্মুখী হয়, তখন বুদ্ধি-প্রতিফলিত আনন্দময়ের আভাস প্রাপ্ত হইয়া, চিত্ত যে আনন্দ পায়, তাহাই বিষয়ানন্দ। কিন্তু, বাসনানন্দ অন্তরূপ। মাতেশ্বরী শ্রুতি বলিয়াছেন,—

য এষ স্তুপেষু ভাগতি কামং,

কামং পুরুষো নির্নিমাণঃ।

তদেব শুক্রং তদ্বক্ষ্য তদেবামৃতমুচ্যতে,

তস্মিন্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বৈ তত্ননাভেতি কশ্চন ॥

কঠোপনিষৎ । ২।৫৮

যে পুরুষ অর্থাৎ আত্মা প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার শূন্য হইলেও, অবিদ্যা দ্বারা তাঁহাদের ইচ্ছামত স্ত্রী প্রভৃতি কাম্য বিষয় সকল পূর্বে প্রস্তুত করিয়া, নিজে জাগ্রত থাকেন, তিনি শুদ্ধ, ব্রহ্ম এবং অবিনাশী । পৃথিবীর সমস্ত লোকই তাঁহার আশ্রিত, তিনি কিন্তু কাহারও আশ্রিত নহেন এবং তিনি সকলেরই অনতিক্রমণীয় । সুষুপ্তিভঙ্গে মানুষ যখন চিত্ত স্থির করিতে চেষ্টা করে, তখন দেখে শরীর বড় লঘু, প্রাণ আনন্দে ভরা । সকল ইন্দ্রিয় অণু অণু দিন জাগ্রত হইয়াই, বাহিরে বিষয় লইয়া ছুটিত, আজ যেন কাহার স্পর্শে ইহারা জাগ্রত হইয়া, বিষয়ের দিকে না ছুটিয়া, আনন্দদাতাকে লক্ষ্য করিতেছে । তখন জীব স্থির হইয়া বসিয়া, সুষুপ্তি-সুখের ভাবনা করিতে থাকে । সুষুপ্তি-সুখের স্মরণে যে অনুভবাজন তাহাই বাসনানন্দ । বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দের সহচর হইলেও, যতদিন উহা ব্রহ্মানন্দে মিলিত না হয়, ততদিন জীবের দুঃখ । ব্রহ্মানন্দ পাইতে হইলে, কি করিতে হইবে ? বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ ধরিয়া ব্রহ্মানন্দে পৌঁছিতে হইবে,—বিষয়ানন্দে ও বাসনানন্দে যে আনন্দ,—তাহাই ব্রহ্মানন্দের আভাস । এখানে বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ,—উহারই সংবাদ দেয় মাত্র । কিন্তু, যেখানে উহাদের অন্ত, সেখান হইতে প্রকৃত আনন্দের আরম্ভ হয় । জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য যেমন আকাশের একাংশে অবস্থিত থাকিয়াও, সমস্ত সৌর-জগতে আলোক প্রদান করিয়া ব্যাপিয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ রশ্মিদ্বারা পৃথিবীকে ছুঁইয়া আছেন, আনন্দ ব্রহ্মও সেইরূপ, অনন্ত জগতের একাংশ নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ বিরাজমান থাকিলেও, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ দ্বারা বিচিত্র জগৎ স্পর্শ করিয়া, অব্যক্তরূপে জগতের সর্বত্র বিরাজমান আছেন । অন্ধকার গৃহে যে সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া, আলোক-রেখা প্রবেশ করে, সেই আলোক-রেখা গৃহের ততটুকু অন্ধকার দূর করে । সেই আলোক-রেখা ধরিয়া বাহির হইতে পারিলে, বাহিরের সূর্যালোকে

[৪র্থ খণ্ড]

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

১৪৫

পৌছিতে পারা যায় সেইরূপ বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ ধরিয়া, অন্তরে বাহিরে অর্থাৎ স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে এবং অনলে—অনিলে—সলিলে,—পাদপে—প্রান্তরে—প্রান্তরে,—অনন্তে—আকাশে—অবনী-মণ্ডলে,—জলস্থল-মরুদ্ব্যোম-বিশ্বচরাচরে সর্বত্র এক অদ্বিতীয় নিরঞ্জন পরিপূর্ণ আনন্দময়ে প্রবেশ করা যায় । আনন্দ-ব্রহ্ম হইতে প্রাণী-সমূহ জাত, আনন্দেই স্থিত এবং আনন্দেই লয় হয় । সুতরাং আনন্দেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয় । বিষয়ানন্দ ভোগ ত সকলেই করে, তবে সে আনন্দে পৌছায় না কেন ? কারণ আছে,—আনন্দের আধারে পৌছিতে পুরুষার্থ করে না । মানুষ অন্ধকার গৃহের আলোক-রেখাই নানাপ্রকারে ভোগ করিতে চায়,—অন্ধকারে শতবার আছাড় খায় ; কিন্তু, তথাপি কত প্রকার করিয়া, ছাঁকিয়া ছানিয়া, বিষয়-জড়িত আনন্দ ভ্রমে, বিষয় ভোগ করিতে থাকে । এখানেও উদ্দেশ্য আনন্দ, উপায় বিষয় । উদ্দেশ্য ও উপায়,—এক করিয়া গোলমাল করে । সংসার, স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য আদি আনন্দ প্রদান করুক বা না করুক, স্ত্রী-পুত্রকেই আনন্দ বলিয়া ভাবে; আর, উপায়কে উদ্দেশ্য করিয়া, বিষয়-বিষ ভক্ষণে জর্জরিত হয় । কেন না, স্ত্রী-পুত্রের মায়া-মমতায় যে ক্ষণিক সুখ, সে সুখ অষ্ট-প্রহর রুধিরাক্ত ! অতএব, মায়া-মমতায় সুখ নাই,—আনন্দ নাই,—শান্তি নাই ! কেবলই দুঃখ !—কেবলই যন্ত্রণা !—বিষয়-কামনা, বিষয়-তৃষ্ণা না ছাড়িয়া বড় ক্লেশ-ভোগ করে । মানুষ যতই জ্ঞান-গবেষণায় সম্মত হইতে থাকে, ততই তাহার জীবন বিকট দুঃখের আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে । মানুষ যতই ভাবিতে—বুঝিতে শিখে, তাহার দুঃখ-ভুর্দশার অগ্নিশিখা ততই জ্বলিয়া উঠিতে থাকে । জ্ঞানী চিন্তাশীল মানুষ জীবনে জগতে এমন কিছুই দেখিতে পায় না,—এমন কোন সামগ্রী জানিতে পারে না,—যাহাতে তাহার জীবনে শান্তি-সুখা সংবর্ষণ করিতে পারে । এমন বিকট জগতে, এমন বিষময় জীবনে, কে প্রাণের হাসি হাসিতে

পারে ? এই দেহভার—চিন্তার বোঝা মাথায় করিয়া, কে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে পারে ? শ্রুতি কহিয়াছেন,—

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং—

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাঃ—

স্তেষাং শাস্তিঃ শাস্ত্বতী নেতরেষাম্ ॥

কঠোপনিষৎ । ২।৫।১৩

যিনি নিত্য পদার্থের ও নিত্য, যিনি জীব সকলের চৈতন্য-সম্পাদক, যিনি এক হইয়াও, সকলের কামনা পূর্ণ করেন, যিনি এক ও সর্বনিয়ন্তা এবং স্থাবর-জঙ্গম সর্বভূতের অন্তরাত্মা হইয়াও, স্বীয় অদ্বিতীয় রূপকে মনুষ্যাদিভেদে বহুরূপ করিয়া থাকেন, যে চিন্তাশীল জ্ঞানবান্ ভক্তিমান একান্ত ভগবন্তুক্ত ধীরগণ, তাঁহাকে নিজ নিজ হৃদয়-কমলের রক্তিম-স্তবকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন ; তাঁহারাই এই বিকট জগতে, বিষময় জীবনে নিত্য-সুখ ভোগ ও নিত্য-শাস্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে সে সুখভাগী হয় না,—সে শাস্তি পায় না। অতএব, তৃষ্ণাক্ষয়ে পুরুষার্থ কর,—প্রবল প্রযত্ন কর এবং নাম-সুধা পান করিতে করিতে স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে,—“নবনীরদনিন্দিতনীলতল্লুং” ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে থাক, তাহা হইলে, বাসনা-সর্প-পরিবেষ্টিত, বিষয়-বিষে বিষময়, রাগ-দ্বेष-কাম-ক্রোধাদি-মলে পুতি-গন্ধময় অন্ধকার গৃহ ছাড়িয়া, পূর্ণানন্দ প্রেম-সূর্যালোকে বাইতে পারিবে। এই আনন্দ-ব্রহ্মই, সেই কোটি-মদন-বিমোহন অশেষ-চিত্তাকর্ষক সহজ-মধুর-তরল মাধণ্যমৃত-পারাবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ । তিনি সর্বজীবের আত্মস্থ, তাঁহাকে জ্ঞান, সুখময় আনন্দময় শাস্তিময় আত্মস্থ—“মধুরং মধুরং বপুঃস্থং বিভোঃ” কে আত্মদান কর,—এত সুখ,—এত শাস্তি কোথাও কিছুতে নাই।

তাই বলি, সংসারী মানব ! আত্ম-গরিমা—আত্ম-অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া, সুখে-দুঃখে—বিপদে-সম্পদে সকল সময়ে ভগবানের প্রতি নির্ভর-পরায়ণ হইয়া, নাম-সুধা পান কর, তাহা হইলে অশাস্তিতে আর জ্বলিতে হইবে না,—শাস্তি শাস্তি করিয়াও, আর হাহাকার করিয়া বেড়াইতে হইবে না। তখন সুখ বল, শাস্তি বল, সকলই তোমার অনুগত থাকিবে। সম্মুখে উপস্থিত নাম-সুধা ছাড়িয়া, অহঙ্কার-মমকারের হলাহল আকর্ষণ পান করিলে, নিজের অমঙ্গল ত আছেই, পরন্তু নামের প্রতি প্রীতি ও রতিশূন্য হওয়ায়, প্রচুরতর অপরাধ ঘটিবে, ইহাতে সংশয় নাই। অতএব, নাম-সাধক সংসারী মানব ! নামাপরাধ এড়াইতে সতত চেষ্টা করিবে; কিন্তু, যেন মনে থাকে,—‘নামাপরাধ এড়ান কথায় যত সহজ, কাজে কিন্তু তত সোজা নয়।’ সুতরাং, সাবধান !—কেন না, অনেক সাধকই নামাপরাধের গুণী পার হইতে পারেন না, নামাপরাধেই তাঁহাদের আজীবনকাল নাম-সাধন নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া যায়, পণ্ডশ্রম সার হয়। যদি নামাপরাধ সত্ত্বে নাম-সাধন নিষ্ফল হয়, তবে অশেষরূপে অপরাধী কলির জীবের উপায় কি ?

তমপি দেবকরং করুণাকরং,

স্থাবরজঙ্গমমুক্তিবরং পরম্।

অতিচরন্ত্যপরাধপরা জ্ঞনা—

য ইহ তানবতি ধ্রুব নাম হি ॥

পদ্মপুরাণ। স্বর্গ। ৩৮। ১৪৩

এই নরাবাস ধরাধামে যাহারা দেবকর স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীব-সকলের মুক্তিকর পর পরম-কারুণিক কারুণ্যপ্রাণ করুণা-নিদান করুণাকর ভগবান্ ত্রীহরিকে অতিচরণ করিয়া অর্থাৎ তাঁহার অমিয় সুধাসিক্ত নাম স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হউক, শ্রদ্ধায় বা অশ্রদ্ধায় হউক, শুদ্ধভাবে উচ্চারিত বা অশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হউক, পরিহাসচ্ছলে বা উপহাসচ্ছলে

অথবা ব্যঙ্গ-বিদ্রোপে উচ্চারিত হইলে, যে অপরাধ হয়, কেবল নামই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব, প্রমাদবশতঃ কোনরূপে নামাপরাধ জন্মিলে, সদা নাম-কীৰ্ত্তন করতঃ তদেকশরণ হইবে। যে হেতু, নামাপরাধজ পাপ সকল নামেই হরণ করে সেই নাম সকলই অবিজ্ঞান প্রযুক্ত হইলে, সর্বার্থসাধক হয়। শ্রীপদ, সর্বোপদ্রব-নাশন, সর্বপাপক্ষয়কর, দুষ্ক্ৰিয়-নিবারণ, বিষু-সান্নিধ্যাদ এবং চতুর্বর্গফলপ্রদ শ্রীবিষ্ণুর সুধাসিক্ত অমৃতময় নাম যে নর ভক্তি-সহকারে অহর্নিশ কীৰ্ত্তন করে, সে অস্তিত্বে সর্ববাসনামুক্ত হইয়া, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য পরম নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে। অতএব,—

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ,

সর্বোজ্ঞানাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যালীকম্ ।

তে হুন্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং,

নৈষাং মহামিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৭।৪২

যাঁহাদিগের প্রতি ভগবানের করুণা আছে, তাঁহারা অকপটে ও একাগ্রমনে তাঁহার চরণে শরণ লইলে, অতি হুন্তর দেবমায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। শ্মশান-প্রান্তরে শ্মশানচারী শৃগাল ও কুকুরগণের আহারভূত এই অনিত্য দেহে “আমি ও আমার” বলিয়া, তাঁহাদিগের আর অভিমান থাকে না। সুতরাং দেবমায়া উত্তীর্ণ হইতে চাহিলে, নামাশ্রয় হইয়া, অহর্নিশ নাম-কীৰ্ত্তন করিতে হইবে, তাহা হইলে, আর কোনই ভয় থাকিবে না। ভগবানের নাম-মন্ত্র-সাধনে জীবের মুক্তিলাভ হইবে; সুতরাং নাম-সাধনের ন্যায় জীবের পক্ষে এমন সুগম-সাধন-পন্থা আর হয় না, হইবেও না; কেন না এই নাম-মন্ত্র সাধনায় দীক্ষা, পুরশ্চরণাদি অপেক্ষা করে না; জিহ্বাস্পর্শ করিবারাত্রি আচণ্ডালাদি সকলকেই উদ্ধার করিয়া থাকেন। যেমন অগ্ন্যায়

[৪র্থ খণ্ড]

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

১৪৯

মন্ত্র-সাধনায় মন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রথমতঃ দীক্ষার সহিত মন্ত্রগ্রহণ করিয়া, তৎপরে পুরশ্চরণাদি করিতে হয়; নচেৎ মন্ত্র ফলপ্রসূ হয় না। কিন্তু, নামরূপ মহামন্ত্রে সর্বাক্ষ-সম্পূর্ণ দীক্ষার আয়োজন বা পুরশ্চরণের প্রয়োজন করে না। কেবলমাত্র রসনা-সঞ্চালনে নাম-উচ্চারণের আবশ্যক হয়; আর, নামাপরাধের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। পরন্তু, নামে আসক্ত হইলেই, নাম-সাধনের দ্বারাই, নামাপরাধ আপনা হইতেই অপমৃত হয় এমন কি, যত প্রকার পাপ আছে, নাম-কীর্তনে আসক্ত হইলে, সকলই নষ্ট হইয়া যায় এবং নাম-কীর্তনে জীবের মুক্তি হয়। তবে নামাপরাধের প্রতি দৃষ্টি ঠিক থাকা চাই,—নামাপরাধের প্রতি দৃষ্টি ঠিক না থাকিলে আর আশা নাই। আর যদি ভাব যে, নাম-সাধন পাপ-নাশনে সমর্থ কি না, এ সন্দেহের মূলেই ভুল। যাহা শাস্ত্র-সম্মত, বিশেষতঃ পরীক্ষা-পূত, তাহাতে সংশয় কোথায়? শাস্ত্রে মহাপাপী অজামিলের উপাখ্যানে এ তত্ত্ব বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই পতিতোদ্ধার নাম-সাধনে যখন ম্লেচ্ছ-যবন, পাপী-তাপী, পতিত-চণ্ডালের বিচার নাই, তখন নাম শক্তি-সমুদ্ভূত। অতএব, যদি অগতির গতি, অনাথের পতি, অনুপায়ের উপায়, অসহায়ের সহায়, জীবগণে ভব-ভুফানে যাহার কৃপায় পরিভ্রাণ পায়, ভগবান্ শ্রীহরির সেই রাজ্য পায় কাহারও দাবী থাকে, তবে তাহা কেবল অন্ধ-আতুর অনাথ-নিরাশ্রয় পাপী-তাপী কলির মানবেরই। যাহারা যোগ-বাগ, ধ্যান-ধারণা জ্ঞান-গরিমা, জপ-তপঃ, দান-ধ্যানে অসমর্থ, অযথার্থে অনুরক্ত, তাদৃশ অপদার্থ জীব, যাহারা আকৃতিতে মানুষ; কিন্তু প্রকৃতিতে বিবাণ পুচ্ছবিহীন পশু, তাহাদের উদ্ধারের জন্তই হরিনামের প্রচার। মনে পড়ে না কি? —যে কালে ভারতবর্ষে পাষণ্ডের অত্যাচার—পাপভারে দেশ ডুবিয়া যাইতেছিল,—মানুষ, নরবলি দিয়া, স্বীয়

রসনার তৃপ্তি সাধন করিত, তর্ক-বিতর্ক বাগ্-বিতণ্ডা করিয়া, লোককে ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত করিত, —কেহ কাহাকেও মানিত না, কেহ কাহাকেও ছাড়িত না,—বাহ্যযুদ্ধে সকল তর্কের মীমাংসা সাধন করিত, সেইকালে কলিপাবন মহাজন প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, হরিনাম প্রচারে সমগ্র ভারতে যে স্বর্গীয় সুখাস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যাহার বিন্দুমাত্র স্পর্শে কত মরুক্ষেত্রে চন্দনতরু দেখা দিয়াছিল, কত শশ্যানক্ষেত্রে নন্দন-কাননের সম্পৎ প্রকাশ পাইয়াছিল, কত দাবদগ্ধ বনানীর বিশুদ্ধ বৃক্ষ; নব পল্লবে সুশোভিত, মুকুলিত লতার প্রেমস্পর্শে পুলকিত ও ছায়া-সম্পদে গৌরবিত হইয়াছিল, কত শুষ্ক নদীগর্ভ পুনরায় সুশীতল স্বেচ্ছজলে সঞ্চিত পিপাসা মিটাইয়াছিল, তাহার জীবন্ত নিদর্শন-লেখা অত্য়পি সমগ্র ভারতের বক্ষে বিষ্ণু-বক্ষস্থ ভৃগু-পদ-চিহ্ন শ্রীরেখার ত্রায় দীপ্তি পাইতেছে। অতএব, হরিনাম-সাধনই কলির কাম-কিন্ধর দুর্বল শক্তিহীন জীবের ভব-বন্ধন মোচনের একমাত্র উপায়। যাহারা তাহা গুনিয়াছেন, মানিয়াছেন, সাধনায় নিরত হইয়াছেন, তাঁহারা ই সে সাধনের সুফল লাভ করিয়াছেন। এখনও সমাহিত সাধকের কর্ণমূলে সেই প্রাদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য গোলোকের দৈববাণীর স্বর-তরঙ্গ উপস্থিত হয়,—“হরেনাম হরেনাম নামৈব মম জীবনম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥” অতএব, কলি-মলিন কলি-কলুষিত কামনা-বিজড়িত মানব ! এস, অন্ধ-আতুর অনাথ-নিরাশ্রয় পাপী-তাপী কে কোথায় ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় শুষ্ক-কণ্ঠে আছ—এস, ছুটিয়া এস,—

হরিনাম সুধারস পিয় পুরি মানস.

অলসের বশে কাল হ'রো না।

হরি হতে সহস্রগুণ, শ্রীহরির নামের গুণ,

তুলে তুলে নামের গুণ, পেলে তুলনা ॥

সত্যভামা ব্রতচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণেরে তুলে তুলে,
 মণি-রত্ন আদি দিলে, তুল টলে না;
 তুলসীপত্রে লিখি হরি, দিলেন ধরি তুলোপরি,
 হরি হতে নাম ভারি সেই হতে গেল জানা ।
 লইলে শ্রীহরির নাম, পূর্ণ হয় মনস্কাম,
 প্রাপ্ত হয় কৈবল্যধাম বেদে বর্ণনা;
 কর শ্রীহরি কীর্তন, শুন হরি গুণগান,
 হরি ভিন্ন অত্ৰ কোন রসে মজ্জ না ।
 বাসনায় রসনা-যন্ত্রে, সাধনা শ্রীহরি-মন্ত্রে,
 শ্রবণে শ্রবণে-তন্ত্রে দিয়ে মুচ্ছনা;
 ছয় রাগে অনুরাগে, ছত্রিশ রাগিনীযোগে,
 তালে লয়ে দ্রুতবেগে হরিসাধনা ।
 “হরেনািমৈব” এই কথা,—“কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা,”
 তপস্বী ঋষির গাঁথা, গীতা বর্ণনা;
 তিনবার হরে হরে, বলিলে কলুষ হরে,
 হরি বল্লে উচ্চৈঃস্বরে হরে বেদনা ।
 হরির নাম অগতির গতি, নামে কর রতি-মতি,
 নাম কর নিতি নিতি দিবারাতি ছেড়না;
 ছাড় সংসার কুমতি, দৃঢ় কর শ্রীপতি,
 কেবল হরিনামে মতি, রতি টলে না ॥

—:~:—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

ভব সাগর ।

—: :—

তর্কুং সংসৃতিবারিধিং ত্রিজগতাং নোনাঁম যন্ত প্রভো—

যেনেদং সকলং বিভাতি সততং জাতং স্থিতং সংসৃতম্ ।

যশ্চৈতত্ত্বঘন প্রমাণ বিধুরো বেদাস্ত বেদ্য বিভু—

স্তং বন্দে সহজ প্রকাশমমলং শ্রীরামচন্দ্রং পরম্ ॥

যে প্রভুর নাম,—সংসার-বারিধি-তরণে নৌকা-স্বরূপ ; যাঁহা দ্বারা এই সমস্ত বিশ্ব প্রপঞ্চ বিভাতি ; যাঁহা হইতে বিরাট্-বপু অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে এবং যাঁহাতে এই বিশ্ব-চরাচর স্থিত, যিনি চৈতন্যঘন, অপ্রমেয়, বেদাস্তবেত্তা, সর্ববদৃক্ বিভু, সেই সহজপ্রকাশ পরাংপর বিমল শ্রীরামচন্দ্রকে বন্দনা করি ।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, এই যে পরিদৃশ্যমান অনন্ত-বৈচিত্রশালী, নানাজীব-সঙ্কুল, বন-বনাস্ত-পরিশোভিত, বহুরত্নপূর্ণ সুখৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন শোভন—সৌন্দর্য্যময় সংসার;—ইহা দেখিতে অতি সুন্দর !—ইহাকে যেই দেখে, সেই আপনাকে ভুলিয়া, জগন্নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে ভুলিয়া, ইহাতেই মজিয়া যায়,—আসক্ত হইয়া পড়ে । সুতরাং, এমন নয়ন-মনাকর্ষক শোভন-সৌন্দর্য্যময় সংসারকে কবিরা, ভক্তরা ও ভাবুরা ভব-সাগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কেন ?

অয়ং হি পরদুস্পারো ঘোরঃ সংসারসাগরঃ ।

বিনা যুক্তি প্রযত্নাভ্যাসম্বাদ্যাম ন তীৰ্য্যতে ॥

যোগবাশিষ্ঠ । উপঃ । ৭৬

ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী ভগবান্ শ্রীরাম-চন্দ্রের মনেও একদিন এইরূপ সংশয়-প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। সংশয়াপন্ন হইয়া, তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মহর্ষি তাহাতে উত্তর দেন,—‘ঐ যে অনন্ত-প্রসারিত দিগন্ত-বিস্তৃত অনন্ত-বীচি-বিক্ষুব্ধ, অতলস্পর্শ অনন্ত জলরাশি দুরধিগম্য মহান্ সমুদ্র দেখিতেছ, অনন্ত মহার্ণবের কোথাও কূল-কিনারা নাই কেবলই জল—চারিদিকেই উল্লোল-কল্লোলময় অতলস্পর্শ অনন্ত জলরাশি। কোথাও যোজন দূর-বিস্তৃত উত্তুঙ্গ পর্বত-প্রমাণ বিভীষিকা ময় উত্তাল তরঙ্গোচ্ছাস! কোথাও দূরবগাহ অতলস্পর্শ জলরাশির ভীষণ গাভীর্য্য!—আর উর্দ্ধে, নীলিমাময় অনন্ত নীলাকাশ। অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া কেবলই ঘনীভূত অন্ধকার। নিম্নে যেমন দুরধিগম্য অতলস্পর্শ অনন্ত জলরাশির মহান্ সমুদ্র, উর্দ্ধেও তেমনই অনন্ত অন্ধকারের মহান্ সমুদ্র। অন্ধকার রাশি ও জলরাশি যেন এক হইয়া, দিগন্ত ছাইয়া রহিয়াছে; দৃষ্টির পথ অবরুদ্ধ! তাহাতে যেমন আবার মকর-কুম্ভীরাদি বিকট জলজন্তুরা “দংষ্ট্রা করালানি ভয়ানকানি করাল বদন ব্যাদন করিয়া, নিরন্তর আহার লোভে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কোথায় প্রবল পরাক্রান্ত গভীর নিঃশ্বন প্রচণ্ড বায়ুসকল প্রবল ঝটিকা-রূপে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া, মহান্ সমুদ্রের দিগ-দিগন্তুরাল-সমূহকে—“ভীষণং ভীষণানাং” অতি-ভীষণ করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে আবার, প্রচণ্ড বাড়বানল অতলস্পর্শ সমুদ্রতল হইতে গভীর গর্জ্জন সহকারে সমুথিত হইয়া, বিভীষিকা প্রদর্শন পূর্বক প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইতেছে। সকলে মিলিয়া, এক হইয়া যেন, অনন্ত মহার্ণবকে

ভীষণ হইতে ভীষণতর-ভীষণতম করিয়া, অতি দুর্গম করিয়া ফেলিয়াছে। যে প্রকার অনন্ত-বীচি-বিক্ষুব্ধ, অতলস্পর্শ অনন্ত জলরাশি মহান সমুদ্র, অনন্ত মকর-কুন্তীরাদি দ্বারা, অনন্ত প্রচণ্ড প্রবল ঝটিকা-প্রবাহ দ্বারা ও অনন্ত বড়বানল দ্বারা অতি দুর্গম অতি ভীষণ হইয়া রহিয়াছে,— দেখিবামাত্রই মানব-মনে ভীতি সঞ্চার হইয়া থাকে; এই অনন্ত সংসারও তদ্রূপ ভীষণ হইতে অতি ভীষণ! এই জন্তই কবিরা, ভক্তরা ও ভাবুরা, এই শোভন-সৌন্দর্য্যময় সংসারকে ‘ভব-সাগর’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেন না,—এই ভব-সাগর অগাধ অনন্ত বিষময় বিষম বিষয়-সলিলে পরিপূর্ণ;—আশা-ভৃশা, স্পৃহা-আকাজ্ঞা, প্রলোভন-লালসা প্রভৃতি অনন্ত বীচি-মালায় সমাকীর্ণ;—কামনা-বাসনা, কল্পনা-দ্বন্দ্বনা প্রভৃতি প্রবল ঝটিকায় সমাকুল;—ইহাতে মায়া-মমতা, বিষয়-আশয়, আশা-ভরসা প্রভৃতি উত্তাল তরঙ্গোচ্ছাসের ভীষণ গাভীর্ঘ্য! —ইহা-কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মাৎস্যর্য্য প্রভৃতি বিকট মকর-কুন্তীরাদি রিপুকুলে অতি সঙ্কট;—ইহা আধি-ব্যাধি-শোক জন্ম-জরা-মৃত্যু, আধ্যা-ত্মিক-আধিদৈদিক-আধিভৌতিকাদি তাপত্রয়ে এবং নরকযন্ত্রণা-দৈন্ত্য-দুঃখ-জ্বালা প্রভৃতি প্রচণ্ড ঝড়বানলে অতি ভয়ঙ্কর;—ইহা পুত্র-কলত্র, মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, সুহৃদ্রা আত্মীয়-স্বজন, বিভব-বৈভব, ধনৈশ্বর্য্য প্রভৃতির আসক্তি-রূপ খরস্রোতে—মোহ-রূপ আবর্তে এবং সুখ দুঃখ মান-অপমান, শীতোষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-রূপ ঘোর ঝগড়াতে ও প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, মিথ্যা-অবমাননা, দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তা, হিংসা-দ্রোহ, ঈর্ষ্যা-পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি অনন্ত অন্ধকারে সমাহ্ন;—তাহার উপর আবার, মহামোহের সূচীভেদ্য তমোরাশি, ঘনঘোরা কুহেলিকার ত্রায় সর্বত্র ব্যাপিয়া, ভীষণ হইতে অতি ভীষণা মূর্তি ধারণ করিয়া, নানাজীব-সঙ্কুল—শোভন-সৌন্দর্য্যময় সংসারকে অনন্ত অন্ধকার-সমুদ্র করিয়া রাখিয়াছে। এই ঘোর সংসার-সাগর অতি দুর্গম—অতি দুস্তর; যে

প্রকার অকূল ছুপ্পার ছুরধিগম্য মহান্ সমুদ্রের পরপারে সহজে কেহ
 যাইতে পারে না, তদ্রূপ, এই অকূল ছুপ্পার ছুরধিগম্য ছুস্তর ভব-পারা-
 বারের পরপারেও সহজে কেহ পৌঁছিতে সমর্থ হয় না । যুক্তি ও যত্ন
 ব্যতীত এই দুর্গম ছুপ্পার ছুস্তর সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না ।
 সুতরাং ইহাতে মগ্ন হইয়া, যদি কেহ সৌভাগ্যোদয়ে প্রযত্নবলে উত্তীর্ণ
 হইতে পারে তবেই তাহার শ্রেষ্ঠ পৌরুষের সাফল্য হয় জানিবে ।
 হে রামচন্দ্র ! সন্নিহিতা প্রজ্ঞা-রূপিণী মহা-নৌকায় বিবেক-রূপ শ্রেষ্ঠ
 নাবিক বিদ্যমান থাকিতেও, যিনি এই সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ না হন,
 তাঁহাকে শিক !' সুতরাং —

তে জন্মভাজং খলু জীবলোকে,
 যেমাং মনো ধ্যায়তি বিশ্বনাথম্ ।
 বাণী গুণান্ স্তোতি কথ্যং শৃণোতি—
 শ্রোত্রদ্বয়ং তে ভবমুত্তরস্তি ॥

স্কন্দপুরাণ । ব্রহ্ম-উঃ । ২২

যাহাদের মন সর্বদা বিশ্বেশ্বর-বিশ্বরূপ-বিরাটপুরুষ ভগবানের
 ধ্যান করে, বাণী-গুণ-স্ততি গান করে এবং ঋতিযুগল মাহাত্ম্য-কথা
 শ্রবণ করে, তাহাদিগকেই প্রকৃত জীবলোকে জাত বলা যায় এবং
 তাহারাই ছুস্তর ঘোর সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে । অতএব,
 হে সংসার-সাগরে নিমজ্জমান মানব !

বিশ্বার্থবৎ নিয়মিমং তিষ্ঠিষু,
 দিবৈব্যঃ সুগন্ধৈঃ কনক প্রসূনৈঃ ।
 নারায়ণং পদ্মদলায় তাক্ষং,
 মতের্যা যজ্ঞেং বিপ্র বিহায় পাপম্ ॥

পদ্মপুরাণ । ক্রিয়া । ৯

অতি গভীর কাম-ক্রোধাদি-রিপু-নক্র-সঙ্কুল মোহাবর্ত-চঞ্চল এই

বিরাট-বপু অথও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে যাহার একান্ত অটল অচল অভিলাষ আছে, তবে সে ব্যক্তি সুগন্ধিত সৌরভিত প্রেম-ভক্তি-সুবর্ণ-কুমুম দ্বারা একাগ্র হৃদয়ে ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরি, ত্রিতাপহারী পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ শ্রীগন্যায়-রণের মুনিবৃন্দবন্দ্য পদারবিন্দের পূজায় নিরত হইবেন ।

—(*)—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

পরমপদ বৈকুণ্ঠধাম ।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, এই, যে, কবিদের—ভক্তদের—ভাবুকের কল্পিত, কাম-ক্ৰোধাদি-রিপু-নজ-সঙ্কুল মোহাবর্ত-চঞ্চল ছুস্পার ছুস্তর অকূল ভব-পারাবার,—ইহার পরপারে কি আছে ? তাহার নাম কি ? তাহা কি ভাবে অবস্থিত ? সেখানে কে থাকেন ? তাহার নাম এবং তাহার স্বরূপ কি ?

এইষেব সংশ্লিষ্টস্তোরস্তাঃ পারং পরং পদম্ ।

যোগবশিষ্ঠ । নিঃ পূঃ ১২

স্বগম সাধন-পদ্ম।

১৫৭

এই যে, পরিদৃশ্যমান কাম-ক্রোধাদি রিপু-নক্র-সঙ্কুল মোহাবর্ত-চঞ্চল
 ছুপ্পার ছুত্তর অনন্ত ভব-পারাবার,—ইহার পরপারে যাহা আছে, তাহা
 তোমায় কি দিয়া বুঝাইব? তাহার প্রতিকূপ শব্দ নাই, চিহ্ন নাই,
 সঙ্কেত নাই, যাহা দিয়া তোমায় বুঝাইতে পারি; তবে সে কি? সে যে
 কি? কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব? তাহার রূপ নাই, সে যে
 নিঃস্বভাবক প্রতিকূপ-বিবর্জিত, সে যে কেমন? তাহাকে শুধু তাহার
 নাম শুনিয়াই জানিতে হয়। দেখ, রসনাই আশ্বাদের আশ্বাদ-গ্রহণে
 সমর্থ, সে আশ্বাদ কেমন? তাহা ত আর কাহারও সাহায্যে প্রতীয়-
 মান হইতে পারে না। তাহা যে লৌকিক জ্ঞানের অতীত,—লৌকিক
 দৃষ্টান্তের অতীত,—লৌকিক উপমার অতীত, মানবের মানস-কণ্ঠ্যন
 মস্তিষ্কের ক্ষীণ-বুদ্ধির অগোচর, অলৌকিক অনির্বচনীয় ভাবাতীত—
 কর্তার বহুদূরে অবস্থিত, মানব-ধারণার অতীত পদার্থ। তবে শাস্ত্রে
 বলে, এই যে অনন্ত সংসার-সাগর, ইহার পরপারে জ্যোতির্ময় পরমপদ
 বিद्यমান।

তদ্বিক্ষেপঃ পরমং ধাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে।

তস্মিন্ বন্ধ-বিনির্মুক্তাঃ প্রাপ্ত্ব বন্তি সুখং পদম্ ॥

তৎপ্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তস্মামোক্ষ উদাহৃতঃ।

মোক্ষং পরং পদং দিব্যমমৃতং বিষ্ণু মন্দিরম্ ॥

নিত্যঞ্চ পরমং দ্যোম সর্বোৎকৃষ্টং সনাতনম্।

পর্য্যায় বাচকাত্মশ্চ পরধামোহচ্যুতশ্চ চ ॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর। ২২৭

ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরি ত্রিতাপহারি ভগবান্
 শ্রীবিষ্ণুর ঐ পরম পদ পরম ধাম মোক্ষ বলিয়া আখ্যাত হয়। ঐখানে
 বন্ধ-বিমুক্তি ও সুখাস্পদ প্রাপ্তি হয় এবং তথায় গমণ করিলে, পুনরাবর্তি

হয় না ; এজন্য উহা মোক্ষ বলিয়া উদাহৃত হইয়া থাকে । মোক্ষ, পরম পদ, দিব্য, অমৃত, নিষ্কমন্দির, অক্ষর, পরমধাম, বৈকুণ্ঠ, শাস্ত্রত-পদ, নিত্য, পরমব্যোম, সর্বোৎকৃষ্ট ও সনাতন,—এই সকল ঐ অচ্যুত মোক্ষপদ পরমব্যোমের পর্যায়াবচক । ঐ স্থানে যে শুভদর্শন সনাতন সাধ্য ও বিশ্বদেব বাস করেন, তাঁহারা সর্বদা ঐ পরম পদের মহিমা কীর্তন করিয়া থাকেন । উহার পঞ্চাশৎ কোটি যোজন নিম্নে প্রকৃতি-সম্ভূত অথগু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিद्यমান অর্থাৎ পাতাল হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । সেই ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে উজ্জল-সম্মোহন বৈকুণ্ঠধাম ; সেটি ব্রহ্মাণ্ড হইতে পৃথক্ । জ্যোতির্শ্ময় বৈকুণ্ঠ ধাম নারায়ণের আয় নিরন্তর সত্য-স্বরূপ ; আবার, জ্যোতির্শ্ময় বৈকুণ্ঠের পঞ্চাশৎকোটি যোজন উর্দ্ধে কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্শ্ময় গোলকধাম, গোলকও নারায়ণের আয় নিত্য ও সত্য-স্বরূপ । এই যে অনন্ত-বৈচিত্রশালিনী বন-বনাস্ত-পরিশোভিতা নানাজীব-সঙ্কুল মন্দর-ভূধর-সাগরাস্বরী শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী ভূতধাত্রী ধরিত্রী, ইহার উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক এবং সপ্ত স্বর্গলোক ; ইহার নিম্নে সপ্ত-পাতাল ;—এই সমস্ত লইয়া ব্রহ্মাণ্ড । এই সপ্তদ্বীপ-সমষ্টিতা সপ্ত-সাগরাস্বরী মহোরত-ভূধর-নিকর-পরিশোভিতা শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী অনন্ত অসীম ধরিত্রীই ভূলোক, ইহার উর্দ্ধে ভুবলোক, তাহার উর্দ্ধে স্বলোক, তাহার উর্দ্ধে মহলোক, তাহার উর্দ্ধে জনলোক, তাহার উর্দ্ধে তপোলোক, তাহার উর্দ্ধে সত্যলোক, তাহার উর্দ্ধে তপুকাঞ্চন-সন্নিভ ব্রহ্মলোক । এই ভূরাদি ব্রহ্মলোক কৃত্রিম; ধরার বিনাশ হইলে, এই সমস্ত লোকই বিনষ্ট হইবে । সুতরাং এই অথগু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জল-বুদ্দের আয় অনিত্য ; কিন্তু, গোলোক এবং বৈকুণ্ঠলোকই নিত্য ও অকৃত্রিম । পূর্বোক্ত ভূরাদি সপ্তলোকের মধ্যে ব্রহ্মলোক জ্যোতিষ্মান, তদ্ব্যতীত অত্যাশ্রয় প্রকৃতিগত লোকসকল ঘোর অন্ধকারময় । এই সপ্তলোক

সুগম সাধন পন্থা।

১৫৯

সনাতনী প্রকৃতি-সমুত্তা এবং প্রকৃতিই সর্বজগতের আধারভূতা, ভগবান্ শ্রীহরির আশ্রয়-স্বরূপা ; ভগবান্ তাঁহারই সহিত সর্বদা জগতের সৃষ্টি-প্রলয় বিধান করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীহরির ক্রীড়া করিবার জন্য ঐ জগৎ-প্রসবিনী মহামায়া ত্রিগুণাধিতা প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ প্রকৃতিতেই জগতের নিত্য লয় এবং তাহা হইতেই পুনঃ উদ্ভূতি হইয়া থাকে। ঐ জগন্ময়ী ত্রিগুণাধিকা সনাতনী প্রকৃতির স্থান অসংখ্য, ঐ সকল স্থান ঘনাক্ষকারময় ও অব্যয় ; — উহার উর্দ্ধ সীমায় সনাতনী বিরজা বিরাজিতা ; কিন্তু অধোদেশে নিঃসীম। তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম অবস্থাভেদে সর্বজগৎ ধারণ করেন ; তাঁহার বিকাশাবস্থা জগতের সৃষ্টি এবং সঙ্কোচাবস্থা লয় বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপে সর্বজগৎ প্রকৃতির অন্তর্গত জানিবে। তাহার পর সমস্তই প্রকৃতির গর্ভগত মহাকাশ। ইহাই হইল প্রকৃতিরূপা বিভূতির উত্তম রূপ, ইহা ব্যতীত ত্রিপাদবিভূতির রূপ আবার অতি চমৎকার ! — প্রধান অর্থাৎ ত্রিগুণা-ধিকা প্রকৃতি ও পূর্বোক্ত পরম ব্যোমের মধ্যে বিরজা নদী বিজ্ঞমানা ; — ঐ শুভা বিরজা বেদাঙ্গ হইতে জাত শ্বেদ-জল দ্বারা প্রবাহবতী। তাহার পরপারে মহাকাশ, সেই মহাকাশে সনাতনী ত্রিপাদ-বিভূতি বিজ্ঞমানা। ঐ ত্রিপাদ-বিভূতি অক্ষর ব্রহ্মপদ ; উহা অমৃত, শাস্ত, নিত্য, অনন্ত, পরম, শুদ্ধ, সত্ত্বময় ও দিব্য। উহার অব্যয় কাস্তি অনেক কোটি সূর্য্য ও বহির ত্রায় ; উহা সর্ববেদময়, শুদ্ধ, সৃষ্টি-লয়-হীন, সংখ্যাভীত, অজয়, নিত্য, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-বিবর্জিত, হিরন্ময়, মোক্ষাস্পদ, ব্রহ্মানন্দ-সুখাবহ, সমানাধিক্য-রহিত, আত্মস্থহীন, শুভ এবং তেজোদ্বারা অদ্ভুত রম্য ও নিত্য-আনন্দ-সাগর। বিষ্ণুর পরমপদ এই সকল ও অত্যাশ্রয় নানাগুণে সমন্বিত ; উক্ত ত্রিপাদ-বিভূতির লোক অসংখ্য বলিয়া কথিত হয়। ঐ সকল লোক শুদ্ধ সত্ত্বময়, ব্রহ্মানন্দ-সুখ-সম্পন্ন, নিত্য, নির্বিকার, হেয়-রাগাদি-বিবর্জিত, হিরন্ময়, শুদ্ধ, কোটিদিব্যকরপ্রভ,

বেদময়, দিব্য এবং কাম-ক্রোধাদি-বিহীন। তাঁহারা ভক্তি-রসদ্বারা একমাত্র ভব-পারাবারের কাণ্ডারী সংসার-সাগর তরি ভগবান্ নারায়ণ পদা-নুজের সেবা করেন; নিরন্তর সান্নিধ্য করিয়া পরম-সুখে—চির-শান্তিতে—পূর্ণানন্দে মগ্ন থাকেন। সকলেই পঞ্চোপনিষৎ-স্বরূপ ও বেদচর্চা; বেদময় দিব্য নারী পুরুষ দ্বারা পরিবৃত্ত; একমাত্র বেদগণই যাহার জল; এইরূপ রম্য সারোবর সমূহ দ্বারা উপশোভিত। উহা শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্ররূপ স্থাবর-সমষ্টিত।

বিরজাপরমব্যোমোরন্তরং কেবলং স্মৃতম্।

তৎস্থানমুপভোক্তব্যমব্যক্তব্রহ্মসেবিনাম্॥

স্বাত্মানুভবজ্ঞানন্দ সুখদং কেবলং পদম্।

নিঃশ্রেয়সঞ্চ নির্বাণং কৈবল্যং মোক্ষ উচ্যতে॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর। ২২৮

বিরজা ও পরম ব্যোমের মধ্যবর্তী স্থানকে 'কেবল' বলে; অব্যক্ত ব্রহ্মের সেবকগণই ঐ স্থান উপভোগ করেন। ঐ কেবল পদ আত্মানুভবজ্ঞানন্দ-সুখদ, নিঃশ্রেয়স ও নির্বাণপদপ্রদ,—এজন্য সেই কেবলপদকে কৈবল্য মোক্ষ বলা হয়। যাহারা একমাত্র ভক্তিরস দ্বারা ভগবান্ শ্রীপতির অজ্বল্যুগলের সন্তোগ-বিমুখ, সেই মন্দমতি অভক্ত অভাজনগণ সুখ-বিবর্জিত মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করে; আর, ভগবৎ-পাদসেবক মহাত্মা মহাভাগগণ ব্রহ্মসুখপ্রদ সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরমধামে গমন করেন। ভগবান্ শ্রীহরির পরমধামের নাম বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ নানা প্রকার রত্নময় প্রাকার ও সৌধ-সমষ্টিত। তন্মধ্যে এক দিব্য নগরী আছে, ঐ নগরী মণি ও কাঞ্চনের নানাচিত্রে সমৃদ্ধ এবং বহুপ্রকার তোরণ-সমষ্টিত। ঐ পুরীর মধ্যস্থানে ভগবান্ শ্রীহরির মনোহর মণ্ডপ বিদ্যমান; ঐ মণ্ডপ—মণিময় প্রাকারযুক্ত, রত্ন-তোরণ-শোভিত, বহুবিমান, উত্তম গৃহ, প্রাসাদ দ্বারা সমলঙ্কৃত। ঐ মহোচ্চ

সুগম সাধন-পন্থা।

১৬১

মণ্ডপের নাম রাজস্থান, ঐ শুভ স্থান, রত্নময়, সহস্র মণি-মাণিক্য-সুভূ-
-যুক্ত, দিব্যযুক্তা-সমাকীর্ণ এবং সামগানে পরম রমনীয়। উহার মধ্যে
সর্ববেদময় সুরম্য শুভ সিংহাসন বিद्यমান। ঐ সিংহাসন বেদময়াদ্বক
ধর্মাদি দেবগণ,—ধর্ম্য, জ্ঞান, মহৈশ্বর্য, বৈরাগ্য, পাদবিগ্রহ, ঋক্,
যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই সকলে যথাক্রমে নিত্য পরিবৃত। শক্তি,
চিহ্নক্তি, সদাশিবা, এবং ধর্ম্যাদি দেবতাগণের পৃথক পৃথক শক্তি উহার
আধার-শক্তি। উহার মধ্যে বহি, সূর্য্য ও চন্দ্র বাস করেন এবং কুর্ম
নাগরাজ, বৈনতেয়, বেদাধিপ, মন্ত্র-সমূহের ছন্দ,— ইহারা ঐ সিংহাসনের
পীঠস্থ প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। ঐ পীঠ সর্বাক্ষরময় দিব্য
যোগপীঠ নামে অভিহিত। সিংহাসন মধ্যে নবোদিত আদিত্যপ্রভ অষ্ট-
দল পদ্ম বিद्यমান; তন্মধ্যে সাবিত্রী নাম্নি কর্ণিকায় ঈশ্বরীর সহিত পরম
পুরুষ দেবেশ ভগবান্ শ্রীহরি সমাসীন। তিনি ইন্দীবর-দল-শ্রীম কোটি
-দিবাকরতুল্য দীপ্তিশালী, তাঁহার যুবা, কুমার, স্নিগ্ধ কোমল কায়; তাঁহার
প্রফুটিত রক্তপদ্মপ্রভ সরোজবৎ কোমলাঙ্গি,— তাঁহার প্রবুদ্ধ পুণ্ডরীকাক্ষ
উত্তম ফলতায়ুগাঙ্কিত সুনাস,—তাঁহার আরক্তিম সুকপোল ও সুশ্রোত্র
এবং তিনি কমলানন। তাঁহার দশন যুক্তাফলাভ, অধর সম্মিত ও
বিজয়-রক্তিমবর্ণ পূর্ণচন্দ্রতুল্য এবং মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত। তাঁহার
কর্ণ তরুণাদিত্যবর্ণ কুণ্ডলদ্বয়ে মণ্ডিত, তিনি সুস্নিগ্ধ নীলবর্ণ কুটিল-কুণ্ডলে
উপশোভিত, মন্দার ও পারিজাত প্রসূনে তাঁহার কেশ কবরীকৃত;
তিনি নবোদিত-দিবাকরপ্রভ কৌমুদমণিতে বিভূষিত, তাঁহার কন্যকর্ণ-
হার ও সুবর্ণমালায় বিলম্বিত এবং তিনি সিংহ-স্বয়ং-কাস্তি, উচ্চ ও স্থল
স্বয়ং-সমবিত। তাঁহার ভূজচতুষ্টয় স্থল ও দীর্ঘ; তিনি অঙ্গুরীয়ক,
কটক ও কেয়ুর দ্বারা পরিশোভিত এবং কোটি-বারাক-কাস্তি কৌমুদাদি
উত্তম বিভূষণ ও বনমালা দ্বারা তাঁহার সুবিশাল বক্ষঃস্থল বিভূষিত।
তাঁহার নাভিদেশে এক দিব্য সরোজ শোভমান, ঐ সরোজ মহামহিমাবিত

সৃষ্টিকুশল বিধাতার জন্মস্থান। তাঁহার নখ-পংক্তি উত্তম জ্যোৎস্না-যুক্ত পূর্ণচন্দ্রপ্রভ, তিনি কোটিকন্দর্পের লাবণ্যযুত এবং তাঁহার উজ্জল-সন্মোহন দিব্যদেহ হইতে কোটিসূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটিচন্দ্রোৎফুল্ল আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে; তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্যের নিধি। বাস্তবিক,—

তং কৈশোরং তচ্চ বক্তারবিন্দং,
তত্ত্বাক্রণ্যং তে চ লীলাকটাক্ষাঃ ।
তৎ সৌন্দর্য্যং সা চ সান্দ্রস্মিতঃ শ্রীঃ,
সত্যং সত্যং দুর্লভং দৈবভেদহপি ॥

কৃষ্ণকর্ণায়ুত । ৫৫

তিনি চির-যৌবনে বিভূষিত; তাঁহার সে রূপের সৌন্দর্য্য, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য স্বর্গলোকের কথা কি কহিব,—কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটিচন্দ্রোৎফুল্ল চির-উজ্জল চির-জ্যোতিষ্মান বৈকুণ্ঠস্থ দেবগণেও সুদুর্লভ। তাঁহার সেই—“কোটিসূর্য্যপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটিমুশীতলম্” কৈশোর শ্রীমুখারবিন্দ অতি সুন্দর!—অতি মনোহর! তাঁহার সেই কারুণ্যময় লীলার কটাক্ষ দেবলোকে দেবগণেও সুদুর্লভ;—সে সৌন্দর্য্য, —সেই সান্দ্রস্মিত ঈষৎ মুদ্রহাস্ত কি সুন্দর!—অতি মনোহর! মোটের উপর,— তাঁহার সকলই সুন্দর!—অতি মনোহর! তাঁহার রূপের অস্ত ও সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্যধার; তাঁহার রূপের উপমার যোগ্য —“ন পৃথিব্যাং তিষ্ঠতি নাস্তরীক্ষে, নৈতৎ সমুদ্রে সলিলং বিভর্তি।” অনন্ত বৈচিত্র্যশালিনী শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবীতে অথবা অস্তরীক্ষে এমন কেহই বা কিছুই পদার্থ নাই, যাহা দ্বারা তাঁহার উপমা দিয়া তোমার বুঝাইতে পারি; এমন কি তাঁহার—‘নবনীলদনীলতরু’র দিব্যদ্যুতি এমন সৌন্দর্য্য প্রতিকলিত হইতেছে যে, এই অনন্ত নীলিমাময় অনন্ত

মহার্গবের নীলাশ্বরাশিতে তাহার উপমা কোনমতে হইতে পারে না ।

ন তারকাষু ন চ বিদ্যাদাশ্রিতং,

ন চান্দ্রেষু দৃশ্যতে রূপমস্তু ।

ন চাপি বায়ৌ ন চ দেবতাসু,

নৈতচ্ছন্দ্রে দৃশ্যতে নোত সূর্য্যে ॥

মহাভারত । উদ্যোগ ।

তাহার দিব্যদেহের দিব্যজ্যোতি উজ্জ্বল কাস্তির সাদৃশ্য হীরক-খণ্ড-প্রদীপ্ত তারকামালায়ও দৃষ্ট হয় না ; তাহার দিব্যজ্যোতির সাদৃশ্য নবনীরদনীলিম মাঝে চাকুহাসিনী সৌদামিনী চকিতোজ্জ্বলা বিদ্যামালায়ও দৃষ্ট হয় না ; তাহার দিব্য শরীরের দীপ্তির সাদৃশ্য অনন্ত আকাশে নভোমণ্ডলে নানাবর্ণানুরঞ্জিত অনন্ত মেঘমালায়ও দৃষ্ট হয় না ; তাহার দিব্য কলেবরের পরম জ্যোতির তেজঃ দীপ্তি বায়ুমণ্ডলেও দৃষ্ট হয় না ; তাহার চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান দিব্য দেহের তুল্য উজ্জ্বল-সম্মোহন দেহ প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ স্বর্গলোকে তেত্রিশকোটি দেবতার মধ্যেও দৃষ্ট হয় না ; এমন কি, তাহার জ্যোতির্ময় দিব্যদেহ হইতে যে উজ্জ্বল-সম্মোহন জ্যোতি-রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে ; তাহা এই জ্যোতিষ্ক-জীবন মধ্যাহ্ন-তপন সূর্য্যে বা শারদীয় পৌর্ণমাসীর পূর্ণ শশধরের প্রাণ-বিমোহন প্রভায়ও দৃষ্ট হয় না ।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্,

নেমা বিদ্যতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্ব্বং,

তস্ম ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ।

তঁাহার উজ্জল-সম্মোহন জ্যোতির্শ্রম্য দিব্য-দেহের দিব্যত্বাতি পরমপদ বৈকুণ্ঠধামকে আলোকিত করিয়া দ্রুত-বিচ্ছুরিত রশ্মিজালকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, দিগ্-দিগন্তে বিচ্ছুরিত হইয়া, পরমপদ বৈকুণ্ঠকে জ্যোতির্শ্রম্য করিয়া রাখিয়াছে। ঐ যে অনন্ত আকাশে জ্যোতিষ্কগণে—জ্যোতির-জ্যোতিঃ—উজ্জলতার কৌস্তভ-মণি আলোকের পবিত্র রশ্মি জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য ; ঐ যে শারদ লক্ষ্মীর নির্মল নীলমাকাশে প্রসন্ন-স্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন জ্যোৎস্না-হাসিরাশি বিকশিত নয়ন-মনোরঞ্জন পূর্ণমাসীর পূর্ণচন্দ্র; ঐ যে অসীম আকাশে অনন্ত নীলাম্বরে উজ্জল-সম্মোহন হীরকখণ্ড-প্রদীপ্ত গগন-গহনা নিশা-ভূষণ তারকানিকর ; ঐ যে অনন্ত নীলাকাশে নব-নিরদ-জলদ-জ্বলে চারুহাসিনী সৌদামিনীর হাস্যচ্ছটা বিদ্যুন্নতার উদীপ্ত বিকাশ ; —এই জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের জ্যোতিষ্ক-পদার্থের কোনটিই সেই চির-উজ্জল চির-জ্যোতিষ্মান্ উজ্জল-সম্মোহন কোটিসূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্শ্রম্য পরমপদ বৈকুণ্ঠধামকে প্রকাশ করিতে অর্থাৎ আলোকিত করিতে পারে না ; সুতরাং উহাদের অপেক্ষা হীন-তেজঃ ক্ষীণপ্রভ সামান্য ভৌমাদি অগ্নির কথা আর বিশেষ করিয়া কি কহিব ? —সেই স্বতঃই উজ্জল, স্বতঃই প্রদীপ্ত, স্বয়ং-প্রকাশ উদীপ্ত জ্যোতির্শ্রম্য সৌন্দর্য্যধার ভগবান্ শ্রীহরির দিব্য জ্যোতিঃতেই, সৌর-জগতের এই জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ ও অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিষ্ক পদার্থ জ্যোতিষ্মান্ হইয়া, দেদীপ্যমান হইতেছে। বস্তুতঃ—“তস্মা ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি” বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ, কি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল, কি জ্যোতিরিন্দ্রসকল, কি জ্যোতির্বিব্দুসমূহ, কি সমস্ত জ্যোতিরাত্মা, সেই জ্যোতির্শ্রম্য ভগবানের দিব্যত্বাতিতেই উদ্ভাসিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ সেই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর বৈকুণ্ঠনাথ গোলকপতি ভগবান্ শ্রীপতির অদ্ভুত স্বতঃ-জ্যোতির্শ্রম্য কমনীয়-কাস্তি দিব্যদেহের জ্যোতির কণামাত্র

শ্রুগম সাধন-পন্থা ।

১৬৫

জ্যোতিঃতে উদ্দীপ্ত হইয়া, এই অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিষ্কমণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে ।

বৃহচ্ছরীরোহণিসমানরূপো—

যুবাকুমারত্বমুপেষিবান্ হরিঃ ।

রেমে শ্রিয়াসৌ জগতাং জনন্যা,

স্বজ্যোৎস্নয়া চন্দ্র ইবামৃতাত্মকঃ ॥

পদ্মপুরাণ । উত্তর । ২২৭

নয়ন-মনোরঞ্জন অমৃত-কিরণ চন্দ্র যেরূপ স্বীয় হাসিরাশি স্নিগ্ধ-ধবল জ্যোৎস্নার সহিত রত থাকেন, এই জ্বলন্ত জ্যোতিঃপিণ্ড অগ্নিসমানরূপী বৃহৎশরীরী বিশ্বেশ্বর-বিশ্বরূপ বিরাটপুরুষ ভগবান্ শ্রীহরিও তদ্রূপ যৌবন ও কোমার পরিগ্রহ করিয়া, রূপময়ী সৌন্দর্য্যময়ী নব-যৌবন-সম্পন্ন অলোকসামান্য। কমলীয়া-কোমলা অসাধারণ-লাবণ্যময়ী নিখিল সৌন্দর্য্যের সারভূতা জগজ্জননী রমার সহিত রমণ করেন । তাঁহার লাবণ্য কোটি কন্দর্পের ত্রায়, তিনি কখন কোমার ও কখনও নিত্য যৌবনাবস্থ হইয়া, জগদীশ্বরীর সহিত পরম পদে অবস্থিত হন । তাঁহার ভোগার্থ মহাকাশ ও লীলার জন্ত সমগ্র জগৎ কল্পিত । লীলাময় লীলা-বিহারী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ভোগ ও ক্রীড়া দ্বারা এই বিভূতিদ্বয়ের সংস্থান হইয়াছে । যখন তাঁহার ভোগে অর্থাৎ মহাকাশে নিত্য স্থিতি হয়, তখন তিনি লীলা অর্থাৎ সমগ্র জগৎ হরণ করেন ; তিনি মহাশক্তি-সম্পন্ন তাই ভোগ ও লীলা—এই উভয়কেই ধারণ করিতে পারিয়াছেন । তাঁহার পরমধামে ত্রিপাদ্ এবং ত্রিলোকে একপাদ বিভূতি বিদ্যমান ; তাঁহার এই ত্রিপাদ্ বিভূতিই নিত্য ; আর, একপাদ ঐশ্বরিক বিভূতি অনিত্য । তাঁহার স্বরূপ কখন লক্ষ্য ও কখন অলক্ষ্য ; তিনি সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন । তিনি অনন্ত জগতের

অনন্ত উদ্বে—অনন্ত যোজন দূরে নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে অবস্থিত হইয়াও, সর্বদা জগতের অনগে অনিলে-সলিলে,—পাদপে-প্রান্তরে-প্রস্তরে,—অনন্তে-আকাশে-অবনীমণ্ডলে,—জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম বিশ্ব-চরাচরে সর্বত্র, এমন কি পৃথিবীর আসমুদ্র হিমালয়ের বালুকণাটির অভ্যন্তরেও বিद्यমান রহিয়াছেন। তিনিই এই বিরাট-বপু অথগু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের আধার ; তিনি সর্ববিধ সঙ্কল্পের অতীত হইয়াও আবার, সমুদয় সঙ্কল্পের আধার ; তিনি সর্বময়,—অথচ সর্ব নহেন ; তিনি দিক্, কাল প্রভৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন ; কিন্তু আবার, তিনিই নিখিল ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছেন ; তিনি সর্বকলাতীত হইয়াও, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল পদার্থের অভ্যন্তরে অবস্থিত ; বৈকুণ্ঠনাথ গোলকপতি ভগবান্ শ্রীপতি এইরূপে তদীয় পরম পদে মুদিত হইয়া রহিয়াছেন। সেখানে আরও অনেক প্রকার আশ্চর্য্য অনির্বচনীয় ভাব বিद्यমান আছে যে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না ; সেখানে আকাশে জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য আছে ; কিন্তু, সূর্য্যের অন্ত নাই ; নয়ন-মনোরঞ্জন চন্দ্র আছে ; কিন্তু, চন্দ্রের হ্রাস নাই ; সেখানে বসন্ত ঋতু আছে ; কিন্তু, বসন্তের বিরাম নাই ; কাল আছে ; কিন্তু, কালের অন্ত নাই। সেখানে উদ্ভেজক বাক্য আছে,—ভাবসূচক বাক্য আছে ; কিন্তু, হিংসা নাই ; পুরুষ বাক্য আছে ; কিন্তু, ক্রোধ নাই ; তনয়তা আছে ; কিন্তু, মোহ নাই। সেখানে জীবন আছে ; কিন্তু, মৃত্যু নাই ; যৌবন আছে ; কিন্তু, বার্দ্ধক্য নাই ; বিশ্বাস আছে ; কিন্তু, শ্রম নাই ; শান্তি আছে ; কিন্তু, সংগ্রাম নাই। সেখানে জ্ঞান আছে ; কিন্তু, অজ্ঞান নাই ; প্রেম আছে ; কিন্তু, বিরহ নাই ; সাধুতা আছে ; কিন্তু, শঠতা নাই ; আনন্দ আছে ; কিন্তু, আক্ষেপ নাই। সেখানে দুঃখ নাই বা দুঃখের কান কারণই নাই ; থাকিলেও পরমবিভূ পরমেশ্বর সর্বসুখাস্পদ বৈকুণ্ঠনাথ গোলকপতি, অলৌকিক শক্তিবলে দুঃখের কারণগুলিকে পর্য্যন্ত আনন্দের ছাঁচে ঢালিয়া, সুখময় শান্তিময় আনন্দ-

সুগম সাধন-পন্থা ।

১৬৭

ময় করিয়া রাখিয়াছেন । মোটের উপর বুঝিয়া রাখ,—

ন যত্র রোগো ন ভয়ং ন শঙ্কা,
 ন যত্র জাড্যং ন চ তাপসঞ্চয়ঃ ।
 ন যত্র শোকো ন বিধিনিষেধো—
 ন যত্র মোহো ন চ বৈ প্রমাদঃ ॥
 ন যত্র বার্কিং জরয়াবসন্নং,
 ন যত্র তৃষ্ণাকুলিতঞ্চ যৌবনম্ ।
 ন যত্র বাল্যং তপসাবিগাঢ়ং,
 ন যত্র শক্তিঃ পরপীড়নাঢ্যঃ ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ । ৬১

যেখানে শরীর আছে; কিন্তু, আধি-ব্যাধির উপজব নাই,—সকলেই নীরোগ শরীরে নিরাময় হইয়া বাস করেন ; যেখানে ভয়ের কোন লেশমাত্র নাই,—সকলেই “বিগতভীঃ” হইয়া, সতত নির্ভয়ে বিচরণ করেন । যেখানে কোন প্রকার শঙ্কা নাই,—সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে কালযাপন করেন । যেখানে শরীর আছে ; কিন্তু, জড়তা নাই ; জড়তা কাহাকেও জড়ীভূত করিতে পারে না ; যেখানে শরীরী আছে ; কিন্তু, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক প্রভৃতি তাপত্রয়ের উত্তাপ নাই ; কেহ কদাপি তাপত্রয়ে সম্বৃত হন না, সকলেই নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করেন ; যেখানে শরীর আছে, অজস্রধারে অশ্রুপ্রবাহে সকলেই বক্ষঃপ্লাবিত করে ; কিন্তু, কেহ কাঁদে না,—পুনঃপুনঃ চক্ষুঃনীরে অজস্রধারে বক্ষঃ প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করেন ; কিন্তু, কেহই শোক করেন না বা কেহ বিষ্মত হন না,—বরং নিব্বাক হইয়া, এমন এক অলৌকিক সুখ-শান্তি-আনন্দময় অনির্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া পড়েন যে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না । মোটের উপর যেখান শোকের লেশমাত্রও নাই,

কাহাকে কখনও শোকাভিভূত হইয়া, হাহতাত্ত্বের দীর্ঘশ্বাসে ব্যথিত হইয়া; আন্তরিক মর্শ্ববেদনার তীব্র দুঃখের তাড়নে অজস্র শোকাঙ্কিতে বক্ষঃ প্রাণিত করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে করুণ বিলাপ করিতে হয় না। যেখানে এই প্রকৃতিরাজ্যের মত বিধি-নিষেধের বিধি-ব্যবস্থা নাই, কাহাকেও বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হয় না,—সকলেই বিধি-নিষেধের গণ্ডীর বহির্ভূত হইয়া,—“কো বিধিঃ কো নিষেধঃ” নিশ্চয় স্তব্ধভাবে স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন। যেখানে মোহের মহিমা নাই, মোহ কাহাকে বলে, তাহাও কেহই জানেন নাই ;—যেখানে মোহেরও মোহ উপস্থিত হয় ; নিশ্চয়ই হইয়া সকলেই মায়া-মমতার গণ্ডীর বাহিরে অনন্ত দূরে মহিমাময়ের মহিমায় অভিভূত হইয়া; সতত আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন থাকেন। যেখানে প্রমাদ নাই,—সকলেই জ্ঞানবান্ ও বিরাগরসিক হইয়া, অপ্রমাদে ভগবদ্ভাবে নিরন্তর বিভোর হইয়া, ধীর ও স্থির থাকেন। যেখানে বার্কক্য নাই,—কাহাকেও জরা কতৃক জর্জরিত হইয়া, হাহতাত্ত্বের দীর্ঘশ্বাসে নভস্তল বিদৌর্ণ করিতে হয় না ; সকলেই জরাকে জয় করিয়া, সতত যৌবনের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, সদানন্দে জীবন যাপন করেন ; কদাপি—“জরয়াব সন্ম” হইতে হয় না। যেখানে তৃষ্ণা নাই ; কাহারও হৃদয়ে ধন-তৃষ্ণা যশোলিপ্সা, উচ্চপদাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির দৌরাভ্যা নাই,—সকলেরই বাসনা বিজিত, আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত, কল্লনা প্রত্যক্ষ ; সকলেই আপ্যকাম হইয়া কাল যাপন করেন। যেখানে যৌবনের দৌরাভ্যা নাই ; অসার আয়ুর উন্নতভায়ে, যৌবনবিজ্জ্বলিত মোহের বশে আকুলিত যুবকের গ্রাস,—“হৃদয়ভৃগুকুটীরে দহমানো অরার্যো” হইয়া, “যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশস্তি নাশায় সমুদ্রবেগাঃ” যেমন সমুদ্র-বেগশালী পতঙ্গ সকল বিনাশের নিমিত্ত অতি প্রদীপ্ত হত্যাশন মধ্যে প্রবিষ্ট হয়,—“তথৈব নাশায় বিশস্তি লোকাঃ” তদ্রূপ কামিনীর অলস রূপ-বহিতে ঝাঁপ দিয়া বিনষ্ট হইতে অর্থাৎ প্রাণ বিসর্জন করিতে হয় না। যেখানে তপস্তার অন্তরায়

শুগম সাধন-পন্থা ।

১৬৯

বাল্যভাব নাই, সকলেই ইচ্ছিয়-সৌষ্ঠব চির-যৌবন লাভে ভগবদ্ভজনা-
—ভগবৎ-পদ-পঙ্কজের সেবায় সতত নিরত রহিয়াছেন। যেখানে পর-
-গীড়ন-শক্তির প্রতিপত্তি নাই,—সকলেই সমান শক্তি, সর্বশক্তি-
সম্পন্ন ; পর-গীড়নে ব্যথিত হইয়া, মর্শ্ব-গীড়ায় জর্জরিত হইয়া,
কাহাকেও হিংসা-দ্বেষের প্রজ্বলিত বহ্নিতে হিংসা-দ্বেষের প্রতিশোধে প্রাণ
বিসর্জন করিতে হয় না,—সকলেই হিংসা-দ্বেষাদি দোষ রহিত হইয়া,
সদানন্দে মগ্ন থাকেন ; তাহাই চির-সুখ-শান্তিময়—ব্রহ্মানন্দ-সুখাস্বয়
পরমপদ বৈকুণ্ঠধাম। সেখানে আনন্দের উজ্জ্বললোক সতত বিচ্ছুরিত,
ভাবের ধীর-মহুর তরঙ্গ-লহর নিরন্তর প্রবাহিত, স্নিগ্ধ-মধুর স্নেহ-
কম্পমান—মুহূর্ত্ত বসন্ত-মদিরানিল প্রাণ-হিল্লোলময়, সেখানে অনাবিল
সুস্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় আনন্দালোকে দিগ্দিগন্ত সতত উদ্ভাসিত, নিরবচ্ছিন্ন
আনন্দের সৌগন্ধে প্রত্যেক অণু-পরমাণু পরিমণ্ডিত এবং স্বাধীনতার
বিজয়-বৈজয়ন্তী সর্ববাদই উড্ডীয়মান ; লীলাময়ী প্রকৃতিদেবীর সসীম
রাজ্যে আয়ুঃ শেষে জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেখানেও আয়ুঃ শেষ
হয় ; কিন্তু, কেহ মরে না,—পরম কারুণিক পরমেশ্বর বৈকুণ্ঠনাথ
গোলকপতি তাঁহাদিগকে অমর—অমৃত করিয়া রাখেন। মোক্ষাস্পদ,
ব্রহ্মানন্দ-সুখাবহ, সমানাধিকার-রহিত, আত্মস্ব-বিহীন ভেজোদ্বারা অদ্ভুত
রম্য ও নিত্য আনন্দসাগর বিষ্ণুর পরমপদ এই সকল ও অত্যাশ্র
নানাগুণে সমন্বিত ; কোটি কল্পকালেও তাহার বর্ণনা করা যায় না। এমন
কি, মহাযোগী মহেশ্বর, মহামহিমাবিত বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা কিংবা ত্রিকালজ্ঞ
মুনিশ্বর সকলেই সেই পরমপদের বর্ণনা করিতে অসমর্থ। যাহা অক্ষর
ও বেদগুহ্য, যাহাতে সবিশ্ব দেবগণ বিষম, সেই দেবগণও যাহার যৎ-
কিঞ্চিৎ তত্ত্ব বিদিত, তবে বল দেখি—ঋক্ তাহার কি বর্ণনা করিবেন ?

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ॥

যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ সংশিতব্রতাঃ ॥

দ্বৈয়ৈক মন্ত্রনিষ্ঠায়ৈ তে বৈ যাস্তি তদব্যয়ম্ ।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈ ন দানৈ ন ব্রতৈঃ শুভৈঃ ॥

ন তপোভি নীরাহায়ৈ ন চ সাধন কৰ্ম্মভিঃ ।

একেন দ্বয়মন্ত্রেণ তথা ভক্ত্যা স্বনশ্রয়া ॥

তদগম্য শাস্তং স্থানং প্রাপন্ত্য বৈ সনাতনম্ ॥

পদ্মপুরাণ । উত্তর । ২২৮

সেখানে এই সৌরজগতের জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য, চন্দ্র কিংবা পাবক প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক পদার্থ প্রতিভাত হয় না, সংশ্লিষ্টব্রত যোগিগণ যোগাসনে আজীবনকাল আরাধনে তথায় গমন করিয়া, পুনরাবর্তন করেন না এবং যাঁহারা নামদ্বয়াত্মক মন্ত্রে একনিষ্ঠ, তাঁহারাই সেই অব্যয় পদে গমন করেন । নতুবা কি চতুর্বেদাধ্যয়ন, কি অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-যাপন, কি বেদ-জ্ঞান, কি গো-হিরণ্য-ভূম্যাদি দান, কি কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, শুভ ব্রত, কঠোর তপশ্চা, কি অনশন, অর্দ্ধাশন ও একাশনাদি ও কি কখনও উর্দ্ধবাহু হইয়া, কখনও অধোমস্তকে রহিয়া, কখন এক পদে দাঁড়াইয়া কঠোর সাধন প্রভৃতি কৰ্ম্ম দ্বারা সে স্থান লাভ করা যায় না ; একমাত্র নামদ্বয়াত্মক মন্ত্র, ভক্তি ও শরণাগতি দ্বারা সেই সনাতন শাস্ত পদ প্রাপ্তি হয় ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

পরমপদে উপনীত মানবের পুনরাবৃত্তি হয় না কেন ?

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, অধুনা বলিলেন যে,—‘সৌভাগ্যবান্ পুরুষ পরমপদে উপনীত হইলে, তাঁহাকে আর এই জন্ম-জরা মৃত্যুর আকর দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না ; তিনি তথায় অমৃতত্ব লাভ করিয়া, চিরকাল বসবাস করেন ।’ সুতরাং পরমপদে উপনীত হইলে সৌভাগ্যবান্ পুরুষের পুনরাবৃত্তি হয় না কেন ?

তদব্যয়ং কলিলং গৃঢ়দেহং,

ব্রহ্মানন্দমমৃতং বিশ্বধাম ।

বদন্ত্যেবং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মনিষ্ঠা—

যত্র গচ্ছা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ॥

কুর্শ্মপুরাণ । উপরি । ৯

অসীম সুখমাকর এই সুবিশাল নরবাস ধরাধামে,—যাঁহারা অভিমান, মোহ ও পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিভ্রাশূচ্য বিরাগরসিক ভক্তিমান্ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, গুরু-গস্তীর ওজস্বিনী ভাষায় কহিয়াছেন ;—‘ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরি, ত্রিতাপ-হারী, চিরসখা,—“গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং মুহুৎ” ভগবান্ শ্রীহরির যে, অনন্ত-সৌন্দর্য্যধার ভাব-সৌন্দর্য্যের আকর, অনন্ত সম্পদের

কোষাগার, অফুরন্ত আনন্দ-ভাণ্ডার, পরমানন্দ-সন্দোহ-জনক, স্বাধীনতা-বিধায়ক, তাপত্রয় নির্মূলের পরম নিদান, চিরমুক্ত মহাপুরুষে শোভমান, চির-সুখ-শান্তির লীলা-নিকেতন, নিত্য শাশ্বত আনন্দ-ভবন, অব্যয় অক্ষয়, কলিল, গুটদেহ, ব্রহ্মানন্দ, অমৃত ও বিশ্বধাম নামে পরমপদ বৈকুণ্ঠধাম রহিয়াছে, তথায় এই সংসার-রূপ মহারণের সুদীর্ঘ বহ্নের পথ-প্রান্ত ক্লান্ত পথিক সৌভাগ্যবশে উপনীত হইলে, তিনি তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, পুনরায় এই জন্ম-জরা-মৃত্যুর আকর, অসুখকর মাটির মর্ত্যভূমে ফিরিয়া আসিতে পারেন না ; কারণ তথাকার আনন্দ-লাভে তিনি নিবৃত্ত হইতে পারেন না । সেই ভাগ্যবান মহাপুরুষ সৌভাগ্যবশে—তথায় উপনীত হইলে, লীলাময়ী প্রকৃতি-সুন্দরীর এই অনন্ত বৈচিত্রশালী শোভন-সৌন্দর্য্যময় সসীম রাজ্যের মধুময় মাধব, হান্তময়ী শরৎ, শস্যসম্ভারশালিনী প্রাবৃট্ট, সুবিমল কমল-শোভিত সরসী, কলনাদিনী কল্লোলিনী, শারদ-কৌমুদি-স্নাত বসুধা, ওরুণ তপনের অরুণচ্ছটা, বিহঙ্গমকুলের কোমল কাকলী, নিদাঘ-সন্তাপহারী শ্রীখণ্ডখণ্ড; রবিকর-সমুজ্জল মুদুগ ব্যাত্যান্দোলিত শস্যাবলী, নিরুপম নিকুঞ্জ-কাননের শত-সৌন্দর্য্য, কামিনীর-কমনীয় বদন-সুধাকরের অনিন্দ্য কান্তি, সমুদ্রের সুধা ধবলিত আকাশভেদী সৌধরাজি, প্রণয়োনাদেবের সযত্নরচিত প্রমোদ-কানন, বীণা-বেণু সারঙ্গ সপ্তস্বরায় সমবেত সুস্বর-লহরী, বিহগ-বীণা-বিনিন্দিত বামা-কণ্ঠের সুধা-স্বর-তরঙ্গ, আনন্দবর্ষী সাক্ষা-সমীরণ প্রভৃতি নিসর্গসুন্দর যাবদর্শ-সম্পদের কোষাগার ; এমন কি,—পার্শ্ব সুখৈশ্বর্য্য, যশোমান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, মহত্ত্ব-প্রভুত্ব প্রভৃতিও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয় । সেই সর্ব্বসম্পদের সর্ব্বসৌন্দর্য্যের পরমানন্দের লীলা-নিকেতনে উপনীত হইলে, সৌভাগ্যবান্ মুক্তাত্মা পুরুষ, অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হন ; তাঁহার ভাষা নির্বাক হইয়া যায়, বাসনা নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়গ্রাম

নিজামগ্ন হইয়া পড়ে ; তথায় উপনীত হইলে, মুক্তাত্মা পুরুষের দর্শনেশ্রিয় বাহ্যদৃষ্টিকে লুপ্ত করিয়া মনশ্চক্ষুতে জাগ্রত হইয়া উঠে, অন্তরের আনন্দময় আলোকে এক অপূর্ব আনন্দানুভূতিতে শরীর, মন, প্রাণ স্পন্দন-রহিত হইয়া পড়ে, অন্তরের জাগ্রচ্ছক্তি বাহ্যেশ্রিয়কে দুর্বল করিয়া, আকুল-আবেগে সাড়া দিয়া উঠে । তথায় সৌভাগ্যবান মুক্তাত্মা পুরুষ উপনীত হইলে, তাঁহার জীবন-সঙ্গীত আনন্দ-গুঞ্জে মুখরিত হয়, শোণিত-প্রবাহের বিপুল উদ্বেগের সঙ্গে প্রতি শ্বাসে শ্বাসে অমৃতধারা নিঃসৃত হয় । তথায় উপনীত হইলে আপ্তকাম মুক্তাত্মা পুরুষের স্বার্থের সন্ধীর্ণতা দূরে পলায়ন করে, বাসনার অনল, ইন্দ্রিয়ের তাড়না, রিপুর তাণ্ডব, আমিষের অহঙ্কার প্রভৃতি “সোহং” সমুদ্রে বিলুপ্ত হইয়া যায় ; তাঁহার ক্ষুদ্র মানব-জীবন অসীম উদার নীলাকাশের মত বিস্তৃতি লাভ করে ; তাঁহার চিত্ত বিশাল বারিধির উন্মুক্ত উচ্ছ্বাসের মত আকুল-আবেগে বিশ্ব-প্লাবিত করিয়া, পরমানন্দ-রস-সাগর রস-নাগর রসিক-চূড়ামণি রসনায়ক ভগবানের পানে ছুটিয়া যায় । তথায় উপনীত হইয়া, আপ্তকাম মুক্তাত্মা পুরুষ, সংসারের সুখৈশ্বর্য ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া, তন্ময় হইয়া, অলৌকিক অনির্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া, তথায় সতত বসবাস করিতে ইচ্ছা করেন । তিনি এমন এক অপূর্ব অলৌকিক অনির্বচনীয় আনন্দানুভবে মাতোয়ারা হন যে, তাহা তিনি সহজে ভুলিতে পারেন না, তাঁহার আনন্দ-লাভে নিবৃত্ত হন না । কেননা,—

রসো বৈ সঃ । রসং হ্যেবাং লব্ধ্বানন্দী ভবতি ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ।

তিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক প্রভৃতি ত্রিতাপের লয়স্থান, ভাবৈশ্বর্যের আধার, সুখ-শান্তির আকর, অমরন্ত আনন্দ-

ভাগ্য, রসময় রস-সাগর। তিনি পরমানন্দ রস-সাগর বলিয়াই, ঐকান্ত ভগবন্তক আত্মকাম আত্মতৃপ্ত মহাত্মার, তাঁহার অমৃত-স্বরূপ আনন্দ-রসের উপলব্ধি করিয়া, সুধাময় শান্তিরাসের আশ্বাদ পাইয়া, আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন থাকেন। রসময় রসসাগর রসনায়ক আনন্দময় পরম রস-স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় পরিপূর্ণতম আশুতাম মহিমাময় ভগবানের আনন্দ-রসের এমনই মহিমা যে, একবার সে রসের আশ্বাদ পাইলে, একবার সে রস উপলব্ধি করিলে, আর ক্ষুৎ-পিপাসা থাকে না, —কামনা-বাসনা থাকে না,—সকল কামনা পূর্ণ হয়, সকল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। সুতরাং মধুচক্রে মধুকরের ত্রায় তন্ময় হইয়া, সেই—
 “অধরং মধুরং বদনং মধুরং, হাসিতং মধুরং চলিতং মধুরম্। হৃদয়ং মধুরং বচনং মধুরম্, মথুরাধিপত্যেরখিলং মধুরম্॥” মধুপূর্ণ মধুজিত মধুরিপূর পদ-পঙ্কজ-পঙ্করাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহার কারুণ্যামৃতধারা তারুণ্যামৃতধারা লাবণ্যামৃতধারা শ্যাম-রস-মধুপানে, মধুরিমায় গরিমাময় হইয়া, মর্ত্যধামের সুখৈশ্বর্যকে তুচ্ছাদপি তুচ্ছজ্ঞানে হয়ে করিয়া, মধুময় আনন্দরস-সাগরেই মগ্ন থাকেন; তাঁহারা আর মরিবার জন্য মর্ত্যধামে ফিরিয়া আসেন না। আনন্দ-রস-সাগরে মগ্ন, রসময়ের পদপঙ্কজে সংলগ্ন ঐকান্ত ভক্ত অমৃত-রসের আশ্বাদ পাইয়া, প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া কহিতেছেন,—

“তৎ সাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাকি স্থিতস্ত মে।

সুখানি গোপদায়ন্তে ব্রাহ্মণ্যাপি জগদ্গুরো ॥

হরিভক্তিশুদ্ধোদয়।

‘হে জগদ্গুরো ! তোমার সাক্ষাৎ-লাভে আমি সান্ধানন্দ-সাগরে অর্থাৎ নিবিড়-ঘন-মুছ-স্নিগ্ধ-মনোজ-রস-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; এক্ষণে যোগিজনের জ্ঞানিগণের অভিস্মিত ব্রহ্মানন্দও আমার নিকট গোপদেব

সুগম সাধন-পন্থা

১৭৫

ত্রায় তুচ্ছ বোধ হইতেছে।' যাঁহারা সংসারের প্রলোভনে সংসারের
 পাকে পড়িয়া, দাগা পাইয়া,—“চন্দ্রক-চাক্র ময়ূর-শিখণ্ডক-মণ্ডল বলয়িত
 -কেশম” মধুরিপুর পদ-পঙ্কজাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ; তাঁহারা অনুরাগী
 ঐকান্ত ভক্ত। তাঁহারা অনেকটা বিশ্বমঙ্গলের মত অর্থাৎ চিন্তামণির
 মোহে পড়িয়া, বিশ্বমঙ্গলের যাহা হইয়াছিল, সেরূপ যে ভক্তের হৃদয়
 অনুরাগের পাকারঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠে, সেই ভক্তই সেই চিদানন্দময়
 ললিত-রস-মূর্ত্তির পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু, যাঁহারা
 পরমার্থ-জ্ঞান-দৃষ্ট বিদ্যাভিমানী, তাঁহাদের তথায় স্থান কোথায় ? কেন
 না, তাঁহারা সহজলভ্য সহজগম্য ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া,—“বহুনাং
 জন্মনামন্তে” কত শতবার ধাকা খাইয়া,—“অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি
 পরাং গতিম্।” ভক্তি ও প্রেম সকল কল্যাণের প্রসবন। সেই ভক্তি
 -প্রেম পরিত্যাগ করিয়া, যিনি কেবল জ্ঞান লাভের জন্য ক্রেশ ও
 আয়াস স্বীকার করেন, তাঁহার—“ক্রেশল এব শিষ্যাতে, নাত্তদ্ যথা
 শূলভূষাবঘাতিনাম্।” ক্রেশই সার হয় ; ফললাভ কিছুই হয় না।
 তুষ টেকিতে কুটিলে কি চাউল পাওয়া যায় ? অঙ্ক কসিয়া কে আর
 বল কবে রসনার তৃপ্তি করিতে পারিয়াছে ? অঙ্ক কসিলে কি
 রসনায় রস পাওয়া যায় ? জ্ঞানদৃষ্ট বিদ্যাভিমানী হইল, এই তুষ-
 বাতী ; জন্ম জন্ম ধরিয়া কেবলই তুষ কুটিতেছেন। ভাব ও রস-বিরহিত
 গুফ জ্ঞানের কঁাকর কুড়াইতেছেন। কিন্তু, যাঁহারা ভক্তিরসে হৃদয়
 সিক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তি-প্রভাবে প্রেমের বিভবে ভক্তিপ্রিয়
 রসময় রসসাগর রসনাগর ভগবানের রস উপলব্ধি করিয়া, সাম্প্রানন্দ-
 রস-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, যে সুখ, যে শান্তি, যে আনন্দ উপভোগ করেন,
 —বোধ করি,—“ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।” সে সুখ
 সে শান্তি, সে আনন্দ, প্রাদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবলোকেও নাই,—এমন কি,
 অমরার অমরগণও সে সুখের, সে শান্তির, সে আনন্দের আশ্বাদন

পাইতে পারেন কি না সন্দেহ। কলিপাবন যুগাবতার রস-নাগর
রসিক-চুড়ামণি যোগীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সংশয়াপনোদনে
সচেষ্ট হইয়া কহিতেছেনঃ—

“ত্রৈবিচা মাং সোমপা পূতপাপা,

যজ্ঞেরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যমাসাচ্ছুরেন্দ্রলোক—

মশ্ণুস্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং,

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি ।

এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্ন।—

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥”

ভগবদ্গীতা । ৯

‘অর্জুন ! ত্রিবেদ-বিহিত কর্মানুষ্ঠান-পর, সোমপায়ী, বিগত পাপ
মহাত্মারা যজ্ঞদ্বারা আমার সংকার করিয়া, সুরলোক লাভের অভিলাষ
করেন ; কিন্তু, পরিশেষে প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া,
দেবভোগ্য উৎকৃষ্ট উপাদেয় ভোগাসকল উপভোগ করিয়া থাকেন।
অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে, স্বর্গলোক হইতে ধাপের পর ধাপ নামিয়া
আসিয়া, পুনরায় মর্ত্যালোকে প্রবেশ করেন ; এইরূপে তাঁহারা বেদত্রয়-
বিহিত কর্মানুষ্ঠানপর ও ভোগাভিলাষী হইয়া, স্বর্গে ও মর্ত্যে উত্থান-
পতন-বিবর্তনের মধ্যে পড়িয়া, বারংবার গমনাগমন করিয়া থাকেন।’

ঐকান্তিক ভক্তিমান্ ভগবন্তক্কে সকল আর্তাদি ভক্ত অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ ও মহাত্মা পদবাচ্য ; ইহা অনেক পূর্বে বলা হইয়াছে। সম্প্রতি
অনুজ্ঞাপূর্বক ; অথচ, তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূন আরও তিন প্রকার
ভক্ত আছে, সেই ত্রিবিধ ভক্তকে পণ্ডিতগণ—‘অহংগ্রাহোপাসক্,

প্রতীকোপাসক ও বিশ্বরূপোপাসক বলিয়া কহিয়া থাকেন। উক্ত
 তিন প্রকার ন্যূন ভক্তদিগের মধ্যে 'অহংগ্রহোপাসক' ভক্ত প্রধান।
 কেন না, তিনি আপনাকে ভগবান্ বলিয়া, অভিমান করিয়া,
 অহম্মদ-সহকারে উপাসনা করেন;—ইহাই পরমেশ্বর-যজ্ঞ-রূপ এক
 প্রকার যজ্ঞ। এই অভেদ-জ্ঞান-রূপ যজ্ঞ-যাজনপূর্বক অহংগ্রহোপাসক-
 গণ ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন; ইহারা শ্রেষ্ঠ। প্রতীকো-
 পাসক ভক্তগণ তাঁহাদের অপেক্ষা নূন; কেন না, তাঁহারা ভগবান্
 হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ জানিয়া, অত্যাশ্রিত দেবতাদিগকে
 মানিয়া,—সূর্য্য, চন্দ্র, বঙ্গল প্রভৃতি তেত্রিশকোটি দেবতাকে ভগবদ্-
 বিভূতি বলিয়া, উপাসনা করেন;—তাই তাঁহারা অহংগ্রহোপাসক
 হইতে কনিষ্ঠ। আর, তাঁহাদের অপেক্ষা মন্দবুদ্ধি উপাসকগণ
 ভগবান্কে বিশ্বরূপ জানিয়া তাঁহারা ভগবানের বিশ্বরূপের উপাসনা
 করেন;—সুতরাং উক্ত ত্রিবিধ উপাসকের মধ্যে ইনি সর্ব্ব কনিষ্ঠ।
 কিন্তু এবম্বিধ ত্রিবিধ উপাসকের ত্রিবিধ উপাসনাতে যদি ভক্তিগন্ধ
 থাকে, তাহা হইলে, ভগবান্কে একমাত্র উপাস্ত পরমেশ্বর জানিয়া,
 উপাসনা করিয়া, পরিণামে ক্রমশঃ তত্তৎ কষায় পরিত্যাগপূর্বক
 ভগবানের শুদ্ধ-ভক্তি-লাভ-রূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
 অহংগ্রহোপাসনায় যে, উপাসকের নিজের প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি, তাহা
 ভগবদ্ভক্তির আলোচনা ক্রমে, শুদ্ধ বিষয়-সামুদ্র্য-কারিণী ভক্তি-রূপে
 পরিণত হইয়া পড়ে। প্রতীকোপাসনায় যে, অশ্রিত দেবতায় ভগবদ্বুদ্ধি,
 তাহা তত্ত্বালোচনা ও সাধুসঙ্গক্রমে ভগবতেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।
 আর বিশ্বরূপোপাসনাতে যে, অনিশ্চিত পরমাত্ম-জ্ঞান, তাহা
 স্বরূপাবির্ভাবক্রমে সচ্চিদানন্দস্বরূপ মধ্যমাংকার ভগবান্ ত্রীবিধুতেই
 ঘনীভূত হয়। কিন্তু, ঐ ত্রিবিধ উপাসনায়, যাহাদের ভগবদ্বৈমুখ্যতা
 কর্মজ্ঞানাগ্রহতা থাকে, তাহাদের পক্ষে নিত্য মঙ্গল-স্বরূপ ভক্তি লাভ

হয় না। অভেদ সাধকেরা ক্রমশঃ ভগবদৈমুখ্যতাবশতঃ মান্নাবাদ-রূপ কুতর্কজালে পতিত হয়। প্রতীকোপাসকগণ ঋক্, সাম, যজুর্বেদোদ্ভি-
 ত কণ্ঠতন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া, উক্ত বেদত্রয়ের কন্মোপদেশিনী বিদ্যাত্রয়
 অধ্যয়ন করতঃ সোমপান দ্বারা ধৌতপাপ হয় এবং ক্রমে যজ্ঞসকল
 দ্বারা ভগবানের উপাসনা করতঃ স্বর্গ প্রার্থনা করিয়া থাকে; তাহারা
 পুণ্যলভ্য দেবালোকে গিয়া; দিব্য ভোগ সকল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু,
 পরে সেই প্রভূত সুখজনক স্বর্গ ভোগ করিয়া, পুণ্যক্ষয় হইলে,
 স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া, পুনরায় মর্ত্যালোকে আগমন করে।

জ্ঞাতিঃ সুহৃৎ স্বজনো যো যথেষ্ট,

ক্ষীণে বিত্তে ত্যজ্যতে মানবৈর্হি।

তথা স্বর্গে ক্ষীণপুণ্যং মনুষ্যং,

ত্যজন্তি সদাঃ খচরা দেবসজ্জাঃ ॥

মৎস্যপুরাণ । ৩৯

জ্ঞাতি, সুহৃৎ, স্বজন সকলেই যেমন ক্ষীণবিত্ত ব্যক্তিকে
 পরিত্যাগ করে, তেমনি স্বর্গবাসী দেবগণও ক্ষীণপুণ্য মনুষ্যকে
 তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়া থাকেন। কামকামী ব্যক্তিগণ, এইরূপেই
 বেদত্রয়ের অল্পগত হইয়া, পুনঃপুনঃ সংসারে গভায়াত করিয়া থাকে
 সর্বস্বজীবের গতিভর্তা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সখা অর্জুনকে কহিতেছেন,-

“মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।

নাশুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতঃ ॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥”

ভগবদ্গীতা ।

‘যাহারা অভিমান মোহ ও পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি
 পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ-দুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি দৃশ্য

হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত আত্মজ্ঞানপরায়ণ নিকাম
 অবিজ্ঞানশূন্য মহাত্মারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া ও মোক্ষরূপ পরম-সিদ্ধিলাভ
 করিয়া, দুঃখের আলায়, অনিত্য, পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না; তাঁহারা
 পরম-সিদ্ধি লাভ করেন। হে অর্জুন! প্রাণিগণ ব্রহ্মলোক অবধি
 সমুদয় লোক হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত
 লোকই অনিত্য, সেই সেই লোক-গত জীবের পুনরাবৃত্তি ও পুনর্জন্ম
 সম্ভব; কিন্তু, আমাকে প্রাপ্ত হইলে, আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না;
 অর্থাৎ কেবলা-ভক্তির বিষয়-রূপ ভগবানকে আশ্রয় করিলে, এই
 মর্ত্যলোকে আর প্রত্যাবৃত্তি হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।
 যাহারা কেবলা ভক্তিকে আশ্রয় করেন, তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম
 হয়না; ভক্তিন্ন সকলেরই পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। কর্মযোগী,
 অষ্টাঙ্গযোগী, এবং প্রধানীভূতা ভক্তিদেবীকে যাহারা আশ্রয় করেন,
 সেই ভক্তিযোগীদিগের সম্বন্ধে যে পুনর্জন্ম না হওয়ার কথা উক্ত
 হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, কেবলা-ভক্তিই ঐ সকল প্রক্রিয়ার
 চরম ফল বা সংসিদ্ধি। তাঁহারা ক্রমশঃ কেবলা-ভক্তি লাভ করিয়া
 পুনর্জন্ম হইতে উদ্ধার পান। দৈব সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন
 এবং ঐরূপ সহস্র যুগে তাঁহার একরাত্রি হয়। যাহারা ইহা
 বিদিত হইয়াছেন, সেই সর্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই অহোরাত্রবেত্তা। যে ব্রহ্মা
 ভগবৎ-পরায়ণ হন, তাঁহারই যুক্তি হয়; সুতরাং ব্রহ্মারই যখন
 এইরূপ গতি, তখন তল্লোকগত ব্যক্তিদিগের অভয়ত্ব নিত্য নয়।
 ব্রহ্মার দিবস আগত হইলে, অব্যক্ত কারণ হইতে ব্যক্ত-চরাচর ভূত
 সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; আর, রাত্রি উপস্থিত হইলে, সেই
 কারণ-রূপ অব্যক্তপদার্থে সমস্ত বস্তু বিলীন হইয়া যায়। অর্থাৎ এই
 ত্রিলোক-মধ্যস্থিত দেব, তির্ধ্যাক, দানব-মানবদির তদপেক্ষা অধিক
 অনিত্যত্ব; যে হেতু, ব্রহ্মার রাত্রি অবসানে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত

হয়। পুনরায় রাত্রি আগমে সেই অব্যক্ত তত্ত্ব সমস্তই লয় হয়। সুতরাং, চরাচর প্রাণি-সকল ব্রহ্মার দিবাভাগে উৎপন্ন হইয়া, রাত্রির আগমে লয় প্রাপ্ত হয়। সেই ভূত-সমূহ ব্রহ্মার দিবসাগমে বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া, রাত্রি সমাগমে বিলীন হয় এবং পুনরায় দিবসাগমে কক্ষাদি পরতত্ত্ব ও সমুৎপন্ন হইয়া, পুনরায় রাত্রি সমাগমে বিলীন হইয়া থাকে। সেই চরাচরের কারণ-রূপ অব্যক্ত অপেক্ষাও পরতর অতিশয় অব্যক্ত, সনাতন আর একটি ভাব আছে; উহা সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলেও, কদাচ বিনষ্ট হয় না। ব্যক্তভাব হইতে যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাই নিত্য; সে তত্ত্ব সর্বভূত নশি হইলেও, নষ্ট হয় না। সেই অব্যক্তকে অক্ষর বলে। তাহাই ভূত সকলের পরমা গতি অর্থাৎ যে অব্যক্ত ভাব অক্ষর বলিয়া, বেদে উক্ত আছে, তাহাকে পরমাগতি বলে; যাহাকে পাইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম অর্থাৎ সেই অব্যক্ত মধ্যে তাহাকেই আমার পরম ধাম বলিয়া জানিবে, যাহা প্রাপ্ত হইয়া, জীব আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। হে প্কার্থ! সেই পরম পুরুষকে একান্ত ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ সেই অব্যক্ত অবস্থায় স্থিত পরম পুরুষই অগ্ন্যাগ্ন-ভক্তি-লভ্য ভূত সকল তাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে এবং তিনিই এই অখণ্ড-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। অর্থাৎ সেই পুরুষের অন্তঃস্থ হইয়া, ভূত সকল বর্তমান এবং সেই পুরুষ-স্বরূপ আমিই অন্তর্ধামী-রূপে সর্বত্র প্রবিষ্ট। হে ভরতর্ষভ! যে কালে গমন করিলে যোগিগণ অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমার অনন্ত ভক্তগণ অক্লেশেই আমাকে লাভ করেন; কিন্তু, যাহারা আমাতে অনন্ত ভক্তি করিতে পারেন নাই এবং কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদির ভরসা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তি অনেক কষ্টসাধ্য; তাঁহাদের গমনকাল ও মার্গ,—এই দুই দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। তাহার বিবরণ বলি,

—শ্রবণ কর। যে কালে মৃত্যু হইলে, যোগীদিগের অনাবৃতি হয় এবং যে কালে মৃত্যু হইলে, পুনরাবৃতি হয়, তাহা বলিতেছি। যে স্থানে দিবস শুক্রবর্ণ ও অগ্নির ত্রায় প্রভাসম্পন্ন এবং ছয় মাস উত্তরায়ণ, ব্রহ্মবেত্তার তথায় গমন করিয়া, ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতিঃ, শুভদিন ও উত্তরায়ণ কালে দেহ ত্যাগ করিলে ব্রহ্ম লাভ করেন। অগ্নি, জ্যোতিঃ, শব্দ দ্বারা অচিরভিমानी দেবতা, অহঃ শব্দে অহরভিমानी দেবতা, শুক্র শব্দে পক্ষাভিমानी দেবতা এবং উত্তরায়ণ শব্দে উত্তরায়ণাভিমानी দেবতাকে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তত্ত্বদ্বন্দ্ব ও কালপ্রাপ্ত মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-শ্রমসমূহাই যোগীর ব্রহ্মলাভের কারণ হয়। এইরূপ সময়ে মৃত্যুলাভ করিলে, যোগীদিগের পুনরাবৃতি হয় না। আর, যে স্থানে রাত্রি, ধূম ও কৃষ্ণবর্ণ এবং ছয়মাস দক্ষিণায়ন, কৰ্ম্মযোগীরা তথায় চন্দ্রপ্রভাশালী স্বর্গলাভ করিয়া নিবৃতি হয় ও পুনরায় সংসারে আর্গমন করেন। অর্থাৎ কৰ্ম্মযোগী সকল ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ দক্ষিণায়ন-রূপ ছয় মাস ও চন্দ্রজ্যোতিঃ অর্থাৎ তত্ত্বদভিমानी দেবতা বা ইন্দ্রিয়ক্রিয়া দ্বারা পুনরাবৃতি-মার্গ প্রাপ্ত হন। জগতের শুক্র ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটি শাখত গতি আছে, তন্মধ্যে একতর দ্বারা অনাবৃতি ও অন্ততর দ্বারা আবৃতি হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, জগতের শুক্র ও কৃষ্ণ এই দুইটি সনাতন গতি অর্থাৎ মার্গ। শুক্রমার্গ দ্বারা অনাবৃতি এবং কৃষ্ণমার্গ গতি দ্বারা আবৃতি ঘটয়া থাকে। হে পার্থ ! যোগীজন এই দুইটি গতি অবগত হইয়া, কদাচিৎ বিমোহিত হন না; অতএব, তুমি সকল কালে যোগানুষ্ঠান-পরায়ণ হও। অর্থাৎ শুক্রমার্গ ও কৃষ্ণমার্গ,—এই দুইটি মার্গের তাত্ত্বিক পার্থক্য অবগত হইয়া, তদুভয়ের অতীত যে ভক্তিয়োগ মার্গ, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক যোগযুক্ত ব্যক্তি কোন কালে মোহ প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ উভয় মার্গকে, তিনি আয়াস-সাধ্য—ক্লেশকর জানিয়া,

অনন্ত ভক্তিয়োগ অবলম্বন করেন। হে অর্জুন ! সেই যোগ অবলম্বন কর। কেন না,—

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব,
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদীষ্টম্ ।
অতোতি তৎসর্বমিদং বিদিত্বা,
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাত্মম্ ॥

ভগবদ্গীতা । ৮

ভক্তিয়োগ অবলম্বন করিলে, তুমি কোন ফলেই বঞ্চিত হইবে না । শাস্ত্রে বেদ, যজ্ঞ, তপস্যাও দানে যে ফল নির্দিষ্ট আছে, জ্ঞানীরা এই নির্ণীত তত্ত্ব অবগত হইয়া, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন এবং জগতের মূল কারণ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । অর্থাৎ বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, কঠোর-কৃচ্ছ্র তপস্যা, গো-হিরণ্য-ভূম্যাদি দান,—ইত্যাদি যত প্রকার জ্ঞান ও কর্ম আছে, সে সমুদয়ে যে ফল লাভ হয়, তাহা তুমি ভক্তিয়োগ দ্বারা লাভ করিয়া, আদি ও পরম স্থানকে প্রাপ্ত হইবে ।

ভগবান্, অর্জুন সংবাদের তাৎপর্য এই যে, যাহারা সর্বদা যাগ-যজ্ঞাদি ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম ও তড়াগ্ প্রতিষ্ঠা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাহারা অগ্নিসাধ্য যাগাদি বলে যমদূত কর্তৃক নীয়মান হইয়া, পিতৃলোকে গমন করেন । এই ইষ্টাপূর্ত্তকারী ব্যক্তির প্রথমে ধূম, তারপরে রাত্রি, তৎপরে কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়নের অবলম্বনে পিতৃলোক প্রাপ্ত হইয়া, চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন ও চন্দ্রলোকে একপ্রকার দিব্যদেহ ধারণ করতঃ উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য ভোগ করেন এবং চন্দ্রসমান জ্যোতিঃ-বিশিষ্ট হইয়া কর্মফল ক্ষয় পর্যাস্ত চন্দ্রলোকেই বাস করেন । অনন্তর কর্মফল ক্ষীণ হইলে, যথাগতরূপে আবার, এই মর্ত্যালোকে আগমন করেন । চন্দ্রলোকে অবস্থান-কালে যে ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় লিঙ্গশরীর-বিশিষ্ট হইয়া, প্রথমে আকাশত,

সুগম সাধন-পন্থা

১৮৩

তৎপরে বায়ু, অনন্তর জল, এবং তৎপরে মেঘ অর্থাৎ আকাশাদি-
সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া, বৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়েন। অনন্তর প্রারব্ধ-কর্ম
বশতঃ ধাতু ও বিবিধ ভক্ষ্য-রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন।

বনস্পাতীনোষধীংশ্চাবিশীকৃত

অপোবায়ুংপৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষম্।

চতুষ্পদংদ্বিপদঞ্চাপি সর্ব,

এবন্তুতা গর্ভভূতা ভবন্তি ॥

ম্যন্তপুরাণ । ৩৯

এইরূপে জীবগণ বনস্পতি, ঔষধী, অপবায়ু, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ,
চতুষ্পদ ও দ্বিপদাদিতে আবিষ্ট হয়, ইহারা গর্ভরূপে পরিণত হইয়া
থাকে। অর্থাৎ ধাতু ও বিবিধ ভক্ষ্যরূপে স্ত্রী-পুরুষের ভক্ষিত হইয়া
ভুক্তানের পরিণাম রজোবীর্ষ্যে পরিণত হয় অর্থাৎ পুরুষসৃষ্ট শুক্র
পুষ্পরসে অনুযুক্ত হইয়া, সম্মিলিত হয়; পরে তাহা স্ত্রীলোকের
রজঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্রমে জীব গর্ভরূপে পরিণত হইয়া
উপস্থিত হয়। যাহারা পূর্বোক্ত ধূমাদি মার্গে গমন করেন, তাহাদের
সকলেরই যে পুনরাবৃতি হইবে এরূপ নিয়ম নাই ইহাদের মধ্যে
অনেকে স্থলদেহ স্বয়ংকর নিমিত্ত গর্ভে প্রবেশ করেন এবং অনেকে
চিত্তশুদ্ধিজনক কর্ম ও চন্দ্রলোকে অনুষ্ঠিত শ্রবণাদি সাধন দ্বারা ক্রমে
মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। আর যাহারা অন্তরূপে সম্পন্ন হইয়েন,
তাহারা পিতামাতা কর্তৃক পরিভুক্ত হইয়া, শুক্র-শোণিতাকারে পরিণত
হন। গর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়া, নিজকর্মানুসারে স্ত্রী, পুরুষ এবং
নপুংসকাকার দেহ ধারণ করিয়া থাকেন।

তপশ্চ দানঞ্চ শমোদমশ্চ,

হ্রীরার্জবং সর্বভূতানুকম্পা।

স্বর্গস্থ লোকস্থ বদন্তি সন্তো—

দ্বারাণি সপ্তৈব মহান্তি পুংসাম্ ॥

মৎস্যপুরাণ । ৩৯

যাঁহারা কঠোর-কৃচ্ছ-উগ্র তপঃসাধন করেন, গো-হিরণ্য-ভূম্যাদি দান করেন; আর,—শম, দম, লজ্জা-সরলতা ও সর্বজীবে দয়া করেন; তাঁহারা দিব্যলোক প্রাপ্ত হন। কেন না,—তপ, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা ও সর্বজীবে দয়া,—এই সাতটিকে পণ্ডিতগণ স্বর্গের দ্বার-স্বরূপ বলিয়াছেন। উল্লিখিত তপঃ প্রভৃতি সাতটি গুণ—মানবের অভিমান ও তমোগুণদ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে; ইহাও পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়া, আপনাকে মহাপণ্ডিত বলিয়া মনে করেন এবং স্বকীয় বিদ্যা-প্রভাবে অন্যের যশঃ বিনষ্ট করেন, তাঁহাদের লোক সকল ব্রহ্মফল প্রদান করে না। যাঁহারা সর্বদা শম-দমাদি-সম্পন্ন হইয়া বিদ্যানিরত থাকেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকেন। কোন্ পথে ব্রহ্মলোক গমন করেন? প্রথমে অর্চিরভিমানী দেবতা, তৎপরে দিবসভিমানিনী দেবতা, অনন্তর সুরূপক্ষাভিমানিনী দেবতা, তৎপরে উত্তরাভিমানিনী দেবতা তৎপরে সম্বৎসরাভিমানিনী দেবতা-স্বরূপ হইয়া, সূর্য্য ও চন্দ্র-লোকে গমনপূর্ব্বক অনন্তর বিদ্যাল্লোক প্রাপ্ত হইয়েন। অনন্তর কোন দিব্য-পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে, এই বিদ্যাল্লোকে আগমন করতঃ এই উপাসককে দিব্যশরীরের সহিত সংযুক্ত করিয়া, ব্রহ্মলোকে সম্বয়ন করিয়া থাকেন। উপাসক ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক দিব্যদেহাবলম্বনে যথেষ্ট ভোগ্যবস্তুর ভোগ করিয়া, সেইখানেই বহুকাল বাসকরতঃ কর্ম্মফল-ভোগাবসানে পুনরায় মর্ত্যালোকে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু, যাঁহারা জ্ঞানবান ভক্তিনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা বৈকুণ্ঠলোকে উপনীত হইয়া, ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া, মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

তঁাহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না অর্থাৎ তঁাহারা তথা হইতে ভোগচ্যুত হইয়া, মর্ত্যালোকে আর, ফিরিয়া আসেন না। এইরূপে দেবদান ও পিতৃদান নামক দুইটি মাগে, জীবগণ গমনাগমন করিয়া থাকেন। জীব কর্মফলে কেহ ব্রহ্মলোকে, কেহ চন্দ্রলোকে, কেহ বিদ্যালোকে কেহ গন্ধর্ব্বলোকে, কেহ দেবলোকে গমন করিয়া, বিবিধ সুখ ভোগ করিয়া থাকেন এবং ফল ভোগান্তে পুনরায় মর্ত্যালোকে ফিরিয়া আসেন। কর্মের ভারতম্যবশতঃ পূর্বোক্ত লোকসমূহে ভোগের ভারতম্য ঘটিয়া থাকে; যঁাহারা উক্ত লোকসকল হইতে মর্ত্যালোকে সমাগত হন, তঁাহাদের স্ব স্ব কর্মফলে যুবা, সুন্দর, বিক্রমশালী, নীরোগ এবং বলবান্ হইয়া, এই নরারাম ধরাধামে ভোগানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং উক্ত গুণযুক্ত হইয়া, এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে নিষ্কটকভাবে ভোগ করাকেই মানুষানন্দ বলে; আর, যে মনুষ্য তপোযুক্ত হইয়া, গন্ধর্ব্ব প্রাপ্ত হইয়া, তঁাহার সম্বন্ধে মনুষ্য-নন্দাপেক্ষা শতগুণ সমৃদ্ধ হইয়া থাকে এবং যঁাহারা দেব-গন্ধর্ব্ব প্রাপ্ত হইয়া, তঁাহাদের এতদপেক্ষাও শতগুণ আনন্দ সমুৎপন্ন হয়। এই প্রকার পিতৃদিগর আনন্দ উত্তরোত্তর শতগুণ জানিবে। কিন্তু, সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ পরমপদ নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে, সেই জগত্ সেই স্থানকে রস-সাগর, আনন্দ-সাগর, সুখ-সাগর, ও শান্তি-সাগর প্রভৃতি বিশেষণে বিশিষ্ট করা হয়। সে স্থানে কর্মী প্রভৃতির উপনীত হইবার সাধ্য নাই, একমাত্র জ্ঞানবান্ ভক্তিনিষ্ঠ তন্ময় ঐকান্ত ভক্তিযোগী উপনীত হইয়া, সে আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ। মাতেশ্বরী শ্রুতি কহিয়াছেন,—

“যত্র নাশ্চ পশ্যতি নাশ্চক্ষণোতি নাশ্চদ্বিজানাতি স ভূম।
অথ যত্রাপশ্যত্যশ্চক্ষণোত্যত্র বিজানাতি তদব্জং। যো বৈ ভূম
তদমৃতম্। অথ যদব্জং তদমৃত্যম্॥”

ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৭।২।৪।১

যে স্থানে আনন্দ-রস-ধারার বৈচিত্র্য অনন্ত; বৈচিত্র্যাবশতঃ যেখানে সুখ-শান্তি-আনন্দও অনন্ত, যেখানে যথার্থ সাধক, প্রকৃত জ্ঞানী, ঐকান্ত ভগবন্তত উপনীত হইয়া, রস-সাগরের রসামৃত পানে উন্মত্ত হইয়া, সকলই ভুলিয়া যান, সেই রস-বৈচিত্র্যের রসানুভব করিতে মর্ত্য সমর্থ নহে। একমাত্র তন্ময় ভাবুক, রসজ্ঞ কবিরাই সেই রস-মাধুরীর মাধুর্য্য বৃষ্টিতে বা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। কেন না, যিনি তাঁহার রস উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি এই লাবণ্যময়ী প্রকৃতি-সুন্দরীর অনন্ত বৈচিত্র্যশালী শোভন-সৌন্দর্য্যময় সসীম রাজ্যের সকলই—এমন কি, আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া, তাঁহাতেই মজিয়া থাকেন। তদবস্থায় তিনি সংসারের পুত্র-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পত্তি, সুখৈশ্বর্য্য; আর, অন্তরীক্ষের স্বর্গীয় সুখ-সম্পদ বা তেত্রিশকোটি দেবতাকেও দেখিতে পান না;—পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজনাতির করুণ বিলাপ বা আত্মজীবের আত্মনাদ কিংবা শত্রু বা দুর্জনের ঘৃণা ও নিন্দা-সূচক কটুক্তি কিংবা মিত্র বা সজ্জনের হর্ষদায়ক স্তব-স্তুতিও শুনিতে পান না; ভবপারাবারের কাণ্ডারী সংসার-সাগর-তরী, ত্রিতাপহারি, চিরসখা, “গতিভর্ত্তাপ্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং মুহুঃ” ব্যতীত ইন্দ্রাদি তেত্রিশকোটি দেবতা বা সংসারের পিতা-মাতা, পুত্র-কলত্র, বন্ধু-বান্ধব, প্রভৃতি কাহাকেও জানিতে পারেন না। কেন না, তিনি যাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি “ভূমা” অর্থাৎ মহান্, পরমানন্দ রস-সাগর। ঋতি বলেন,—“যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নায়ে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।” অর্থাৎ, যিনি ভূমা, তিনি মহান্, ত্রিতাপের লয়স্থান, অপরিচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি আনন্দ-স্বরূপ; তাঁহার চিন্তনে, তাঁহার রূপ ধ্যানে, তাঁহার গুণগান কীর্তনে যে সুখ, যে শান্তি, যে আনন্দ অনুভব হয়; তাহা পরিচ্ছিন্ন সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্য বা ইন্দ্রিয়-বিষয়-ভোগে নাই; কেন না, এসকল

অল্প, অল্পে সে সুখ-শান্তি-আনন্দ নাই, থাকিতে পারে না। কিন্তু, সেই 'ভূমা', সেই 'মহান', পরমানন্দরস-সাগর সর্বসুখের আকর, ভাব-সৌন্দর্য্যধার ভগবান্ অনন্ত সুখ, চির-শান্তি, স্থায়ী-আনন্দ-স্বরূপ। ভূমাই চরম-সুখ, চির-শান্তি, স্থায়ী-আনন্দ; অত্ৰ কেহ নহে। ভগবান্ জীবিসুই ভূমা। তিনি যেমন অনাদি অনন্ত অবিনশ্বর; তাঁহাতে সুখ-শান্তি-আনন্দও অনন্ত অক্ষয় অব্যয়ভাবে ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত; তাহা জানিতে পারা যায় না। কিন্তু, সাংসারিক গৃহমেধী সুখ-সন্তোষে যে আনন্দ বা সুখ আছে, তাহা জানিতে পারা যায়; কেন না, তাহা অল্প, তাহা পরিমিত। পরন্তু, ভগবানে যে সুখ, যে আনন্দ আছে, তাহা অপরিমিত। যাহা অপরিমিত, তাহাই ভূমা; যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত। আর, যাহা অল্প, তাহাই মর্ত্য। এই মর্ত্যে থাকিলে, মর্ত্যবাসীকে সংসারের যত মায়া-মমতা, যত সব কামনা-প্রলোভন বন্ধন করিয়া রাখে,— ঠকাইয়া থাকে; কিন্তু, সংসারের যত মায়া-মমতা, যত সব কামনা-প্রলোভন, কেহই ভগবানের পরম পদে উপনীত ঐকান্ত ভক্তকে বন্ধন করিতে পারে না, কেহই তাঁহাদিগকে আর ঠকাইতে পারে না; তাঁহারা তন্ময় হইয়া, সদানন্দে জীবন যাপন করেন এবং তৃপ্ত হন। তখন তাঁহারা সিদ্ধ হইয়া যান, তাঁহাদিগকে আর অত্ৰ কোন সাধনা করিতে হয় না; কেন না, অগিমা-মহিমা প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্য আপনা আপনিই তাঁহাদের হস্তগত হয়। কাজেই তাঁহাদের আর কোন বিষয়ে খাসনা, শোক, দ্বেষ, রতি বা উৎসাহ থাকে না। থাকিবেই বা কিরূপে? পরম পদে যাঁহাদের মন বিশ্রাম লাভ করে, তাঁহারা আর কোন বস্তুকে ভালবাসিবেন বা দ্বেষ করিবেন? আর, কোন্ কার্য্যে উৎসাহী হইবেন? তাঁহারা তখন মত্ত, স্তব্ধ ও আত্মারাম হইয়া যান। ঋতি কহিয়াছেন,—“ততো নিরাস্কবহমেতি,

নিরাশ্রকত্বান্ন মুখদুঃখভাগ্ ভবতি কেবলং লভতে।” পূর্বোক্তরূপে ইন্দ্রিয়াদির বিনাশ ঘটিলেই, আর মুখ বা দুঃখভাগী হয় না; তখন তিনি মোক্ষ লাভ করেন। যোগীরাজ মহর্ষি পাতঞ্জলি কহিয়াছেন,—

“তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্।”

পাতঞ্জলদর্শন। বিভূতি। ৫০

‘সাধক সাধন বলে সকল বস্তুর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও সমুদয় বস্তুর জ্ঞান,—এই দুই ক্ষমতা লাভ করেন, উক্ত প্রকার সিদ্ধি উপস্থিত হইলে, তৎপ্রতি যদি বৈরাগ্য জন্মে, তাহা হইলে, তাদৃশ সাধকের দোষের অর্থাৎ বুদ্ধি-মালিণ্যের মূল কারণ,—‘অবিজ্ঞা’ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায় এবং ‘কৈবল্য’ অর্থাৎ স্বরূপ প্রতিষ্ঠা-রূপ স্থিতি প্রবাহ লাভ হয়। অর্থাৎ তৎকালে সাধকের প্রতি প্রকৃতি অধিকার বা আলিঙ্গন থাকে না; সুতরাং ‘কৈবল্য’ অর্থাৎ মুক্তি লাভ হয়।’ দর্শনাচার্য্য ভগবান্ বাদরায়ণ কহিয়াছেন,—

চিতিতন্মাত্রেন তদাত্মকত্বাদিত্যোত্যাডুলোমিঃ।

ব্রহ্মসূত্র। ৪।৪।৬

‘ভাবময় ভগবানের ধ্যান দ্বারা অবিজ্ঞা বিদূরিত হইলে, সাধক চিন্ময় ভগবানে চিৎ-স্বরূপেই অবস্থান করিয়া থাকেন;—ইহাই মুক্তি।’ ভগবানে যে যে গুণ বিद्यমান; মুক্ত পুরুষেও, সেই গুণগুলিই দৃষ্ট হয়। মুক্তাত্মা পুরুষ ভগবন্তাবে ভাবিত হইয়া, ভগবান্ হইয়া যান; কেন না, তাঁহারা তন্ময়। ভগবানে মিলিত হইলে, অবশ্যস্তাবী গুণগুলি প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই। কেন না, মুক্ত পুরুষের ইচ্ছামাত্রেই কাম্য-বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব, শুদ্ধজীব ভগবানের এবং ভগবান্ শুদ্ধজীবের। তাঁহারা প্রাকৃত দেহ নাই, তাঁহারা অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ লাভ করিয়া, ভাবময়

শ্রেয়সময় ভগবৎ-সমীপে বাস করিয়া থাকেন। শুদ্ধজীবের প্রাকৃত দেহ না থাকিলেও, তাঁহারা ইচ্ছামত একটি, তিনটি, সাতটি ও অসংখ্য দেহ ধারণ করিতে পারেন। যেরূপ ধনাভিলাষী ও পুত্রাভিলাষী ব্যক্তি সকলের কামনা লাভ নিমিত্ত বেদে দ্বাদশাহ যাগ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষের শরীররহ ও অশরীররহ সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। যাহারা সেবা চান, তাঁহারা শরীর গ্রহণ করেন এবং যাহারা তাহা না চান, তাঁহারা স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। ধর্ম্মরাজ, সত্যী সাধ্বী সাবিত্রীকে কহিতেছেন,—

“মুক্তিস্ত দ্বিবিধা সাধি৷ শ্রুত্যান্তা বেদসম্মত।

নির্ব্যাণপদদাত্রী চ হরিভক্তিপ্রদা নৃণাম্ ॥

হরিভক্তিস্বরূপাঞ্চ মুক্তিং বাঞ্ছতি বৈষ্ণবাঃ ।

অন্যে নির্বাণরূপাঞ্চ মুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবাঃ ॥”

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ । প্রকৃ । ২৫

‘হে সাধি ! সর্বসম্মত শাস্ত্রোক্ত মুক্তি দুই প্রকার;—এক মুক্তি মনুষ্যাগণকে নির্বাণপদ দান করেন ও অন্য মুক্তি হরিভক্তি-দায়িনী ; তাহার মধ্যে বৈষ্ণবগণ হরিভক্তি-রূপ মুক্তিকেই প্রার্থনা করেন। আর, অন্যান্য সাধু সকল, নির্বাণ-রূপ মুক্তির অভিলাষী ।’

শোভন মনীষীগণ দেবেশপদে গমন করিয়া, পুনরাবর্তন করেন না, তাঁহাতেই অবস্থিত থাকেন এবং তাঁহারই সমান মুখ ও সমাঙ্গনা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার সহিত সঙ্গত থাকেন। সৌমিত্রি, ভরত ও সঙ্কর্যগাদি স্বর্গস্থ জীব যেমন যথেষ্ট জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, পুনরায় শাস্ত্র পদে উপনীত হইতে সমর্থ হন ; তদ্রূপ হরিলোকাবিষ্ট শুদ্ধচেতাঃ ভক্তগণেরও যথেষ্ট স্বর্গভোগ লাভ, সত্যলোকে জন্ম ও শাস্ত্র পদপ্রাপ্তি ঘটয়া থাকে, বৈষ্ণবগণের জন্ম বা কর্ম্মবন্ধন নাই। মনীষীগণ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অনুচরত্ব বা কিঙ্করত্বকেই অর্থাৎ দাসত্বকেই

মোক্ষ কহিয়াছেন। ভগবান্ দেবেশ জীবিস্বর যে দাস্ত, তাহা বন্ধন বলিয়া অভিহিত হয় না। ব্রহ্মলোক হইতে ভুবন-লোক পর্য্যন্ত সমস্তই পুনরাবৃত্তিশীল, কর্ম-সমূহ বন্ধনময় এবং বহু আয়াস-সাধা; আর ফলও দুঃখ ও ভয়প্রদ। কিন্তু, যাঁহারা ভগবান্ জীহরির ক্রীতদাস—নিত্য-কিন্তর, তাঁহারা সর্ব-বন্ধন-মুক্ত, নিরাময় ও জন্ম-মৃত্যু-রহিত বলিয়া কথিত হন। অতএব, বৈকুণ্ঠ-ধামে যে সকল পুরুষ বসবাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই ভগবান্ বৈকুণ্ঠের তুল্য মূর্তিধারী। সেই সকল ভগবৎ-স্বরূপ মহাপুরুষ নিষ্কাম-ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া ভগবানের আরাধনা করিয়া ছিলেন; তাহাতেই তাঁহারা ভগবান্-রূপী হইয়া, বলিতেছেন;—

“দত্তস্তয়ায়ং মম ভক্তিবৃক্ষো—

ধর্ম্মার্থকামত্রয় চারুশাখঃ।

তদর্শনাস্তোময়বৃষ্ঠিসিক্তঃ,

প্রভোহুত কৈবল্যফলং দধার ॥”

পদ্মপুরাণ। ক্রিয়া ১১

‘হে প্রভো! তুমি আমাকে ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপ তিনটি চারুশাখা-সম্পন্ন ভক্তিবৃক্ষ প্রদান করিয়াছিলে, তোমার দর্শন-রূপ সলিল-বৃষ্টি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, সেই সুচারুবৃক্ষ অত কৈবল্য-রূপ মহাফল-ধারণ করিল।’

পঞ্চদশ পশ্চিচ্ছেদ ।

নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে কে উপনীত হইতে পারে ?

—:(*):—

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি অধুনা কহিলেন যে,—‘যাঁহারা নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা ভগবান্ বৈকুণ্ঠপতি ক্রীহরির সমান-রূপী ।’ এখানে আবার একটি সন্দেহ উপস্থিত হইল, যাঁহারা তথায় বসবাস করিয়াছেন, বোধ হয়—তাঁহারা সত্য, ত্রেতা, ও দ্বাপরযুগের লোক হইবেন ; কিন্তু, এই কলির কাম-কিন্ধর জীবের নিত্যধামে উপনীত হইবার উপায় কিছু আছে কি ? কলিকালে নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে কে উপনীত হইতে পারে ?

যজ্ঞস্তি যে বিষ্ণুগনন্তমুষ্টিং,

নিরীহমোক্ষার গতং বরেণ্যম্ ।

বেদান্তবেদ্যং ভবরোগবৈদ্যম্ ;

তে যাস্তি সর্ব্বৈ পদমচ্যুতস্য ॥

বৃহন্নারদপুরাণ । ২৯

যাঁহার অনন্তরূপ, অনন্ত জগতে অনন্ত মহিমায় পরিসমাণ্ত ; যাঁহাকে চিন্তাকুল মুনি-ঋষি, যোগী-তপস্বী ও মানবকুল নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে, নানা বস্তুতে, নানা আকারে, নানা প্রকারে, নানা সাধনায়, ফুটাইয়া তুলিতে প্রতি নিয়ত যত্নবান্ হইয়াছেন ; অনন্ত সাধক, অনন্ত যোগী, অনন্ত মুনি, অনন্ত ঋষি, অনন্ত তপস্বী, অনন্ত জ্ঞানী, অনন্ত মানব অনন্ত কাল হইতে, যাঁহার অনুসন্ধানে ফিরিতেছেন ; অনন্ত কাল ধরিয়া, অনন্ত সাধক, অনন্ত উপাসক, অনন্ত প্রকারে, অনন্ত রূপে যাঁহাকে উপলব্ধি করিবার জন্ম

প্রতিনিয়ত চেষ্টা পাইতেছেন; অনন্ত সাধকের, অনন্ত উপাসকের অনন্ত চেষ্টায় অনন্ত কালেও, যাঁহার অন্ত খুঁজিয়া পাইতেছেন না— এমন কি, স্বয়ং অনন্ত দেবও যাঁহার অন্ত না পান; সেই অনন্ত মূর্তি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের সৃষ্টির আদিতে ও অন্তে স্থিতি ও পালনে, সৃষ্টি ও প্রলয়ে, ভূত ও ভবিষ্যতে, জন্মে ও মরণে, বিচ্ছেদে ও মিলনে, সর্বকালে সমভাবে বিরাজমান। তিনি সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের শক্তিমান্ ও দ্বিতৈন্দ্রিয় মানবের প্রতি যেমন দয়াবান্ ও দৃশ্যমান্, কলিযুগের শক্তিহীন কাম-কিন্ধর দুর্বল জীবের প্রতিও তেমনই দয়াদ্র'চিহ্ন ও পরিদৃশ্যমান্; সুতরাং সকল যুগে সকল জীবেরই প্রতি তিনি সমান;—বরং কলিযুগে যাঁহার কেবলমাত্র ভক্তিমান্, তাঁহার সত্বরে অতি সহজে তাঁহাকে দেখিতে পান। বাস্তবিক পক্ষে অত্যাশ্রয় যুগে জীবের প্রতি তিনি যতটা দয়াবান্ না হইতেন, কলি কালের দুর্বল জীবের প্রতি তিনি ততোধিক দয়াদ্র'চিহ্ন বলিয়া মনে হয়। কেন না, কলিকালের জীবের পক্ষে তিনি অনায়াসলভ্য; ইহা সর্বশাস্ত্রসম্মত। কলির শক্তিহীন দুর্বল জীব, কেবলমাত্র তাঁহার নাম কীর্তন করিলেই, তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, ইহা অপেক্ষা সরল উপায়ে কোন যুগে তিনি কাহার লভ্য হইয়াছেন? অতএব অত্যাশ্রয় যুগের মানব অপেক্ষা কলির মানব সৌভাগ্যবান্; সুতরাং,—“ধন্যঃ কলেঃ মানবাঃ।” অতএব, সেই অনন্তমূর্তি, নিরীহ, প্রণবমধ্যগত শ্রেষ্ঠপুরুষ, বেদান্ত-বেত্ত এবং ভবরোগ বৈদ্যস্বরূপ, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রতিমূর্তি স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে অঙ্কিত করিয়া, অহর্নিশ যাঁহার প্রেম-পুষ্পে তাঁহার পূজা করেন; ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার অমৃতময় সুধাসিক্ত নাম গুণ কীর্তন করেন; তাঁহার অবলীলাক্রমে অনায়াসেই কোটী-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটী-চন্দ্রোৎফুল্ল সুখ-শান্তি-আনন্দময় নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে উপনীত হইতে

পারেন ; সংশয় নাই। সুতরাং এই ঘোর কলিকালে, যাহারা পার্থিবতার ভিতর দিয়া,—জড়োপাসনার ভিতর দিয়া,—রাজসিক বা তামসিক পূজার মধ্য দিয়া,—সংসারের তাপ-জ্বালার ভিতর দিয়া,—সংসারের মায়া-মমতা, কামনা প্রলোভনের ভিতর দিয়া,—দাস্য-ভাবের সাধনা-পথ বহিয়া,—কলিপাবন মহাজনগণের উপদেশ মানিয়া,—স্ত্রী-পুত্রাদির মায়া-মোহের সূচীভেদ তমোরাশি ভেদ করিয়া,—দেহ-গেহাদির আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, অহর্নিশ ভক্তিভাবে উচ্চৈঃশ্বরে ভগবন্নাম কীর্তন করিতে পারেন ; তাঁহারা সর্ববাসনা-যুক্ত হইয়া, অস্ত্রিমে অনায়াসে ভীম-ভবার্ণব পার হইয়া, সেই চিরানন্দ ধাম পরম পদ বৈকুণ্ঠে উপনীত হইতে পারিবেন,—ইহাতে সংশয় কি ? মহাযোগী মহেশ্বর, জগজ্জননী মহেশ্বরীকে কহিতেছেন,—

“দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রং বৈ যে জপন্তি সুখান্বয়ম্ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি সততং শান্তং শুভমক্ষয়ম্ ॥

ন বেদাধ্যয়নৈ র্বজ্ঞে ন ব্রতৈর্নোপবাসতঃ ।

ন প্রাপাং বৈষ্ণবং লোকং বিনা দাস্যেন কুত্রচিৎ ॥

তস্মদাস্যং হরের্ভক্তো ভজ্যেতানন্তমানসঃ ।

প্রাপ্নোতি পরমাংসিদ্ধিংকর্মবন্ধবিমোচনীম্ ॥”

পদ্মপুরাণ । উত্তর । ২২৩

‘হে শুভাননে ! যাহারা সুখাভিমান দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করেন, তাঁহারা সতত এই শান্ত শুভ অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হন। দাস্য ব্যতীত বেদাধ্যয়ন, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-যাজন, কুচ্ছাতিকুচ্ছ ব্রত-সাধন ও অনশনাদি অনাহারে-অনিদ্রায় উপবাস করিয়া শরীর শোষণ দ্বারা বৈষ্ণবলোক অর্থাৎ প্রদীপ্ত অপাপবিন্দ দেবারাধ্য লোক বৈকুণ্ঠ লাভ হয় না ; অতএব, অনন্তমনা হইয়া, গোলকপতি বৈকুণ্ঠ নাথ ভগবান্ শ্রীহরির দাস্য করিলে, কর্ম-বন্ধন-বিমোচনী পরমা সিদ্ধিলাভ

হয়, জীব কৰ্ম-বেষ্টনী ভেদ করিয়া, পরম পদে উপনীত হইতে পারে।' কিন্তু,—

ন তত্র মৃত্যু গচ্ছন্তি পুরুষা বিষয়াত্মকাঃ ।

দন্তমোহভয়দ্রোহক্ৰোধলোভৈরভিজ্ঞতাঃ ॥

নিৰ্ম্মমা নিরহঙ্কারা নিদ্বন্দ্বাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ।

ধানযোগরতাস্শৈব তত্র গচ্ছন্তি সাধবঃ ॥

পদ্মপুরাণ । ভূমি । ৯৫

সেই প্রদীপ্ত অপাপবিন্ধ দেবারাধ্য পরমপদ বৈকুণ্ঠধামে যে কেহই ইচ্ছা করিয়া উপনীত হইতে সমর্থ হয় না, মোহপঙ্কে কৰ্দমাঙ্ক ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস, বিষয়াসক্ত কামনা বিজড়িত, অজিতেন্দ্রিয়, অবিদ্যাভিভূত, মায়ার খেলার পুতুল, অজ্ঞ, অন্ধ মূঢ়, অভক্ত—অভাজন ভক্তি-বহির্মুখ দুষ্কৰ্ম্ম-নিরত দুর্নীতি-পরায়ণ নাস্তিকমতি মানবগণ তথায় উপনীত হইতে পারে না ;—তাহাদের তাহা স্বপ্নেরও অগোচর । যাহারা সম্পত্তি-মদ-পানে মত্ত হইয়া, দন্ত প্রকাশ করে ; যাহারা পুত্র-কলত্রাদির মায়্যা-মোহে অভিভূত হইয়া, সতত মোহ-পঙ্কে নিমগ্ন থাকে ; যাহারা অলীক ভয়ে অভিভূত হইয়া, ভয়-বিহ্বল চিত্তে সতত জগতের সর্বত্র ভয়ের কারণ দেখে ; যাহারা সর্বদা সকলের সহিত দ্রোহাচরণ করে ; যাহারা ক্রোধাঙ্ক হইয়া, অগ্নির অনিষ্টাচরণ করে এবং যাহারা সতত লোভের নিত্য-কঙ্কর হইয়া আশা-স্পৃহাকে বাড়াইতে থাকে ; তাহাদের তথায় যাইবার অধিকার নাই । তবে কে যাইতে পারে ? যাহারা পুত্র-কলত্রাদির আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া দেহ-গেহের মায়্যা-মমতা ভুলিয়া নিৰ্ম্মম হইতে পারিয়াছেন ; যাহারা ধন-জন জীবন-যৌবনের দুৰ্জ্জয় অভিমানকে হৃদয় হইতে অপমৃত্ত করিয়া, নিরহঙ্কৃতি হইতে পারিয়াছেন ; যাহারা মুখ-দুঃখ, মান-অপমান, শীত-ঊষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত

হইয়া, নিবন্ধ হইতে পারিয়াছেন; যাঁহারা কিন্তু আত্মাকে শাস্ত করিয়া, দুর্জয় রিপুগণকে সংযত করিয়া, দুঃস্বপ্ন ইন্দ্রিয়গণের পথ রুদ্ধ করিয়া, আড়ম্বরের মিথ্যাভাণ ছাড়িয়া, সংসারের মায়া-মমতা আশা-ভরসা, শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রনা, ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্তই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া, ভ্রান্তি-শূন্য এবং সুমেকর ত্রায় অচল ও সাগরের ত্রায় গভীর হইয়া, সর্বভাবে অবস্থান করিয়া, নির্লিপ্ত-চিন্তে সতত ভগবদ্ব্যানে ও নিরন্তর ভগবানের নাম কীৰ্ত্তনে নিরত হইলেন; তাদৃশ সংযতেন্দ্রিয় ধ্যাননিষ্ঠ অবিচ্ছাদিত মহাত্মারাই তথায় গমন করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কৰ্ম্মবীর অর্জুনকে ঐ কথা কহিয়াছেন,—

“নির্মানমে হা জিতসঙ্গদোষা—

অপ্যাঅনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।

দ্বৈতৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ—

গচ্ছন্ত্যমৃতাঃ পদমবায়ং তৎ ॥”

ভগবদগীতা । ১৫

যাঁহারা এই মায়া-মমতাময় মোহ-কুহেলিকা-সমাজ, কোলাহল-ময় সংসারে থাকিয়া, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব জ্ঞাতি কুটুম্ব, স্ত্রীপুত্র, দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত মর্ম্মর-নির্ম্মিত সুখা-ধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীতে বস-বাস করিয়া, অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইয়াও, ঐহিক সুখে না মজিয়া, ধনৈশ্বর্যের অভিমান, দেহ-গেহের মোহ, পুত্র-কলত্র, আত্মীয়-স্বজন, ধনৈশ্বর্য প্রভৃতির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ-দুঃখ, মান-অপমান শীত-উষ্ণ, প্রভৃতি দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন; সেই সমস্ত আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিকাম অবিচ্ছাদিত সংযতেন্দ্রিয় সৌভাগ্যবান্ মহাত্মারাই, এই কাম-ক্রোধদি-রিপু-নক্র-সঙ্কুল মোহাবর্ত্ত-চঞ্চল দুষ্পার

দুস্তর ভীম-ভবান্বিত পার হইয়া, সেই কোটীসূর্য্যাপ্রদীপ্ত কোটিচন্দ্রোৎফুল্ল
জ্যোতির্শ্রয়, ব্রহ্মানন্দসুখাস্বয় অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্যলোক অবায়
পরমপদ বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইতে সমর্থ হন ।' অতএব,—

সংসার সিদ্ধমতি নিয়মিমং তিষ্ঠীষুঃ,

ক্লেশপ্রদং বিষমপাপগণাশ্রয়ঞ্চ ।

ক্ষেত্রে সমস্তসুখে পুরুষোত্তমাখ্যে—

পশ্যতামুং সুরবরং পুরুষোত্তমং সঃ ॥

পদ্মপুরাণ । ক্রিয়া । ১৭

যাঁহারা এই অশেষবিধ পাপ-সমূহের আশ্রয়, নানাপ্রকার
ক্লেশপ্রদ ও বিষম বিষয়-অগাধ-সলিলে অত্যন্ত গভীর দুস্তর সংসার-
সাগর সুখে পার হইবার অভিলাষ করেন, তাঁহারা সংসারের মায়া-
মগতা—আপন কায়ার মায়া ভুলিয়া, এমন কি—বাহা হইতে মায়া
জন্মে তাহার ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, সমস্ত সুখের আকর পুরুষোত্তম-
ক্ষেত্রে দেবশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমকে অবলোকন করুন এবং তাঁহার অমৃতময়
সুধাসিক্ত নাম কীর্তনে নিরত হউন ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

ভীম-ভবার্ণব পার হইবার আশ্রয় কি ?

—:):(:—

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি অধুনা বলিলেন যে,—
‘যাঁহারা অভিমান ও মোহশূন্য, সঙ্গদোষ-রহিত, নিত্যানিত্য বিচার-
পরায়ণ, নিবৃত্ত-কাম, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন ;
তঁাহারাই এই অকূল দুস্তর ভীম-ভবার্ণব পার হইয়া, সেই চির
উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান চির-সুখ-শাস্তিময় অপাপবিন্দু দেবারাধ্য
বৈকুণ্ঠে উপনীত হইতে সমর্থ হয়েন ।’ কিন্তু, যাঁহারা কলি-কলুষিত
কামনা-বিজড়িত স্ত্রী-পুত্রাদিতে একান্ত অনুরক্ত, তঁাহাদের এই ভীম-
ভবার্ণব পার হইয়া, নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে উপনীত হইবার উপায় কি ?
আশ্রয় কি ?

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং,
মৃতদুহিতৃকলত্রাণভারাবতানাম্ ।
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতমপ্লাবানাং,
ভবতি শরণমেকো বিষ্ণুপোতনরাণাম্ ॥

বামনপুরাণ । ৯৪

অজ্ঞানতাবশতঃ যাহারা, এই কাম-ক্রোধাদি-রিপুনক্র-সঙ্কুল—
মোহাবর্ত-চঞ্চল অপার দুস্তর অকূল ভব-পারাবারে পতিত হইয়া,
প্রতিনিয়ত সুখ-দুঃখ, মান অপমান, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ববাতের
ঘাত-প্রতিঘাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া, দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে,
অভাব-অনটনের তীব্র-তাড়নায় অষ্টপ্রহর রুধিরাক্ত হইয়া, আধি-

ব্যাধি, শোক-তাপের তীব্র-তাড়নায় নিরন্তর অভিহত হইয়া, পুত্র-কলত্র আত্মীয়-স্বজনাদির ত্রাণভারে প্রণীড়িত হইয়া, বিষম বিষয়-ভোগের অগাধ-সলিলে নিমগ্ন হইয়া, মোহ-রূপ ঘূর্ণাবর্তে সত্তত আবর্তিত হইয়া, অশেষ দুঃখ-কষ্টের নির্ম্মম কশাঘাতে নিরন্তর ক্লিষ্ট এবং মথিত হইয়া, আশ্রয় লাভের উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, মৰ্ম্মস্তদ হা-হত্যাশের মৰ্ম্ম-বেদনায় আৰ্ত্তনাদ করিয়া, নভস্তল বিদীর্ণ করিতেছে; সেই সকল “ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং” মুহমান মানবদিগের পক্ষে ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরি, ত্রিতাপহারী চিরসখা ক্রীহরির পাদাম্বুজ-দীর্ঘনৌকাই প্রকৃষ্ট উপায় ও একমাত্র আশ্রয় স্থল। একদা কোন স্মৃত-হুহিত-কলত্র-ত্রাণ ভারাবৃত জিজ্ঞাসু, ভব-কর্ণধার অবতার আবালবিরাগী শঙ্করাবতার জগদগুরু শঙ্করাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘হে ভব-কর্ণধার অবতার! হে জগদগুরো! হে কৃপাসিন্ধো! হে দীনোবন্ধো! হে দয়ালো! আমি এক্ষণে এই কাম-ক্ৰোধাদি-রিপু-নত্র-সঙ্কুল মোহাবর্ত-চঞ্চল অকূল অপার ভব-পারাবারে নিমগ্ন হইয়াছি, কিছুতেই কোনরূপে কোনও আশ্রয় লাভে সমর্থ হইতেছি না; আপনি কৃপা করিয়া, এই সংসার-সাগর-নিমগ্ন নিরাশ্রয় জনের আশ্রয় কি বলিয়া দিয়া, সংসার-সাগর হইতে পতিত জনকে উদ্ধার করুন।’ তখন ভব-কর্ণধার অবতার জগদগুরু, সুন্দর সরল সার সত্যকথায়, গুরু-গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায়, অপার সংসার-সমুদ্র মধ্যে নিমজ্জিত জীবসকলের হিতের নিমিত্ত,—উদ্ধারের জন্য উত্তর করিলেন;—

“বিশেষপাদাম্বুজদীর্ঘনৌকা।”

প্রশ্নোত্তরী।

‘হে জিজ্ঞাসু! তুমি অপার সংসার-সাগর-তরণেচ্ছুক!—তবে বিশেষর বিশ্বরূপ বিরাটপুরুষ,—সর্বেশ্বর সর্বরূপ সর্ব স্বরূপ,—

ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-মাগর-তরী, ভগবান্ শ্রীহরির যোগীবৃন্দ - মুনিবৃন্দবন্দ্য—বৃন্দারক-বন্দিত পদারবিন্দ-দীর্ঘনৌকাই এই অকূল অপার ভব-পারাবারে,—“সুতদুহিতুকলত্রাণভারাবৃতানাং” মানব-দিগের একমাত্র আশ্রয় ও রক্ষাস্থল; তদ্ব্যতীত কোন আশ্রয় বা উপায় আর নাই। অতএব, হে দাস-দাসী-প্রহরীগণ-পরিবেষ্টিত, মর্ম্মর-প্রসূর-খচিত সুখা-ধবলিত বিশ্বরাজ্য পতাকায়মান উচ্চ সৌধতলে হাস্তদন্ত-বিনির্ম্মিত পর্য্যঙ্কের উপর মনোহর কোমল দুগ্ধফেন-সন্নিভ শুভ্র আস্তরণ-শোভিত শয্যা-সমাসীন, নানাবিধ উপাদেয় ভোগ্যবস্তুর ভোগ করতঃ সুখ-সাগর-মগ্ন মানব! অথবা, হে দারিদ্র্য-দুঃখ-দাবানলে দক্ষীভূত দরিদ্রের শতছিদ্র জীর্ণ-শীর্ণ পলালাবশেষ পর্ণকুটীরবাসী ধূলিশয্যায় শায়িত প্রচণ্ড রৌদ্র-তাপিত বালুকাময় মরুভূমিগত স্নানচ্ছদ বৃক্ষতলে ক্ষুদানলোৎপীড়িতজঠরতানিবন্ধন অস্থির চিন্তে শায়িত মানব! তোমরা কি সত্যই এই অকূল অপার ভব-পারাবার পার হইয়া, সেই চরম-সুখ,—চির-শান্তি,—স্থায়ী-আনন্দের লীলা-নিকেতনে—নিত্যধামে উপনীত হইয়া, অহর্নিশ সুখ-শান্তি-আনন্দ উপভোগ করিবার বাসনা কর? তাই যদি কর,—তবে পুত্র-পরিজন আত্মীয়-স্বজন-পরিবেষ্টিত কোলাহলময় সংসারে থাকিয়া কাহারও সহিত গাঢ়ভাবে মিশা-মিশি করিও না,—কাহারও সহিত বসিয়া বৃথা গল্প-গুজবে সময় নষ্ট করিও না,—বিলাসিতায়—ব্যসন-সেবনে আসক্তি করিয়া, সংসারে ভোগ্যাহরণে আগ্রহ রাখিও না,—উপাদেয়-উৎকৃষ্ট আহার-বিহারে অমুরাগী হইও না,—সংসারের প্রতি উদাস-ভাবাপন্ন হইয়া, দুঃখ-জ্বালা-পরিপূর্ণ সংসারে নির্লিপ্ত-ভাবে অবস্থান করিয়া, অহর্নিশ ভগবচ্ছিত্তায় মন-প্রাণ ডুবাইয়া দাও এবং সকল প্রকার ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, দিন-রাত্রি নীরবে বসিয়া, চির-সুখ-শান্তিময় ভগবানের সুধাসিক্ত নাম কীর্ত্তন ও জপ কর,—আর, জন-সেবায়

আজীবন উৎসর্গ কর,—আর্তের অশ্রু-মোচনে বিনিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হও;—“জীবে দয়া নামে রুচি” করিয়া, এইরূপে ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারিলেই,—“বিশেষপাদাস্বুজদীর্ঘনৌকায়” আরোহণ করিতে পারিবে, তাহা হইলে, ভগবৎ-কুপায় তোমার হৃদয়মধ্যে অনাবিল সুখ-শান্তি সঞ্চারিত হইবে, তোমার জীবনে ক্রমশঃ স্বর্গীয় আনন্দ-আলোক প্রকটিত হইবে, তুমি ব্রহ্মানন্দে চিত্ত ডুবাইয়া, নিত্য সুখের অধিকারী হইয়া, আনন্দময়ের নাম জপ করিতে করিতে, আনন্দ-রসে আপ্ত হইয়া, পাপ-তাপ-পূর্ণ সংসার ছাড়িয়া, এই অকূল ভীম-ভবার্ণবের যোজন-দূর বিস্তৃত উত্তাল তরঙ্গরাশির উপর দিয়া, মায়া-মোহের সূচীভেদ তমোরাশি ভেদ করিয়া, ধীরে ধীরে, সেই সাধারণ কল্লনার অতীত দূর স্থানে—যেখানে কেবলই আলোক, যেখানে সকলই শুভ্রতা, যেখানে কেবলই মঙ্গল, যেখানে সুখ নিত্য, যেখানে সত্য অনন্ত, যেখানে বাসনা বিজিত, যেখানে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত, যেখানে কল্লনা প্রত্যক্ষ,—সেই অভিনব চির-সুখ চির-শাস্তিময়, স্থায়ী-আনন্দের লীলা-নিকেতন—সচ্চিদানন্দ-ভবন নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে উপনীত হইতে পারিবে।’

এইরূপে একদিন রাজাধিরাজ মহারাজ ভক্তপ্রবর পৃথু, এই কাম-ক্রোধাদি-রিপুনক্র-সঙ্কুল মোহাবর্ত-চঞ্চল অকূল অপার দুস্তর ভীম-ভবার্ণবের ভীষণতা উপলব্ধি করিয়া, ভব-কর্ণধার দেবর্ষি সনৎ-কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘ব্রহ্মণ! এই অকূল অপার ভব-পারাবার অতি দুস্তর; কেন না, ইহাতে কাম-ক্রোধাদি রিপু-নক্কু আহর-লোভে করাল বদন ব্যাদান করতঃ অহর্নিশ বিচরণ করিতেছে,—কামনা-প্রলোভনের উত্তাল তরঙ্গ সতত উচ্ছ্বসিত হইয়া ভীষণ গাভীর্ঘ্য প্রদর্শন করিতেছে,—মায়া-মোহের ঘূর্ণাবর্তে সতত চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং ইহা পার হইবার উপায় কি? আশ্রয় কি?

—প্রভো! যাহাতে আমি সহজে ও অনায়াসে এই দুস্পার দুস্তর ভীম-ভবার্ণব পার হইতে পারি ;—এক্ষণে তাহারই সত্বপদেশ প্রদান করিয়া, আমাকে ইহা হইতে উদ্ধার করুন ।’ তদন্তরে দেবর্ষি সনৎকুমার কহিলেন,—

‘কুচ্ছেদা মহানিহ ভবার্ণবমগ্নবেশাং,
ষড়্‌বর্গনক্রমশ্চেন তিতীরিষন্তি ।
সত্বং হরেভগবতো ভজনীয়মজ্জিৎ,
কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণবম ॥’

শ্রীমন্তাগবত । ৪।২২

‘হে রাজন! এই অপার অকূল ভব-পারাবারে কাম-ক্রোধাদি-রিপু-নক্রকুল নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা অতি অসুখকর। যাহারা সেই কাম-ক্রোধাদি রিপু-নক্র-সঙ্কুল অতি দুস্তর ভব-পারাবার উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা যেন ভব-পারাবারের কাণারী, সংসার-সাগর-তরী, ভগবান্ শ্রীহরির ভজনীয় স্তম্ভল শ্রীচরণ যুগলকেই ‘ভেলা’ করেন ; নতুবা তাহারা এই অতি দুস্তর অকূল অপার সংসার-সাগর অতি কষ্টে—বহু আয়াসে উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করেন। অতএব তুমি একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরির ভজনীয় শ্রীচরণ-যুগলকেই ভেলা করিয়া, এই অতি দুস্তর অকূল অপার ভব-পারাবার উত্তীর্ণ হও, ইহাই তোমার পক্ষে অনায়াসসাধ্য সহজ উপায় এবং একমাত্র আশ্রয় ।’ ঐ যে ভীম-ভবার্ণব পার হইবার জন্য অনায়াস-সাধ্য, সহজ লভ্য উপায় পরিত্যাগ করিয়া,—

‘কেচিদভ্যাসযুক্তাশ্চ কেচিদ্ভাখ্যানতৎপরঃ ।

কেচিদুর্দ্ধভুজান্তত্র অঙ্গুষ্ঠাণৈঃ স্থিতাপরে ॥

শিবধ্যানরতাঃ কেচিৎ কেচিদ্ভিক্ষুপরায়ণাঃ ।

বিরাহারশ্চ কেহপ্যত্র কেচিৎ পর্ণাশনে রতাঃ ॥

কন্দমূলফলাহারাঃ কেচিন্মোনিব্রতাঃ স্থিতাঃ ॥

একপাদাঃ স্থিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পদ্মাসনে স্থিতাঃ ।

কেচিচ্চৈব নিরাহারাস্তপস্তপুঃ সুহৃৎকরম্ ॥”

অকূল অপার ভব-পারাবারের যোজন-দূর-বিস্তৃত উল্লোল কল-কল্লোল পর্বতপ্রমাণ উত্তাল-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ণবপোত, ইতস্ততঃ দূরে ও নিকটে ভাসিতেছে এবং কোন কোনটি বা উত্তাল তরঙ্গাঘাতে বিতাড়িত হইয়া, অতি দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আর, অনন্ত দূরে,—মানবের এই মানস-কণ্ঠ্যন মস্তিষ্কের ক্ষীণবুদ্ধির ধারণাতীত, স্মৃতির বহুদূরে অবস্থিত,—কল্পনার সাহায্য ব্যতীত যে স্থানের দূরত্ব অনুভব করা যায় না, সেই স্থানে যে একটি বহুদূর-বিস্তৃত যে একটি চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতির্মান “আকাশমিববিস্তীর্ণং” প্রকাণ্ড আলোকস্তম্ভ, অনন্ত-জলরাশির উপর উদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ;—তরঙ্গাঘাত-বিতাড়িত পোত-সমূহ, ঐ দূরস্থিত উজ্জ্বল সম্মোহন আলোক স্তম্ভের প্রতি লক্ষ করিয়া ছুটীয়া চলিয়াছে । কোনও আশা নেই, কোনও ভরসা নাই ; কাহারও হাইল নাই, কাহারও পাল নাই, কাহারও গুণ নাই, কাহারও বা দণ্ড-পর্যাস্তও নাই ; অথচ, ভিন্ন ভিন্ন পোতে ভিন্ন ভিন্ন আরোহিণী,—কেহ বা যম-নিয়ম, আসন-প্রাণায়াম, প্রত্যাহার-ধারণা, ধ্যান-সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসযুক্ত হইয়া, আয়াস-সাধা কঠোর সাধবা-পথ বহিয়া,—ক্ষিপ্ত আত্মাকে শাস্ত করিয়া, দুর্জয় ষড়্‌রিপু সংযত করিয়া, ছরন্ত ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, রুদ্ধেন্দ্রিয় হইয়া, একাগ্রচিত্ত হইয়াছেন,—কেহবা অনন্ত শাস্ত্রের সার অমুসন্ধিৎসু হইয়া, অনন্ত শাস্ত্রালোচনায় মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া, সারতত্ত্বের বহুদূরে রহিয়া, বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত এবং বামন হইয়া চন্দ্রস্পর্শের বৃথা কল্পনায় অমুপ্রাণিত হইয়া, জ্ঞান-সমুদ্রের বহু দূরে

পড়িয়া, পুরোভাগেও না পৌছিয়া, আপনাকে মহাজ্ঞানী মনে করিয়া, বিছাভিমাণে বুক ফুলাইয়া, ক্ষীতবক্ষে বাক্যাড়ম্বরে তেজস্বী ও বর্ষীয়ান গুরুর গুরু-গভীর আদেশ-বাক্যের ওজস্বিনী ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে ব্যাখ্যান প্রদানে তৎপর হইয়াছেন। কেহ বা কখন অনশন, কখন অর্দ্ধাশন, কখন একাশন করিয়া, কেবলই আত্মাভিমাণে— আত্ম-গরিমায় ফুলিয়া, আড়ম্বরের সহিত উর্দ্ধবাহ হইয়াছেন। কেহ বা কখন পর্ণাশন, কখন জলাশন, কখন বায়ু ভক্ষণ করিয়া, একাগ্র-চিত্ত হইয়া, কেবলমাত্র পাদাদুষ্ঠাত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন কেহবা চর্জ্জয় রিপুবর্গ সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়গণের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ বিরাট-পুরুষ অসীম অনন্ত মহাদেবকে সসীম সান্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া, নিরন্তর ধ্যানে মগ্ন হইয়াছেন। কেহ বা পুল-পরিজন—আত্মীয়-পরিবেষ্টিত বৃহৎ সংসার পাতিয়া, সংসার মধ্যে থাকিয়া,—অথচ, সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সংসারে না মজিয়া, সংসার কল্লোল-কোলাহলের অন্তরালে বসিয়া, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী—সংসার-সাগর-তরী ত্রিতাপহারী ভগবান জীবিস্বর পূজা অর্চনায় নিরত হইয়াছেন। কেহ বা সংসার হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়া, যেখানে সংসার-কোলাহল প্রবেশ করিতে না পারে, এমন ঠান-সমাগ-শূন্য সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল নির্জজন ঘোরারণ্যে, অনাহারে অনিদ্রায় যোগাসনে নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপবৎ অচঞ্চল অবস্থায় উপবিষ্ট হইয়াছেন। শরীরে বলাকীকম্প সঞ্চারিত হইতেছে, তৎপ্রতি ভ্রক্ষেপ নাই; একাগ্রচিত্তে ভগবদ্ধানে মগ্ন রহিয়াছেন। কেহবা শুষ্ক পর্ণভোজী হইয়া, ভস্ম-বিলেপিতঅঙ্গে পঞ্চাগ্নিমধ্যে অবস্থিত হইয়াছেন,—কেহ বা কন্দ-মূল-কলাহারী হইয়া, পতিতপাবনী গঙ্গার পবিত্র তীরে অবস্থিতি করিতেছেন। কেহ বা স্ত্রী-পুত্রের মায়া-মমতা পরিত্যাগ কামনায়

সর্বভাগী নিঃসঙ্গ হইয়া, সংসার-কোলাহলের অন্তরালে বসিয়া, মায়া হাত এড়াইবার মানসে লোকের সহিত আলাপ করিলে— কথা কহিলে, পাছে মায়া জন্মে, এই ভয়ে লোকালয়ের ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, মায়ায় গণীভেদ করিয়া, বাক্‌সংঘম সাধনায় মৌনাবলম্বন করিয়াছেন।—কেহ বা দ্রুত কৃতান্ত-ভয়ে ভত হইয়া, গৃহ-ধন-জন সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, আপন দেহের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া, অলোক-রূপী ভগবান—কারুণ্য-প্রাণ করুণা-নিদান জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য-নারায়ণের উপাসনায় একপদে দাঁড়াইয়া, কঠোর-কৃচ্ছ্র উগ্র তপঃ-সাধনায় নিরত হইয়া জপ করিতেছেন। কেহ বা সংসারের অন্তরালে বিবিক্তস্থানে আসন পাতিয়া, আড়ম্বরের মিথ্যা ভান ছাড়িয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, স্বকীয় কল্পনাবলে হৃদয় মাতাইয়া, একাগ্রতার সহিত স্বকীয় হৃদয়-কন্দরে জ্যোতির্ময় আত্মারূপকানে—আত্ম-ধ্যানে মগ্ন হইয়া, সতত পদ্মাসনে স্থিত হইয়াছেন। আবার কেহ বা রাজসিক বা তামসিক ভাবে কেবলমাত্র অনাহার করিতেছেন; এইরূপে নানা-প্রকার বৈকুণ্ঠের পথিক, নানাভাবে, অকূল অপার ভব-পারাবার পার হইবার মানসে নানা প্রকার শূদ্রের কঠোর-কৃচ্ছ্র উগ্র তপঃ-সাধনায় নিরত হইয়া প্রাণপাত করিতে বসিয়াছেন। কিন্তু,—

আস্তিক্য নাস্তিক্যৈশ্চৈব নিরতাঃ সংযমেহপরে।

অপ্রজ্ঞানং তমোভূতং প্রজ্ঞানন্ত প্রকাশিতাঃ ॥

মহাভারত।

ইহাদের মধ্যেও আবার কেহ বা আস্তিক, কেহ বা নাস্তিক, কেহ বা সংযমী, কেহ বা অসংযমী, কেহ বা জ্ঞানী, কেহ বা অজ্ঞানীও আছেন। এই প্রকার নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোত-সমূহ, এই অনন্ত বীচি-বিক্ষুব্ধ, অনন্ত জলরাশি ভীম-ভবার্ণবের যোজন-দূর-বিস্তৃত উত্তর পর্ব্বতপ্রমাণ উত্তাল তরঙ্গরাশির উপর উঠিতেছে ও পড়িতেছে;

যিনি আন্তিক, তিনি পার্থিবতার ভিতর দিয়া,—জড়োপাসনার ভিতর দিয়া,—সংসারে থাকিয়া পরাধীনতার ভিতর দিয়া,—রাজসিক, তামসিক বা সাত্বিক পূজার ভিতর দিয়া,—ভব-পারাবারের কাণ্ডারী ভগবান্ শ্রীহরির পূজায় নিরত হইয়াছেন। আর, যিনি নাস্তিক, তিনি বিবিধ বর্ণানুরঞ্জিত সুন্দর পতাকায পোত সাঙাইয়া, বহু-মণি-মাণিক্য ক্ষণ-বিক্ষংসী—যাহা লীলাময়ী প্রকৃতিদেবীর ক্ষণিক ফুৎকারে উড়িয়া যায়, বারিবিন্দু-বিক্ষেপিত হইলে মুহূর্ত্তে গলিয়া যায়—এই বিধাতার খেলার ক্ষুদ্র মাটির পুতুল, যাহার আয়ু-বায়ু প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রতিমুহূর্ত্তে পরিমাণ গণিতেছে, সেই দেহ-পোত খচিত করিয়া, কর্তব্য ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া, সংসারকে ভুলিয়া, ভগবান্কে ভুলিয়া, সব ভুলিয়া, আপনাকে সর্বশক্তিমান্ ভাবিয়া,—‘ঈশ্বরোহমহং ভোগী সিদ্ধোহং বলবান্ সুখী’ বলিয়া, আমিরের মহান্ বোঝা বুলে করিয়া,—‘আঢ্যোহিভিজনবান্শি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া’ বলিয়া, প্রভুত্বের অভিমান, মহত্বের অভিমান, বিজ্ঞার অভিমান, ধনের অভিমান, জনের অভিমান, বুদ্ধির অভিমান, রূপের অভিমান, জ্ঞানের অভিমান, ক্ষমতার অভিমান আর অভিমানের অভিমান,—এইরূপ অনন্ত অভিমানের বিশাল পর্বত বক্ষে চাপাইয়া, ফীতবক্ষে বুক ফুলাইয়া,—‘যাবৎ জীবৎ সুখং জীবৎ ঋণং কৃতা যতং পিবেৎ’ ভাবিয়া, আত্মপূজায় নিরত হইয়া, ঘোর আত্মাভিमानে কখনও আপনাকে ক্ষুদ্র ভাবিতে পারে না,—যাহা আপনার বলিয়া ভাবিতেছে, যাহাকে পাইয়া আত্মাভিमानে বড় হইতেছে,—চির-জীবন যাহার সহিত অভিন্নভাবে বাস করিতে হইবে, প্রতিনিয়ত যাহার পরিচর্যা ও রক্ষার চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে পুনঃ পুনঃ গন্ধান্বলেপন জন্য এত ব্যাকুলতা, তাহা কয়দিনের জন্য বা কাহার ক্ষমতায় পরিচালিত? তাহা না ভাবিয়া, মিথ্যা

মোহ-মদে আচ্ছন্ন হইয়া, আড়ম্বরে ফুলিয়া ফুলিয়া, দিগ্বিদিক-জ্ঞান, শূন্য ও দর্পাভিমানে গর্বিত এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, বায়ুভরে উত্তাল-তরঙ্গে হেলিয়া ছলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আর, ঐ যে শুষ্ক জ্ঞানী, জ্ঞান গরিমায় গর্বিত হইয়া,—“মোহমো মোহমো মোহমো মোহমো” মত্তরাং “অহং ব্রহ্মাস্মি” বলিয়া, সাধন-চতুষ্টয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, যট সম্পত্তি নাশ করিয়া, মনুষ্যত্বের মর্ম্মকথা ভুলিয়া, মহা আড়ম্বরে ফুলিয়া ফুলিয়া, দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া, আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া লোক-সমাজে পরিচয় দিয়া, একাগ্রতা হারাইয়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, উল্লোল কল-কল্লোল উত্তাল তরঙ্গের উপর উঠিতেছে ও পড়িতেছে; আর, ঘাত-প্রতিঘাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া, কেবলই ছুটিয়া চলিয়াছে। আবার ঐ যে একটি ক্ষুদ্র-পোত, অজ্ঞান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া, পুত্র-কলত্রাদির মায়া-মোহের কুহেলিকায় দিশাহারা হইয়া, মর্ম্মর-নির্ম্মিত মৌখ-অট্টালিকায় মগ্নপমায়ে সোনার প্রতিমা সযতনে সাজাইয়া, ঢাক-ঢোল প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র বাজাইয়া, আমোদ-প্রমোদে সতত ব্যাপ্ত হইয়া, সংসার-কল্লোল-কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া, দূরদর্শন-বিহীন হইয়া অকূল অপার ভব-পারাবারের ভীষণ-তুফানে পড়িয়াছে; কোন আশা নাই, ভরসা নাই, আশ্রয় নাই, লক্ষ্য নাই, কেবল উত্তাল তরঙ্গের উপর উঠিতেছে ও পড়িতেছে; আর দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হইয়া চলিয়াছে। আর, ঐ যে জীর্ণ শীর্ণ দেহ পোতে আরোহণ করিয়া সংযমী, সাধ্য-সাধনায় মানব-জীবন, দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করা বড় দুষ্কর তপঃসাধনার ফল,—ইহা ধারণা করিয়া, মমতাময়ী পরিবেষ্টিত সংসারের অন্তরালে নির্জন বনে বসিয়া, উন্মাদিনী নয়ন-মানাকর্ষণকারিণী কামিনীকে মৃত্যুসমজ্ঞানে এমন কি,—“ন পশ্যেদ্বিখিতামপি” বিশ্বাস করিয়া, হৃদয় হইতে কাম-কেলিকে অনেক

দূরে অপস্থত করিয়া, মমতাময়ীদের প্রতি নির্মম হইয়া, সংযম-সাধনায় নিরন্তর নিরত রহিয়া, মনুষ্যত্বের আবরণে জড়ের অন্তর্নিহিত চৈতন্য-শক্তিকে জড়ীয় দেহাধারে আকর্ষিত করিয়া, পূর্ণত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে আলোক-সুস্তের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যোজন-দূর-বিস্তৃত উত্তাল তরঙ্গরাশির অভিঘাত সহ করিয়া, সূচীভেদ তমোরাশি ভেদ করিয়া, সর্বসংসার কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, ধীরে ধীরে আলোক-সুস্তের প্রতি ছুটিয়া চলিয়াছেন। আবার, ঐ যে জ্ঞানী, জীর্ণ-শীর্ণ ক্ষুদ্র দেহ-পোতে আরোহণ করিয়া, জ্ঞানবলে কৰ্ম্মবেষ্টনী ভেদ করিয়া, মায়ার গণ্ডী পার হইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার পূর্ণ-মিলনের তিরণায় মন্দির-সদৃশ স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মশক্তি-প্রতিকলিত গুহ্রত্বে,—মনোরাজ্যের মহাদেবতার জ্যোতির্ময়ী প্রভায়,—মনোমর কোষস্থিত উজ্জল-সম্মোহন গুহ্র দেবতা—কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্ময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর চির-উজ্জল চির-জ্যোতিষ্মান্ গুহ্রত্বে,—অন্তলক্ষ্য স্থাপন করিয়া, ধ্যান ধারণার সাধনা পথ বহিয়া, সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন ও ষট্-সম্পত্তিলাভে শক্তিমান্ হইয়া, ব্রহ্মনাম জপ করিতে করিতে, ভীম-ভবার্ণবের উত্তাল তরঙ্গ-রাশির ঘাত-প্রতিঘাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া, স্থির, গম্ভীর ও নিশ্চল আলোক-সুস্তের প্রতি ছুটিয়া চলিয়াছেন। আর কতকগুলি জীর্ণ-শীর্ণ-দেহ ঐকান্ত ভক্ত,—“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সতিষ্ণুতা” হইয়া, দীনতা হীনতা নীচতাকে অঙ্গের চির-ভূষণ করিয়া, প্রেম-ভক্তির উৎসে হৃদয় মাতাইয়া, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অমূল্য রত্নে হৃদয় খচিত করিয়া, বিবেক-বৈরাগীর গুহ্রবস্ত্রে ও—‘জীবে দয়া নামে রুচি’ বহু মণি-মাণিক্যে দেহ সাজাইয়া দাস্ত্রভাবে সাধনাপথ বহিয়া, হরিনাম-মহাযজ্ঞে সাম্প্র-দায়িকতা আহুতি দিয়া,—“বিশ্বেশপাদাসু জদীর্ঘনৌকায়”য় আরোহণ করিয়া, নাম-রূপ মোহিনীশক্তিসম্পন্ন প্রাণানন্দ-দায়িনী স্পন্দন—

তড়িচ্ছক্তিতে শক্তিমান হইয়া, ঐ যে—

“গায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচিৎ,

নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমন্তি কেচিৎ ।

পঠন্তি কেচিৎ প্রচরন্তি কেচিৎ,

প্লবন্তি কেচিৎ প্রলপন্তি কেচিৎ ॥”

“অনন্দাশ্রুপুলকেন” আকুল-প্রাণে কেহ কেহ—“হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দসৌরে” গাহিতেছেন ; কেহ বা প্রেমোন্মত্ত হইয়া, উদ্ভ্রাস্তের ন্যায় উদ্ভ্রাস্তভাবে উচ্চহাস্য করিতেছেন ; কেহ কেহ বা প্রেমোন্মত্ত হইয়া উন্মাদের ন্যায় উদ্ভ্রাস্তভাবে উচ্চৈঃস্বরে,— “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে” বলিয়া উদ্যম তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন ; কেহ কেহ বা নভশিরে যোড়করে—কেহ কেহ বা দণ্ডবৎ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া,—গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সূক্তং” ত্রিতাপহারী চিরসখা জীহরির চরণে প্রণাম করিতেছেন । কেহ কেহ বা—“হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে” বলিয়া, নৃত্য সহকারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন । কেহ কেহ বা—“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে” বলিয়া, ভীম-ভবার্ণবের উত্তাল তরঙ্গে উঠিতেছে ও পড়িতেছে ; আর, ঘাত-প্রতিঘাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া, কখন বা সংসার-সাগরের অতল-তলে নিমজ্জিত হইতেছেন । কেহ কেহ বা কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া, অকূল অপার ভীম-ভবার্ণবের যোজন-দূর-বিস্তৃত উল্লোল কল-কল্লোলময় পর্বত-প্রমাণ উত্তাল তরঙ্গরাশির অভিঘাত সহ্য করিয়া, মায়া-মোহের সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া, সর্বসংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, দাস্যভাবে ও প্রেম ভক্তিতে হৃদয় আগ্রত করিয়া, বাকুল একাগ্রতায়—“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে” গাহিতে গাহিতে, কখনও বা অলৌকিক ভাষার কত কি কহিতে কহিতে, সেই সাধারণ কম্পনার অতীত দূরস্থানে

যেখানে কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্ষ্ময়—“গতিভর্তা
 প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সূত্রং” ত্রিতাপহারী ভব-পারাবানের
 কাণ্ডারী সংসার-সাগর-তরি, চিরসখা ভগবান্ শ্রীহরি বিরাজমান,
 সেইখানের সেই “আকাশমিববিস্তীর্ণং” স্থির, নিশ্চল ও গম্ভীর চির-
 উজ্জল চির-জ্যোতিষ্মান্ আলোকসুস্তের প্রতি ছুটিয়া চলিয়াছেন।
 সকলেরই লক্ষ্য—এক। লক্ষ্য—সেই “আকাশমিববিস্তীর্ণং” চির-
 উজ্জল চির-জ্যোতিষ্মান্ আলোকসুস্ত। তাঁহারা সকলেই কি আলোক-
 সুস্তের নিকট উপস্থিত হইতে পারিবেন? উহারা কি মায়া-
 মোহের অনন্ত অন্ধকার—সুপীড়িত তমোরাশি ভেদ করিতে পারি-
 বেন না? কি জানি, কাহার ভাগ্যে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িবে,—
 কাহার ভাগ্য কবে সুপ্রসন্ন হইবে,—অকূল অপার ভীম-ভবান্বিত
 নিরাপদে পার হইয়া, তথায় উপনীত হইতে পারিবেন?—

যে মানবা বিগতরাগপরাপরজ্ঞা,

নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি।

তে ধৌতপাণ্ডুরপটা ইব রাজহংসাঃ,

সংসারসাগরজলম্ভ্য তরন্তি পারম্॥

বামনপুরাণ। ৯৪

যাঁহারা এই মায়াময় সংসারে বীতরাগ অর্থাৎ পুত্র-কলত্র,
 ধনৈশ্বর্য্য ও দেহ-গেহাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, মায়া-
 মোহ-পরিশূন্য হইয়াছেন এবং নিত্যানিত্য-বস্তু-বিচারে দক্ষ এবং
 পরাপর-জ্ঞান-শূন্য হইয়া, স্থাবর-জঙ্গমাঙ্ক প্রাণি-সমূহকে আপন প্রাণ-
 সম জ্ঞান করিয়া, ভালবাসিতে পারিয়াছেন ও সংসার-সাগরের-ভীষণতা
 উপলব্ধি করিয়া, সংসারের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি ঘৃণাকরতঃ
 সংসারের অন্তরালে থাকিয়া, সংসার-সাগর-তরি ভগবান্ শ্রীহরিকে
 স্বকীয়-হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে প্রতিষ্ঠা করিয়া, অহর্নিশ চিন্তা করিতে

ও তাঁহার সুখাসিত্ত নাম কীর্তন করিতে পারেন ; তাঁহারাই এই কামনা-প্রলোভন—মায়া-মোহময় সংসারে অবস্থিত হইয়াও, ধোত-পাণ্ডর-পট রাজহংসের ত্রায় বিরাজ করিতে থাকেন এবং এই সংসার-জলধি অনায়াসে পার হইয়া, অস্তিম্বে সেই প্রদীপ্ত অপাপ-বিদ্ধ দেবারাধ্যলোক বৈকুণ্ঠে উপনীত হইতে পারেন। মহামতি স্মৃত্যুনি কহিয়াছেন,—

“জিহ্বাগ্রে বর্ততে যন্ত হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।

সংসারসাগরং তীৰ্ণা স গচ্ছেদ্বৈষং পদম্॥”

গরুড়পুরাণ। পূর্ব। ২৩২

‘ভগবান্ শ্রীহরির যে ভবতারণ ‘হরি’ এই নাম আছে, তাহাই সংসার-সাগরাতিক্রমণের পাথের স্বরূপ,—‘হরি’ এই নাম সর্ব-শান্তিপ্রদ, এই নাম জপ, কীর্তন ও স্মরণ করিলে, নরগণ মুক্তি-লাভ করিতে পারে। যিনি ‘হরি’ এই দুইটি বর্ণ জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করেন, তিনি অনায়াসেই এই সংসার-সাগর পার হইয়া, সেই পরমপদে গমন করিয়া থাকেন।’

মানুষ, দেবতার আরাধনা করে কেন? তাহার একমাত্র মুখ্য প্রয়োজন—ইহলোকে অভ্যুদয় ও সুখ-শান্তির সঙ্গে চিন্তা-বিস্তৃতির সাধন এবং পরলোকে নিঃশ্রেয়সোলাভ। ক্রোধাদি হীনবৃত্তিগুলিকে সংযমিত করিয়া, হৃদয়ের পবিত্র ভাবগুলিকে অর্থাৎ দয়া-দাক্ষিণ্য, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, বিবেক-বৈরাগ্য, জ্ঞান-ভক্তি প্রভৃতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জ্ঞানই সাধন-জগতের সৃষ্টি। মনুষ্যের আধ্যাত্মিকতা, পার্থিবতার ভিতর দিয়া ইহা যেন স্মরণ থাকে ;—‘মনুষ্যের জীবন’—ব্রহ্মচর্যের জ্ঞান, সংযমের-জ্ঞান, চিন্তা-শুদ্ধির জ্ঞান, সাধিকতার জ্ঞান, সাধনার জ্ঞান এবং ভগবদুপাসনার জ্ঞান—এ কথা মনুষ্যের প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের স্পন্দন-তরঙ্গের সহিত বিঘোষিত হইতেছে। সুতরাং মনুষ্য-যোনিতে

জন্মগ্রহণ করিয়া, মনুষ্যের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে পুষ্ট হইয়া, মনুষ্যত্বের কোলে লালিত পালিত হইয়া, মনুষ্যত্বের জন্য জীবন-মরণব্যাপী সাধন করিতে পারিলেই, মানব প্রকৃত মানব নামে পরিচিত হইতে পারে ; নতুবা মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করিলে, মনুষ্য কি করিয়া মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করিবে ? বাহ্যতে মনুষ্যত্বের অভাব, সে ত পশুরও অধম । এই ঘোর কলিকালে, মনুষ্যত্বলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা সহজ উপায় একমাত্র হরিনাম-সাধন, তত্ত্বিন্ন—“নাস্ত্যেব-গতিরন্যথা ।” কেবল হরিনাম সাধন করিলেই চিন্তাশুদ্ধি হয়, হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে এবং ভক্তিবলে মনুষ্য যুক্তিলাভে সমর্থ হয় । হরিনাম সাধনে এমন শক্তি উৎপন্ন হয় যে, যোগ-সাধক যোগীও সে শক্তিলাভ করিতে, এত সহজে ও সহজে সমর্থ নহেন ; কেন না, হরিনাম সাধন করিলে, অনায়াসেই সম্বরে সাধকের—“ভিদ্যাস্তে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্যাস্তে সর্বসংশয়াঃ” স্মৃতরাং সম্বরেই কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হইয়া ষড় চক্র ভেদ করিয়া, সহস্রার-অভিমুখে গমন করেন এবং শক্তি ও শক্তিমানের সম্মিলনে সাধক জীবনমুক্ত হন । কেবল হরিনাম করিলেই সাধক জীবনমুক্ত হইবে, ইহা সম্পূর্ণই অসম্ভব ? অসম্ভব নহে, সকলই সম্ভব । হরিনাম সাধনে প্রাণ-শক্তির ক্রিয়া এমন মুহু হইয়া পড়ে যে, হঠযোগী বহু আয়াসে প্রাণ-স্পন্দন নিরোধ করিয়াও সে শক্তি লাভ করিতে সম্বরে পারেন না । যেরূপ বহির্জগৎ বায়ম বা বায়ুর তরঙ্গে স্পন্দিত ; হরিনাম সাধন করিলে, মানবের শরীরস্থ প্রত্যেক অণু-পরমাণু-স্বরূপ যন্ত্রগুলি ভেদ করিয়া, বায়ু বা বায়ম শক্তিও স্পন্দিত বা প্রবাহিত হইয়া থাকে । মনও সেই সঙ্গে স্পন্দিত হয় এবং শরীরস্থ শিরা-প্রতিশিরা-ধমনী প্রভৃতিও স্পন্দিত হইয়া উঠে ; তাহাতেই নাম-সাধকের পুলকাদি উদ্ভূত হইয়া থাকে । যে প্রকার বহির্জগতের স্পন্দনরাশি সাধারণতঃ আমাদের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়

দ্বারা, আমাদের মনে বা মনোময় কোষে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া, কতকগুলি স্থায়ী তরঙ্গ উৎপন্ন করে, তদ্রূপ নাম সাধন করিলে, যৎকালে চিত্ত নামরসে আবদ্ধ হয়, তৎকালে বহির্জগদ্বিষয়িনী চিন্তা, অন্তঃসুখী হইয়া, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় পঞ্চককে নিস্তেজ করিয়া ধ্যান ধারণাদির স্পন্দন-তরঙ্গে মিলিত হইয়া, মনোময় কোষে ব্যোম-শক্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, আপনা হইতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বদ্ধ হয়। সাধনা না করিলে, এ ভাব উপলব্ধি করা যায় না, সাধকগণ এ ভাব উপলব্ধি করিয়া, সদানন্দে মগ্ন থাকেন। যাহার মনোময় কোষ নানা-বিষয়িনী শক্তির স্পন্দন-তরঙ্গরাশিকে বিশেষরূপে প্রত্যাখ্যান করিতে করিতে, প্রকৃত 'অজপা গায়ত্রী' স্পন্দনটি চিনিয়া, দৃঢ়রূপে আকর্ষণ করিয়া, ধরিতে পারে,—আর, কিছুতে তাহা প্রত্যাখ্যান করে না; তিনিই হরিনামের নাদ বা হৃদয়-গুহাশায়ী প্রাণের দেবতার অঙ্গ-প্রসূত জ্যোতিঃরাশির স্পন্দন-তরঙ্গের অনুভূতি-জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইতে পারেন। আকাশ ও অগ্নি হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়, সেই বায়ু নাভি হইতে সমুৎপত্ত হইয়া, মুখ দিয়া বহির্গত হইলে তাহাকে নাদ বলে। অর্থাৎ বায়ু নাভির উর্দ্ধ হইতে সমুচ্চারিত হইয়া, শব্দরূপে মুখ দিয়া বহির্গত হয়, তাহাকেই শব্দ বলা যায়। তাহা চেতন প্রাণী বা অচেতন প্রাণী অর্থাৎ স্বাবর-জঙ্গমাণ্ডক উভয় প্রাণীর নাভি হইতে উৎপত্তি লাভ করতঃ শব্দ-রূপে মুখ দিয়া বহির্গত হইয়া থাকে। যেমন বীণা বদ্ধ হইলে, স্নমধুর শব্দ উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ কায়-রূপ বীণা-দণ্ড বদ্ধ হইলে, স্নমধুর শব্দোৎপত্তি হইয়া থাকে। কায়, বীণা ও বংশী—এই ত্রিবিধ পদার্থ হইতে নাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাহাকে যোগ-শাস্ত্রে যোগীগণ ব্রহ্মের স্থান বা ব্রহ্মগ্রন্থি বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রাণবায়ু অবস্থিত; সেই প্রাণবায়ু হইতে অগ্নি সমুদ্ভব হয়, অগ্নি ও বায়ু—

এতদ্ব্যভয়ের সংযোগে নাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে । সুতরাং,—

ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ ।

ন নাদেন বিনা রাগস্তান্মাদাত্মকং জগৎ ॥

ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ ।

নাদরূপং পরং জ্যোতিনাদরূপী পরং হরিঃ ॥

সঙ্গীত দামোদর ।

সেই নাদ ব্যতীত গীত, স্বর, রাগ-রাগিনী প্রভৃতি উৎপত্তি হইতে পারে না । অতএব, এই জগৎ নাদাত্মক । এমন কি, নাদ ব্যতীত জ্ঞানোদয় হওয়া অসম্ভব, নাদ ব্যতীত জীবের শিবত্ব অসম্ভব ; কেন না, যোগিগণে যোগাসনে যে জ্যোতির ধ্যানে আত্মীবন ব্যতীত করেন, তাহাতে নাদ-রূপ এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরিও নাদরূপী । অর্থাৎ বহির্জগতে যেমন সমস্ত পদার্থ-নিচয়ের রূপ বা বর্ণ আছে, সাধন-জগতে বা অন্তর্জগতেও তেমনি সাধনার হিরণ্যজ্যোতিঃ আছে, যোগ-চক্ষুস্থান্ যোগীমাত্রই তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকেন । অতএব যদি উহা উপলব্ধি করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে, হরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজনাদির আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক, সংসারের অন্তরালে বসিয়া, ঐ যে উজ্জল-সন্মোহন কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে ; ঐ যে অপাপবিদ্ধ দেবা-রাধা নিত্যধাম বৈকুণ্ঠকে আলোকিত করিয়া, দ্রুত-বিচ্ছুরিত রশ্মি-জালকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, বৈকুণ্ঠের পথিক ও পোতস্থিত নাবিক-গণকে পথ প্রদর্শন জন্য “আকাশমিব বিস্তীর্ণং” প্রকাণ্ড আলোকস্তম্ভ, অনন্ত জলরাশির উপর, উর্দ্ধ অনন্ত অক্ষকারের মধ্যে, স্থির, নশ্চল ও গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ;—উহাই একমাত্র লক্ষ্য, উহাই একমাত্র উদ্ধার-কেন্দ্র । উহারই প্রতি লক্ষ্য স্থির করিয়া,—বিশেষপাদাযুজের পূজায় নিয়ত হও, অনায়াসে ঐখানে উপনীত হইতে পারিবে ;

ঐ দূরস্থিত উজ্জল আলোকস্তম্ভের নিকট যাইতে পারিলে,—মানুষ
নিরাপদ হইতে পারে।

যে যজন্তি দৃঢ়য়া খলু ভক্ত্যা,

বাসুদেবচরণাশুজ যুগ্মম্।

বাসবাদি বিবুধ প্রবরেড্যাং

তে ব্রজন্তি মনুজাঃ খলু যুক্তিম্ ॥

পদ্মপুরাণ। ক্রিয়া। ১৫

ভব-পারাবাবের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরি ত্রিভাপহারী ভগবান্
বাসুদেবের চরণাশুজ যুগল দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ গূজা করিয়া
থাকেন, যাঁহারা দৃঢ় ভক্তিযোগ-সহকারে সেই পাদপদ্ম যুগল বন্দনা
করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মুক্তি প্রাপ্ত হন।

শাস্ত্রাঙ্কিং সকলাং বিলোভ্য নিতরাং গ্রন্থঃ কুতোহয়ং ময়া,

লোকানন্দকরঃ সমস্তশুফলাসন্তান জৈবাতৃকঃ।

অশ্রাস্বাদ্যভক্তিশুধামৃতরসানানন্দপূর্ণান্তরাং,

সন্তঃ সম্প্রতি নাকবাসনিতরান্ দেবান্ হসন্ত ব্রুবম্ ॥

—(০)—

গুরাঃ কৃপা ।

—•—

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, এক্ষণে বুঝিলাম যে, কলিকালে হরিণাম সাধন ব্যতীত ভীষের—“নাস্ত্যেব গতিরন্যথা” সুতরাং যাহারা নামে নিষ্ঠা করিতে পারিবেন, তাহারা অনায়াসেই এই ভীম-ভবার্ণব পার হইয়া, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য লোকে উপনীত হইতে পারিবেন ; সন্দেহ নাই । কিন্তু, পূর্বে যে, ভগবানের একাদশটি নাম জপ ও কীর্তন করিতে উপদেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট নাম কোনটি ?

বিষ্ণুনাথ্যঃ সর্বেষাং সর্বাং সারং পরাংপরম্ ।

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম সুন্দরং ভক্তি দাস্যদম্ ॥

ককারোচ্চারণাস্ত্যুক্তঃ কৈবল্যং জন্মমৃত্যুহম্ ।

ঋকারাদাস্যামতুলং ষকারাস্ত্যুক্তিনিশ্চলা ॥

ণকারং সহবাসঞ্চ তৎসমং কামমেব চ ।

তৎস্বারূপং বিসর্গাচ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

— ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ । জন্ম । ১৩

ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরি, ত্রিতাপহারী, সর্বজীবের—“গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ” ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অনন্ত নামের মধ্যে একাদশ নাম উত্তম ; একাদশ নামের মধ্যে আবার “কৃষ্ণ” এই সুধাসিক্ত অমৃতময় সুন্দর নামটি সর্বোৎকৃষ্ট । কেন না, এই সুধাসিক্ত নামটি সমস্ত নাম হইতে সারভূত, পরাংপর, মঙ্গলময় এবং ভক্তি ও দাস্যপ্রদ । ভক্তব্যক্তি নামের আদ্যক্ষর ককার উচ্চারণেই জন্ম-মৃত্যুহর ‘কৈবল্য’মুক্তি লাভ করে এবং ঋকারোচ্চারণে অতুল দাস্য, ষকারোচ্চারণে নিশ্চলা ভক্তি, ণকারোচ্চারণে

তাহার সহিত অভিলষিত সহবাস ও বিসর্গোচ্চারণে তাহার সারূপ্য লাভ করে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ‘কুব’ ধাতুর অর্থ নির্বাণ, ণকার মোক্ষবাচক, অকার দাতৃবাচক; অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সেই সমস্ত গুণ আছে বলিয়া, প্রভু কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অনন্ত কোটি নাম স্মরণ করিয়া, মানব যে ফল লাভ করে,—“কৃষ্ণ” এই নামটি একবার মাত্র স্মরণ করিলেই, তদ্রূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। কৃষ্ণনাম স্মরণে মানবের যেরূপ পুণ্য হয়,—কথনে, শ্রবণেও কীর্তনেও তদ্রূপ ফললাভ করিয়া থাকে।

এমন কি,—

কৃষ্ণে রতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি,
রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুখিতা য়ে ।
তে ভিন্নদেহাঃ প্রবিশন্তি কৃষ্ণং,
হবির্ঘৃথা মদ্রুহতং হৃতাশে ॥

ব্রহ্মপুরাণ । ১৭৭

কৃষ্ণনাম স্মরণ ও কীর্তন করিলে, মানব কোটি কোটি জন্মার্জিত পাপরাশি ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং যাহারা ত্রিতাপহারী সর্বপাপ প্রশমনকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে রত হইয়া, অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণকেই অনুস্মরণ করে, রাত্রিকালে উত্থান করিয়াও, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই ভাবনা করে, তাহারা দেহান্তে—অন্তিমকালে সর্ববাসনামুক্ত হইয়া, প্রজ্জলিত হৃতাশনে মদ্রুহত হবির ন্যায় ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, কি ব্রহ্মচর্য্য, কি গার্হস্থ্য, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাস,—এই চতুরাশ্রম,—কি ধর্ম্ম, কি সদাচার,—এ সমুদয় সম্যক্ প্রকারে অঙ্গসহিত আচরিত হইলেও, কদাপি কৃষ্ণনামতুলা ফলপ্রদ নহে। সুতরাং ধর্ম্ম, কর্ম্ম, তপস্যা, তীর্থ-পর্য্যটন প্রভৃতিও কৃষ্ণনামসদৃশ ফলপ্রদ নহে; এমন কি সৃষ্টি, সায়ুজ্য সারূপ্য ও

ও জ্ঞালোক্য এই চারি প্রকার মুক্তিসাধনও কৃষ্ণনাম-তুলা হয় না অর্থাৎ কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম স্মরণ, শ্রবণ ও কীর্তন করিলেই, উক্ত চতুর্বিধা মুক্তি করন্তলগত হয়। অতএব, কৃষ্ণনামই পরামুক্তি, কৃষ্ণনামই পরাগতি, কৃষ্ণনামই পরম পুণ্য, কৃষ্ণনামই পরম ফল, কৃষ্ণনামই পরম ধর্ম, কৃষ্ণনাম কীর্তনই পরম ভপশ্রা বলিয়া জানিবে। কৃষ্ণনাম কীর্তনেই পরাশান্তি লাভ হয়। সুতরাং কৃষ্ণনাম কীর্তনই পরাশান্তি, কৃষ্ণনাম কীর্তনই পরম স্তুতি, কৃষ্ণনাম কীর্তনই পরাভক্তি, কৃষ্ণনাম কীর্তনই পরাস্মৃতি, কৃষ্ণনাম কীর্তনই পরম যজ্ঞ, কৃষ্ণনাম কীর্তনই পরাবুদ্ধি, কৃষ্ণনাম কীর্তনই পরম জ্ঞান, কৃষ্ণনাম কীর্তনই পরাস্থিতি, কৃষ্ণনাম কীর্তনই পরম দান বলিয়া জানিবে। অতএব, কৃষ্ণনাম কীর্তনই জগৎপ্রিয়; সুতরাং পিতৃশ্রাদ্ধাদি আত্মাত্মিককালে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিলে অথবা পিতৃ-তর্পণাদি-কালে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে, তাহা সফল হয়; নতুবা, সকলই ভ্রম্যে ঘটাহুতির ত্রায় বিফল হইয়া থাকে; শাস্ত্র বলেন,—“যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কস্মৈ কৃষ্ণনামপরায়ণঃ। তৎ কস্মৈ কস্মৈ এব শ্রুতং সাক্ষাদ্ গৃহ্মাতি কেশবঃ ॥” কৃষ্ণনাম-সমাসক্ত হইয়া যাহা কিছু কস্মৈ করা হয়, তাহাই প্রকৃত কস্মৈ; কেন না, ভগবান্ শ্রীকেশব তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং কৃষ্ণনামই জীবের গতি-মুক্তির পরমোপায়; কৃষ্ণনাম ব্যতীত জীবের—“নাশ্ত্যেব গতিরন্যথা” মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। অতএব,—

জয় কৃষ্ণ মনোহর যোগধরে,

যত্ননন্দন নন্দকিশোর হরে।

জয় রাসরসেশ্বরী পূর্ণভমে,

বরদে বৃষভানুকিশোরি রমে ॥

রাসগীতা।

এইরূপে পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব, আমার অশান্তি-বিক্ষোভিত সংশয়-সাগরালোড়িত হৃদয়ের অশান্তি ও সংশয় অপনোদন করিবার

নিমিত্ত, পরিণত-বুদ্ধি ত্রিকালজ্ঞ মুনি-ঋষি, যোগী-তপস্বীদের জ্ঞান
 গবেষণা—পরিমার্জিত, বেদ—বেদান্ত, ত্রায়-পাতঞ্জল, মীমাংসা-
 সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন-শাস্ত্রাবলীকে স্নেহের সহিত সমাদরে স্বীয় শান্তি-
 কুটীরে—স্মৃতিপটে স্থান দিয়া,—তেজস্বী বর্য্যোয়ান উত্ত্বজ-তুঙ্গ-সমলঙ্কৃত
 শিখরী বজ্রনির্ঘোষনাদী বেদান্ত-কেশরী গুরুগুরু-গম্ভীর আদেশ-
 বাক্যের ওজস্বিনী ভাষা-রূপ উপদেশপূর্ণ ললিত মধুর বাক্য দ্বারা,
 আমার হৃদয়স্থ সংশয় রাশিকে অপসৃত করিয়া, অনেকক্ষণ মৌনাবলম্বনে
 স্থির গম্ভীরভাবে অবস্থিত হইলেন। বুঝিলাম, দিনরাত্রি অবিরাম
 অবিশ্রান্তভাবে অনন্ত শাস্ত্রের গম্ভীর-গবেষণায় শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া
 পড়িয়াছেন, তিনি শাস্তিময়ী স্মৃতিপ্রদায়িনী জগন্নিমোহিনী নিন্দ্রাদেবীর
 শাস্তি-অঙ্কে শায়িত হইয়া, বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার
 ত্রীচরণপ্রাপ্তে আশ্রিত হইয়া, পদসেবা করিতে করিতে, প্রমোত্তরচ্ছলে
 সাধন-রহস্যের গুহ্যতিগুহ্য মর্ম্ম উদ্ঘাটনপূর্ব্বক হৃদয়ের সংশয়রাশিকে
 অপসৃত করিয়া, এক অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে
 লাগিলাম। কি যে অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম
 তাহা সামান্য লৌকিক ভাষায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।
 ক্ষণপরে এ আবার কি হইল!—আমার অব্যক্ত হর্ষে বিষাদ ঘটিল;
 পরমারাধাদেব শাস্তিময়ী নিন্দ্রাদেবীর শাস্তিঅঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া
 আদর-কম্পিত স্নমধুর হাস্যমণ্ডিত বেগবান্ স্নেহাতুর স্নমধুরস্বরে
 সহসা বলিলেন যে, —“আমি কৈলাস যাত্রা করিব, ‘মানসসরোবর’
 দর্শন-লালসা অনেক দিন হইতে আমার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে;
 কিন্তু, শুভযোগ, শুভলগ্ন ঘটে নাই বলিয়া, তদর্শনে বিমুখ হইয়াছি
 —অতঃপর আমার শুভযোগ—শুভলগ্ন সমুপস্থিত; সুতরাং “অত্বেব গন্ত-
 মিচ্ছামি।” কেন না, অত্বেব মহাত্মা অত্বেব কৈলাস যাত্রা
 করিবেন, তাঁহাদিগের সহিত আমিও যাত্রা করিব। কিন্তু, তুমি

তথায় যাইতে পারিবে না,—সে স্থানে গমন করিবার পথ অতি দুর্গম; সুতরাং তুমি হরিদ্বার ফিরিয়া যাও। আমি তিন চার মাসের মধ্যেই প্রত্যাগমন করিয়া, তোমার সহিত দেখা করিব। তুমি অধুনা পাণ্ডাদের আশ্রয় গ্রহণ কর এবং যতদিন এখানে থাকিতে পার—থাকিয়া, পরে নীচে নামিয়া যাইবে।” এই কথা বলিয়া, নানাপ্রকার স্তোক-বাক্যে সাস্তুনা করিয়া, পরমারাধ্যদেব মানসসরোবর যাত্রা করিলেন। আমি ক্ষিপ্তচিত্তের ত্রায় শূন্য-হৃদয় হইয়া, কত কি ভাবিয়া, স্থির করিলাম, ইনি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন!—কৈ? কোনও দিন ত মানসসরোবর যাইবার কথা বলেন নাই? সহসা এ কি পরিবর্তন ঘটিল! সত্যই যে তিনি চলিতে আরম্ভ করিলেন!—যেন পুত্রহারা শোকাতুরা জননীর ত্রায়, প্রাণের দেবতাকে হারাইয়া, চতুর্দিক্ অশান্তির বিভীষিকা দেখিতেছি! বন্ধ যেন ফাটিয়া যাইতেছে,—হৃদয় যেন উৎপাটিত হইয়া পড়িতেছে;—প্রাণ যেন আর হৃৎপিণ্ডে নাই,—মস্তিষ্কের শিরঃ-কঙ্কাল যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে,—চক্ষু যেন অন্ধ হইয়া পড়িতেছে,—কর্ণে যেন গভীর গাভীরা শব্দায়মান মহার্ণবের গভীর হু-হু শব্দ প্রবেশ করিয়া, কর্ণকে বধির করিয়া দিতেছে!—তাঁহার প্রতি পাদবিক্ষেপে, আমার প্রতি শ্বাসে অশ্রুধারার দর দর ধারা বন্ধ প্রাবিত করিয়া, পর্বতস্থ নিবাসিণীর অনুকৃতিতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া, ক্ষুদ্র নিবাসের ত্রায় অনবরত ঝরিতেছে! পদদ্বয় ক্রমাগত অবশ হইয়া পড়িল!—হতাশচিত্তে ভূতলশায়ী হইয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম! পরমারাধ্যদেব আশীর্বাদ করিলেন,—“ইষ্টসিদ্ধিরস্তু।” করযোড় রুদ্ধকণ্ঠে ক্ষীণস্বরে কহিলাম,—

ক্ষমস্ব তত্তাত কৃতাপরাধং,
বালোহস্মি নীচোহস্মি শুভূষ্মতিশ্চ।
কুতেহপি দোষে গুরবঃ শিশূনাং,
ক্ষাম্যন্তি দৈন্যং সমুপাগতানাম্ ॥

পরমারাধ্যদেব মস্তকে হাত দিয়া, প্রবোধবাক্যে আবার कहিলেন, —‘দেখ, তুমি মনে ছুঃখ করিওনা, সে অতি দুর্গম পথ, তুমি আমার সহিত অনেকদিন যাবৎ পার্বত্য-প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ ; বিশেষতঃ তোমার অধ্বক্রম-শক্তি আমি বিদিত আছি, তুমি কিছুতেই সে পথে গমন করিতে পারিবে না। সে পথের দুর্গমতা যে একবার দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়। সে পর্বতের উচ্চতা ও নিম্নতা দেখিলেই, তুমি কেন, আমাকেও পশ্চাৎপদ হইতে হয়। কত তুষারাবৃত পার্বত্য-ভূমি অতিক্রম করিয়া, কত উচ্চ-নিম্ন পর্বত লঙ্ঘন করিয়া, কত প্রান্তর, কত খাল-বিল, কত নদ-নদী পার হইয়া তবেই সে স্থানে পৌঁছিতে পারা যায়। তুমি সে পথে চলিতে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িবে, আমাকেও তোমার জন্য ব্যথিত হইতে হইবে ; সুতরাং তুমি নিবৃত্ত হও। দূরে—মাঝে ভোটিয়া ও তিব্বতবাসীদিগের নগর ও গ্রাম আছে বটে ; কিন্তু, পথের দুর্গমতার মধ্যে তৎসমুদয়ের স্মৃতি আপনা হইতেই মলিন হইয়া পড়ে। মরুভূমির মধ্যে কচিং কোথাও বৃক্ষ-লতা-সমন্বিত উর্বর উষর ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয়, সেই দুর্গম পথের মধ্যে ভোটিয়া ও তিব্বতীদিগের গ্রামও যাত্রীদিগের পক্ষে সেইরূপ আশ্রয়স্থল মধ্যে পরিগণিত হয়। পথিমধ্যে আর্যো জনপদাদি দৃষ্টি-গোচর হয় না। কোথাও চির-তুষারাবৃত ;—কোথাও বহুতুষার-সমাচ্ছাদিত, কোথাও বা স্বল্পতুষার-সমাচ্ছন্ন, বৃক্ষ-লতা-পরিশূন্য বিস্তৃত পার্বত্য শৈত্যভূমি ; এইরূপ উচ্চ-নীচ বহুর পার্বত্য-ভূমি অতিক্রম করিয়া, সেইস্থানে পৌঁছিতে হয়। ইহা ছাড়া, সে পথে আবার কোথা-কোথায়ও বিকট ব্যাঘ্র-ভল্লুক, কোথা-কোথায়ও হিংসাশীল চমরী প্রভৃতি পার্বত্য জন্তর বিভীষিকায় প্রাণ নিদান-চমকে চমকিয়া উঠে ;—কোথা-কোথায়ও বা নির্দয়-হৃদয় দশ্যু-তস্করের আশঙ্কার আতঙ্কে

হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। অতএব, তুমি এক্ষণে নিবৃত্ত হও, সৌভাগ্যোদয়ে কখন না কখন তথায় যাইতে সমর্থ হইবে এবং তৎস্থান দর্শনে চক্ষুর তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবে।' এই বলিয়া, প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, তিনি চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথের তীক্ষ্ণধার কণ্টকের বিস্তৃত স্তূপ ও উচ্চ-নীচ উপলব্ধিকে পদদলিত করিয়া, দ্রুত-বিচ্ছুরিত গতিতে চলিতে চলিতে,—

সন্ত্যজ্য মেরুং কনকাচলেন্দ্র—

তীর্থং গচ্ছত্যমরসংঘজুষ্টম্।

খ্যাভং পৃথিব্যাং শুভদং হি মানসং,

যত্র স্থিতো মৎসাবপুঃ পুরেশঃ ॥

প্রথমে অমরার অমরগণ-সেবিত কনকময় স্তূম্বরূপকর্ত অতিক্রম করিয়া, পুরাকালে লীলাময় ভগবান্ দেবেশ যথায় মৎস্যাবতার-ধারণ পূর্বক মৎস্যবপু পরিগ্রহ করিয়া, লীলা করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিয়াছিলেন; সেই পৃথিবী-প্রসিদ্ধ শুভপ্রদ মানস-তীর্থে গমন করিলেন।

চির-বিড়ম্বিত হতাশ-হৃদয়ে অশ্রুধারা-প্লাবিত বিশ্বয়-বিস্ফারিত-নয়নে দেখিতেছি:—দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির অন্তরাল হইলেন,— আকাশভেদী অভ্রচূড়ম্পর্শী উত্তুঙ্গ গিরিরাজির দূরন্ত-বিস্তৃত দিগন্ত-প্রসারিত প্রাচীরমালা প্রাণের দেবতাকে লুকাইয়া দিল!—হতাশ হইয়া, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলাইয়া, অশ্রুধারা-প্লাবিত-নয়নে, একবার আকাশের দিকে চাহিলাম; আকাশে—জ্যোতিষ্ক-পথে, জ্যোতিষ্ক-জীবন মধ্যাহ্ন-তপন আকাশে থাকিয়া, প্রথর কর বিকীরণ করিয়া, বন-বনান্ত-পরিশোভিত পার্বত্য-ভূমি-সকলকে এবং উত্তুঙ্গ হিমগিরির চির-তুষারাবৃত উচ্চশৃঙ্গরাজিকে কি যেন এক অপূর্ব শোভায় শোভিত করিয়াছেন। আলোকরূপী ভগবান্ কারুণ্যপ্রাণ করুণা-নিদান

মধ্যাহ্ন-তপনের পরিব্র উজ্জল-সম্মোহন খর-রশ্মি-সম্পাতে চির-তুষারাবৃত
 গিরিশৃঙ্গগুলি ঝকঝক করিয়া জ্বলিতেছে,—গিরিশৃঙ্গের রূপচ্ছটা দিগ্-
 দিগন্তে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে; আহা, মরি মরি—কি সুন্দর!
 যেদিকে যত দৃষ্টি যায়, ততই যেন সুন্দর!—ততই যেন মনোহর!
 অতি সুন্দর—চিত্তাকর্ষক—আনন্দদায়ক—অনন্ত সুন্দর! সূর্যালোকে
 তরঙ্গায়িত তুষারাবৃত পর্বত-শৃঙ্গের অপরূপ নয়ন-মনো-রঞ্জন অনন্ত
 সৌন্দর্য্যদর্শনে হতাশ-হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তির সঞ্চার হইল, বিবাদ-
 মগ্নিত বিষন্ন-বদনে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল,—তন্ময়তা আসিল।
 তন্ময় হইয়া, কেবলই মৌরালোক-প্রতিফলিত তুষারাবৃত পর্বতপুঞ্জের
 উচ্চ শৃঙ্গের সৌন্দর্য্য-মুখা পান-করিতে লাগিলাম। যে দিকে দৃষ্টি যায়,
 যাহা দেখি, তাহাই যেন নূতন, তাহাই যেন সুন্দর! দর্শন-পিপাসা
 মিটিল না, উত্তরোত্তর দেখিবার তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; দেখা
 আর ফুরাইতে চায় না। ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটি
 তুষার-মগ্নিত পর্বত-শৃঙ্গের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, যেন দেবাসুরের আরাধ্য,
 সর্ব্বপূজ্য—“রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং” মহাযোগী মহেশ্বর,
 রজতগিরিশিখরে নির্ব্বিকল্প-সমাধিস্থ হইয়া, অবস্থান করিতেছেন।
 মস্তক নত হইল, কাতরোচ্ছলিত-প্রাণে যুক্তকরে গাহিলাম,—

কপূরগৌরং করুণাবতারং,

সংসারসায়ং ভূজগেশ্বরহরম্।

সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে,

ভবং ভবানী সহিতং নমামি ॥

পর্বতপুঞ্জের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে, আপন আড্ডায়
 উপস্থিত হইলাম, সঙ্গের সম্মল কমলখানি গঙ্গাতীরে একটি সুবৃহৎ
 উপলখণ্ডোপরি রাখিয়া, গঙ্গাগর্ভে নামিলাম। স্বচ্ছতোয়া গঙ্গার স্ফটিক-
 স্বচ্ছ জল দর্শনে যেন, পিপাসার উদ্বেক হইল, এক অঞ্জলি জল উঠাইয়া

পান করিলাম ; কিন্তু, ছুৰ্ভাগ্যবশতঃ গলাধঃকরণ হইল না । আবার, জলে হাত দিলাম, ওমা, যেন হাত কামড়াইয়া ধরিল ।—অমনি, হাত ছিনাইয়া দূরে সরিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া, উপলখণ্ডোপরি বসিয়া, কত কি ভাবিতেছি,—পশ্চিমাকাশে দিনমণি সংসারের কার্য্য সারিয়া, দিবাবসানে অস্তাচলে গমনোচ্ছত হইয়াছেন । আহা,—এবারে চতুর্দিকের কি চিত্তাকর্ষক মনোরম দৃশ্য ! রক্তরাগরঞ্জিত সূর্য্যদেব, রক্তকিরণ বিকীরণ করিয়া, পর্ব্বতপুঞ্জের উচ্চ-শৃঙ্গকে কি এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব শোভায় শোভায়মান করিয়াছেন ! প্রতি পর্ব্বত-শিখরে, প্রতি তরু-শিরে, প্রতি নব-মুঞ্জরিত নবীন পত্র-দলে, প্রতি প্রস্ফুটিত পুষ্পরাগে, প্রতি নিখরিনীর কুষ-কাদম্বিনীতুল্য স্বচ্ছ সলিলে, রক্ত-রবির কিরণছবির প্রতিবিম্ব যেন, ভাবের লহরী ভাসাইয়া, হাসিতেছে ও আনন্দোচ্ছ্বাসে খেলিতেছে এবং উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে । আর, নিম্নে পর্ব্বতপুঞ্জের পদপ্রান্ত বহিয়া, উল্লোল-বীচি-বল্লরী কল্লোল-ফেন-লহরী সুহাসিনী তরঙ্গিনী বেগবতী প্রবাহিনীর প্রবল স্রোতঃ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে প্রতিহত হইয়া, গভীর কল-শব্দে উন্মাদ-তাণ্ডব নৃত্য-সহকারে লাফাইতে লাফাইতে সাগর-সঙ্গমে ছুটিয়া চলিয়াছেন । পার্শ্বে অপর একটি পাহাড়ে সেইরূপ উদ্দাম তরঙ্গরাজি, আহত হইয়া, আবার তদপেক্ষা গভীর কল্লোল তুলিয়া, মিশিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে ; কিন্তু, তাহা মিলাইবার অবসর পাইতেছে না । কল-কল্লোলের শেষ নাই, অন্ত নাই, অনবরত জলরাশির সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য, উপলখণ্ডসমূহ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে । আর, নিখরকুলও রুজতাণ্ডবের অহুকৃতিতে গভীর ঝঝর রবে নিম্নাভিমুখে ঝরিয়া, কল্লোলিনীর অঙ্গে আত্মলীন করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে । নিখরকুলের ঝঝর ধ্বনি-শ্রবণে ধূর্জটীর অঘোর-তাণ্ডব নৃত্য শিবাস্তোত্রের কথা মনে পড়িল, প্রাণের উল্লাসে গাহিলাম,—

জটাকটাক সস্ত্রম ভ্রমল্লিম্পনিবরী,
বিলোলবীচিবল্লরী বিরাজমানমূর্দ্ধনি ।
ধগধগধগজ্জলল্লাটপট্টপাবকে,
কিশোর-চন্দ্রশেখরে রতি: প্রতিকর্ণং মম ॥

পশ্চিম গগনে জ্যোতিষ্ক-জীবন দিবাকর, মধুর গমনে দিবাবসানে
সাক্ষ্য-গগনে বিলীন হইলেন । অমনি সমাগরা বসুন্ধরা অনন্ত অন্ধকার-
সমুদ্রে ডুবিয়া গেল !— “অনেকবাহুদরবক্ত্রনেত্রং” তমোময়ী নিশা-রাক্ষসী
আসিয়া, অনন্ত বাহু প্রসারিয়া, সমাগরা-ধরাকে উদরসাৎ করিল ।
গঙ্গাগর্ভে নামিয়া, সন্ধ্যোপাসনা করিবার মানসে একটি উপলথও
বসিয়া, আচমনার্থ জলে হাত দিলাম । ও মা ! শৈত্য যেন “দংষ্ট্রী-
করালানি” শত বদন ব্যাদন করিয়া, হাত কামড়াইয়া ধরিল, জল হইতে
হাত ছিনাইয়া কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে কহিলাম :—

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতো ভো স্নানং তুভ্যাংনমো—

ভো দেবা পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্ ।

যত্র কাপি নিষত্ত্ব যাদবকুলোদ্ভূতঃ সন্ত কংসদ্বিষঃ,

স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মত্তে কিমন্তেন মে ॥

হে সন্ধ্যা-বন্দন ! তোমাদের মঙ্গল হউক ; তোমরা আমায়
কল্যাণ বিধান কর ; ভো স্নান ! তোমাকেও নমস্কার ; ভো দেবতা
পিতৃগণ ! আপনারাও আমাকে ক্ষমা করুন ; কেন না, আপনারা দেখিতেছেন
তৃপ্তার্থ তর্পণাদি করিতে আমি অসমর্থ, তাহা আপনারা দেখিতেছেন
বা জানিতেছেন অথবা বুঝিয়াছেন । স্নান করা ত অসম্ভব, সন্ধ্যা
বন্দন করাও মুকঠিন ; সুতরাং এমতাবস্থায় উপায় কি ? জীবন
যাঁহার নাম স্মরণে ভব-তুফানে পরিত্রাণ পায়, দুঃখ কুতাস্ত হইয়া
নিকৃতি পায়, যিনি অনুপায়ের উপায়, সেই কোটি-মদন-বিমোহন
অশেষ-চিন্তাকর্ষক সহজ মধুর তারুণ্যমুত লাবণ্যমুত-পারাব

মহানুভবগণের অনুভূয়মান শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজমান দেব-কুল-সূর্য্য
 যাদব-কুলাবতংস কংসদ্বিষ “জগদাদিগুরুং ব্রহ্মরাজসুতং” শ্রীনন্দনন্দন
 শ্রীকৃষ্ণকেই অধুনা স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে চিন্তন করা যাউক,
 তাহাতেই পাপরাশি ভস্মীভূত করিতে পারিব, তদ্ভিন্ন আর উপায় কি ?
 তাঁহার রাজ্যপদে রতি মতি নতি করিলে, জীবে মোক্ষ পায় ; কেন
 না, তিনি অসহায়ের সহায় । আচ্ছা, আর একবার চেষ্টা করা যাউক,
 ব্রাহ্মণের নিত্য-নৈমিত্তিক সন্ধ্যা-বন্দনা বিরহিত হইলে, ব্রাহ্মণ পতিত
 হয় ; সুতরাং পরিত্যাগ করা উচিত নহে । এই ভাবিয়া, সন্ধ্যা-
 বন্দনার লালসায় আবার জলে হাত বাড়াইলাম, পূর্ব্ববৎ পুনরায় হাত
 কামড়াইয়া ধরিল । কহিলাম,—

শৈত্য নামগুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা,

কিং ক্রমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্তাপরে ।

কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং তং জীবিনাং জীবনং,

তং চেন্নীচপথেন গচ্ছামি পয়ঃ কস্তাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ ॥

হে গঙ্গে ! যেমন অগ্নির গুণ দাহিকা, তেমনই তোমার গুণ
 শৈত্যতা ; এতাদৃশী শৈত্যতা গুণ তোমার হইলেও, তোমাতে কিন্তু
 স্বচ্ছতা গুণ বিद्यমান ; ইহা তোমার সহজ ও স্বাভাবিকী গুণ ; তোমার
 শুচিতা, পবিত্রতা ও নিষ্কলতা বিষয়ে আর বক্তব্য কি ; যে হেতু,
 তুমি অত্র যাবতীয় অস্পৃশ্য, পাপবিদ্ধ, কদর্যা, অশৌচ্য, অপবিত্র পদার্থ-
 নিচয়কে শুচি, পবিত্র, নিষ্কল ও অপাপবিদ্ধ করিয়া থাক ; তোমার
 স্পর্শে তাহারাও পবিত্র হয় । সুতরাং অত্র আর কি গুণগাথা গান
 করিয়া, তোমার স্তুতি করিব ? তুমি পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-
 জঙ্গম, মর-অমর সর্ব্বজীবের জীবন-স্বরূপ । মাতঃ ! হেন গুণরাশি
 তোমাতে বিद्यমান ; তথাপি তুমি সর্ব্বজীবের হেয়, লবণ-দোষে
 দূষিত মহান্ সমুদ্রের সঙ্গমেচ্ছু হইয়া, দ্রুত বিচ্ছুরিত গতিতে সমুদ্রের

পানে কেন ছুটিয়া চলিয়াছ ? বুঝিলাম,—“স্বভাবো যাদৃশী যন্ত
ন মুঞ্চতি কদাচন ;” অতএব তুমিও আপন স্বভাব কদাপি
ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না এবং তোমাকে নিষেধ করিতেও
পারে, এমন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেও কেহই জন্মায় না। এইরূপ ভাবিতে
ভাবিতে, ত্রিতাপহারী শ্রীহরির নাম করিবার মানসে মালাছড়াটি
গলা হইতে নামাইয়া, ভগবন্নাম জপ করিতে বসিলাম। কিন্তু,
বিষয়াসক্ত বিষয়-লোলুপ চঞ্চল মন, তাহার স্বভাবসিদ্ধ চঞ্চলতা
পরিহার করিয়া, নামে মজিল না। কখন হরিদ্বার, কখনও বা কানী,
কখন প্রয়াগ, কখনও বা পুষ্কর, কখনও বা আবার বিবোদগারী
বিষয়-চিন্তায় মজিয়া, বিষয়-বিষ্ঠায় মুখ বিকৃত করিয়া, বিষয় হইতে
বিষয়ান্তরে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। মনকে ক্ষণকালের জ্ঞাত ও স্থির
করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, সারাদিন কত কি বৃথা চিন্তা
করিয়া কাটাইলাম,—দিনান্তের পর, মুহূর্তমাত্র, একবার ভগবানের
নাম জপ করিব,—হর্ভাবনা—হুশ্চিন্তা ! আর কি তোমার সময় ছিল
না ?—তুই আবার আসিয়া, আমার জপের মালায় আশ্রয় গ্রহণ
করিলি ?

কিং দানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং,

কিং বা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভির্দেহেন গেহেন কিম্।

জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গরং সপদিরে ত্যজ্যং মনো দূরতঃ,

স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্বতীবল্লভম্ ॥

হে বিষয়-লোলুপ মন। এই অতুল নৈনর্ঘ্য দ্বারা কোন ফল
হইবে না, হস্তী ও ঘোটকে কোন প্রয়োজন নাই, রাজ্যলাভ করিয়া
কি উপকার হইবে ? অথবা পুত্র-কলত্র, বন্ধু-বান্ধব ও পশু দ্বারা
কোন ফল হইবে না, এই সুঠাম-সুন্দর দেহ বা মর্শ্বর-নির্মিত সুন্দর
গৃহ কোন পারমার্থিক মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে না ; সুতরাং

ধনৈশ্বৰ্য্য প্রভৃতি ক্ষণভঙ্গুর, ইহা অতি অল্পকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইবে ; অতএব, আশু এই ধনৈশ্বৰ্য্যাদির অভিলাষ পরিত্যাগ কর এবং গুরু-বাক্যানুসারে সেই সৰ্বৈশ্বৰ্য্যের অধীশ্বর পার্ৱতীবল্লভকে ভজনা কর, তাহাতেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে। তাই বলি,—মন! তুমি যাহা নও, তাহাই যদি চাও, তোমার যাহা নাই, তাহাই যদি পাইতে চাও, তবে তোমার যাহা আছে, তাহাতে অসন্তুষ্ট হও। ঐহিক বাসনার বিশ্বগ্রাসী লেলিহান জিহ্বা সমূলে উৎপাটিত কর, তোমার মন যদি স্বার্থচিন্তা হইতে বিরত না হয়, তবে শিরঃকঙ্কালের ভিতর হইতে মস্তিষ্ক-পিণ্ডটি সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেল। তোমার অন্তঃকরণ যদি ভগবৎ-প্রেমে অনুপ্রাণিত না হয়, তবে তোমার বক্ষপঙ্কর ভেদ করিয়া, হৃদপিণ্ডগুলি বিচ্ছেদ করিয়া দাও। তুমি নয়নযুগ্মকর সুবর্ণ-মূর্তির পূজা করিয়াছ ; কিন্তু, তাহাতে হৃদয়ের শান্তি কতটুকু পাইয়াছ ? অলীক আকাজক্ষার বশবর্তী হইয়া, প্রাণপাত করিতেছ ; কিন্তু, তোমার আকাজক্ষার নিবৃত্তি হইল কৈ ? তুমি অহর্নিশ আশাতৃপ্তি করিবার জন্য বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাছুটি করিতেছ, তোমার তৃষ্ণা মিটিল কৈ ? তুমি বিকারের রোগী, যতই জলপান করিতেছ, তোমার তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে না কি ? আজি ধন-তৃষ্ণা, কালি যশোলিপ্সা, পরশ্ব উচ্চ-পদাকাজক্ষা—তোমার পিপাসা মিটিবে কবে ? তোমার ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রত্যেক কক্ষই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছ ; কিন্তু, সেখানে সুখের সন্ধান পাইয়াছ কি ? তুমি সতত আত্মমুখে নিরত, আত্মচিন্তায় বিভোর। তুমি না জানি কত জন্ম হইতে সংসার-সাগরের সীমানুসন্ধান করিতেছ ; কিন্তু, এই অকূল পাথারে কূল-কিনারা পাইয়াছ কি ? তাই বলি,—যদি প্রকৃত সুখ পাইতে চাও, যে সুখে সন্তাপ নাই, বিরাম নাই, যদি সেই সুখের অধিকারী হইতে চাও, তবে ঐহিক সুখের মোহিনী-মূর্তি দেখিয়া

মুগ্ধ হইও না, আত্মহারা হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না ;—“স্বার্থার্থ গুরুবাক্য
 -তো ভজ ভজ ত্রীপার্বতীবল্লভম্।” আবার বলি—যেন, ভগবানে
 আত্মসমর্পণ করিয়া, আত্ম-প্রবঞ্চনা করিও না ; নিষ্ফল আরাধনায়
 প্রাণপাত করিয়া, বৃথা জীবন কাটাইও না। পরমারাধ্য গুরুদেবের
 প্রদীষ্ট পথের অনুসরণ করিয়া, ভগবানের আরাধনায় নিরত হও,
 তোমার অমঙ্গলের অবসান হইবে, মঙ্গলের মাল্য তোমার শিরো-
 ভূষণ হইবে। একবার স্থির হও, ক্ষটিকের মত স্বচ্ছ হও, বজ্রের
 ত্রায় দৃঢ় হও, পর্বতের মত অচল হও, পৃথিবীর ত্রায় অটল হও ; আর,
 শ্মশানেশ্বরের ত্রায় বিরাগী হও, শ্মশানযাত্রীর ত্রায় নির্লিপ্ত হও,
 অনলে তাপিত দ্রবীভূত কাঞ্চনের ত্রায় বিগুহ্ব নিঃশূল ও পবিত্র হও
 এবং —“সর্বোপায়ান্ পরিত্যজ্য ভক্তিমাশ্রয়ঃ। ভক্তিনিষ্ঠো ভব।”
 আর, ভগবানের প্রতি লক্ষ্য কর,—অচিরে তোমার হৃৎকের মেঘ কাটিয়া
 যাইবে,—শীঘ্রই সুখ-সুখ্যের অরুণালোকে তোমার হৃদয় উদ্ভাসিত
 হইবে।

সংসার তাপত্রয়দাবদক্ষাঃ,

শরীরিণাং যং পরিচিস্তয়ন্তুঃ।

সত্তাঃ পরাং নিবৃতিমাপ্নুয়ন্তি,

তমচ্যুতং তীৰ্ত্ত্ব। কথং সুখং স্যাৎ ॥

সংসারের তাপত্রয়ে দক্ষীভূত জীবগণে যাহার স্মরণে, যাহার চিন্তনে
 পরিভ্রাণ পায়, যাহাকে চিন্তা করিলে, নির্বাণ মুক্তি লাভ হয়, তাহাকে
 পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে সুখের অভিলাষ কর ?

এইরূপে মনকে বুঝাইয়া, আবার মুদিত-নয়নে একাগ্রমনে
 ভগবদ্ব্যানে নিবিষ্ট হইলাম ; কিন্তু, কৈ ? মন, তাহার আপন স্বভাব
 চঞ্চল হু ছাড়িল না, জন্ম-জন্ম-সংসার-লব্ধ সম্পত্তি বিষয়চিন্তা তুলিয়া,
 ভগবদ্ব্যানে মজিল না,—ভগবানের চিন্তা করিতে বসিয়া, সংসারের

অলীক চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িল। বড় খেদে, বড় ক্ষোভে আবার মনকে বুঝাইতে লাগিলাম,—মন ! তুমি নিরেট বোকা, তুমি অত্যন্ত ছুঁড়াগ্য ! মধুচক্রে পাইয়া, মধুচক্রে বসিয়া, মধুপান করা তোমার ভাগ্যে ঘটিয়াও ঘটিল না ;—কেবল মাছির বিষ্ঠায় দস্ত-ওষ্ঠ আঁঠায় জড়িত করিয়া, মুখ বিকৃত করিলে ? কিঙ্করাকে রঞ্জিত মধুকরও আপন সঞ্চিত মধুপানে আত্মহার্য হইয়া, প্রাণ মাতান মধুর গুঞ্জন স্বর্গীয় বীণায় তানে গুণ গুণ স্বরে গুণাকরের গানে মত্ত হইয়া, গুণময়ের অঘেষণে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে ; আর, তুমি কিনা, সেই “অধরং মধুরং বদনং মধুরং, হসিতং মধুরং চলিতং মধুরম্। হৃদয়ং মধুরং বচনং মধুরং, মথুরাধিপত্যেরখিলং মধুরম্ ॥” শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্যামৃত তারুণ্যামৃত লাবণ্যামৃত ধারার মধুরতার আশ্বাদ ভুলিয়া, কামিনীর বদনারবিন্দ অধর-সুধা পান করিতে কখন পাতালে যাইতেছ, কখন ভূতলে ফিরিয়া আসিতেছ, কখন আকাশে উখিত হইতেছ, কখনও বা রসাতলের অতল তলে অধঃপতিত হইতেছ ; অতএব, তোমায়—ধিক্, তোমায়—‘ধিক্, ধিক্, ধিক্ বলি—শত শতবার করি ; হেলায় অমৃত ছাড়ি বিষপান করিলে ?’ ভগবানের কারুণ্যামৃত—তারুণ্যামৃত—লাবণ্যামৃতের অশ্বাদ ভুলিয়া,—

মনঃ কুত্রোদ্যোগঃ সপদি বদ মে গম্যপদবীম্,

নরে বা নার্য্যাং বা গমনমুভয়ত্রাপি চ মুখঃ ।

যতন্তে ক্লীবৎ প্রতিপদমহো হান্তপদবীং,

জনস্তোমাগম সর হি ত্বং ব্রহ্মপদবীম্ ॥

মনঃ ! তুমি কোথা যাইতে এত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছ ? কাহার নিকট শাস্তি পাইবার জন্ত উদ্যোগ করিতেছ ? সম্বর আমায় বল, যদি তুমি নরের নিকট যাও, তাহার নিকট তুমি হান্ত্যাম্পদ হইবে ; আর, যদি তুমি নারীর নিকট যাও, তাহার নিকটও তুমি নিতান্ত উপহাসনীয়

ও হয় হইয়া, তাহাদের নিৰ্মমতায় মৰ্ম্মঘাতী অভিমানে জৰ্জরিত হইয়া, মৰ্ম্ম-বেদনায় তিপ্ত হইবে; যে হেতু তুমি নপুংসক। সুতরাং কি নর, কি নারী—উভয়েরই নিকট তোমার যাওয়া বৃথা; ইহাদের নিকট যাইয়া, শাস্তি পাইবার তোমার আশা নাই; অতএব, ইহাদের আশা পরিত্যাগ করিয়া, তুমি সেই কারুণ্যামৃত তারুণ্যামৃত লাভণ্যামৃতময় নিত্য-নিরঞ্জন সত্য-সনাতন পরাৎপর পরব্রহ্মের নিকট যাও, তাঁহার সহিত তুমি সম্মিলিত হইতে পারিবে, তাঁহার সহিত তোমার ঘনিষ্ঠ মিত্রতাও জন্মিবে। কেন না, তিনিও নপুংসক,— তোমার জাতি; সুতরাং সোনায়ে সোহাগার তায়—“স্বজাতৌ পরমা প্রীতিঃ” অবশ্যই জন্মিবে। তিনিও তুমি এক জাতীয়। তুমি ব্রহ্মজাতী। ব্রহ্মজাতী; কিন্তু, তাই বলিয়া তুমি ব্রহ্ম নও। সাগর শিশির-কণা এক জাতীয় হইলেও, শিশির-বিন্দু সাগর নহে। সাগরে ও শিশির-কণাতে যে প্রভেদ, ব্রহ্ম ও তোমাতে সেই প্রভেদ। এক জাতীয় বস্তু পরস্পর সম্মিলিত হইলে, সহজেই আকৃষ্ট হয়, ইহাই জগতের সাধারণ নিয়ম। স্বজাতীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলে, স্বজাতীর সহিত প্রীতি জন্মিলে, আনন্দময়ে আত্মলীন করিয়া, তুমিও ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইবে, ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইলে, এমন এক অনির্বচনীয় প্রেম বিভোর হইয়া পড়িবে যে, তোমার অন্তর এই তুচ্ছাদপি তুচ্ছ অলীক বিষয়ানন্দ বা বাসনানন্দ ছাড়াইয়া, এক অলৌকিক আনন্দে গিয়া উপনীত হইবে। অন্তর সে আনন্দের কথা সহজে ভুলিতে চাহিবে না, তন্ময় হইয়া, সেই আনন্দে সতত মগ্ন থাকিবে। কেন না, তিনি— “সমস্ত সম্পৎসমবাঞ্ছিতভবঃ” নিখিল সম্পদ প্রাপ্তির হেতু; আর, তিনি— “সমস্তিতাপংকুলধূমকেতবঃ” সমাগত আপদকুলের ধূমকেতু-স্বরূপ। আর, তিনি এই— “অপারসংসারসমুদ্রসেতবঃ” অপার সংসারসাগরের সেতু-স্বরূপ। তাঁহাকে চিন্তা বা তাঁহার সহিত মিত্রতা করিলে,

তাহাতে রতি জন্মিলে, আর ভয় কি? নির্ভয়ে তুমি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকিবে। তাই বলি,—মন! ভগবান্কে চিন্তা কর; ভগবদ্ভাবে বিভোর হও,—সুখী হইবে, শান্তি পাইবে। তুমি তোমার জন্ম-জন্মান্তর-সঞ্চিত বিমোদগারী বিষয়-সুখে মগ্ন হইয়া বিষয়-চিন্তা করিতে পারিবে, আর, যিনি তোমার—“গতিভৰ্ত্তা প্রভু: সাক্ষী নিবাস: শরণং মুহুৎ” সেই চিরসখার চিন্তা করিতে, তাহার প্রতি শ্রীতি করিতে, তাহার সহিত মিত্রতা করিতে পারিবে না? যাহারা তোমার “প্রতি-জন্মদুঃখদা” তাহাদের প্রতি শ্রীতি করিতে, তাহাদিগকে ভালবাসিতে শিখিয়াছ; আর, যাহাকে শ্রীত করিলে, যাহাকে ভালবাসিলে, যাহার সতিত মিত্রতা করিলে, এই “মৃত্যুসংসারসাগরাৎ” উদ্ধার হইতে পারিবে, তাহাকে চিন্তা করিতে, তাহাকে ভালবাসিতে, তাহাতে সখ্যতা স্থাপন করিতে পারিবে না? একবার স্থির হইয়া, চিন্তা কর, বুঝিতে পারিবে,—

ন তে চ মাতা চ পিতা চ বন্ধু

ন তে চ পত্নী সূতশ্চ মিত্রম্।

ন পক্ষপাতো ন বিপক্ষপাতঃ,

কথং হি সন্তপ্তিরিয়ং হি চিন্তে ॥

তোমার কেহ মাতা বা পিতা নাই; তোমার কেহ মিত্র বা মুহুৎ নাই; তোমার কেহ বন্ধু বা বান্ধব নাই; তোমার কেহ পুত্র বা কলত্র নাই; তোমার কেহ পক্ষ বা বিপক্ষ নাই; মোটের উপর ইহ-সংসারে তোমার বলিতে আর কেহই নাই, যদি তোমার বলিয়া কেহ থাকেন, তবে সেই তোমার সাধনার ধন, নিদানের বন্ধু, চির-সখা, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী, ভগবান্ শ্রীহরিই আছেন, অতএব, তাহাকে ভুলিয়া, সংসারের অলৌক চিন্তায় মগ্ন হইয়া, কেন সন্তাপ ভোগ করিতেছ? সেই সন্তাপহারী ভগবান্

শ্রীহরিকে চিন্তা কর, তোমার সকল সম্বাপ দূর হইবে—শান্তি পাইবে,
 মাইভৈন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনা,
 নৈবামী প্রভবন্তি পাপরিপবঃ স্বামী নমু শ্রীধরঃ ।
 আলম্ব্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণং,
 লোকস্ত ব্যসনাপনোদনকরো দাসস্ত কিং ন ক্রমঃ ॥

তাঁহাকে চিন্তা কর, তিনি তোমার নিকটে আসিবেন ;—তোমাকে
 আপনার লোক করিয়া, ভব-পারাবার পার করিবেন, তোমার সকল
 দুঃখ-তাপ-জ্বালা ঘুচিয়া যাইবে । তিনি তোমাকে আপনাতে মিশা-
 ইতে—আপনার ধনে ধনী করিতে—আপনার নিজের জন করিতে,
 অনেক বাহু প্রসারিত করিয়া, অহর্নিশ আহ্বান করিয়া কহিতেছেন
 —‘চিন্ত ! আমি নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে অবস্থিত হইয়াও, এই ভূমণ্ডলের
 চারিদিকেই আছি । তুমি যেখানে আছ, তথা হইতে যদি আমাকে
 পাইতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে, আগে প্রণত হও ; তাহার
 পর, দিনরাত বিরাম দিও না, আমাকে লক্ষ্য রাখিয়া, আমার পানে
 ছুটিতে থাক ;—সংসারের সকল অন্তরায়ের মধ্য দিয়া, সকল কাজের
 ভিতর দিয়া, তোমার আজন্ম-সঞ্চিত বিষয়-ভোগের মধ্য দিয়া, আমার
 পানে ছুটিয়া এস । দেখিবে,—সংসারের যত মায়া-মমতা, যত সব কামনা-
 প্রলোভন, কেহই তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না, কেহই
 তোমাকে আর ঠকাইতে পারিবে না ; তুমি আমাকে পাইবেই পাইবে ।’
 তাই বলি,—মন ! তুমি যাহাদিগকে আপন জন ভাবিয়া, যাহাদের চিন্তায়
 মগ্ন হইয়া, অহর্নিশ ছুটাছুটি করিতেছ, তাহারা কেহই তোমার আপন
 জন নয়, সকলেই পর—সকলেই পর ! অতএব,—

মাংসাস্থিরক্তনিকরে স্বশরীরকেহস্মিন,
 স্বত্বং ত্যজ্যশ্চ মমতাং বনিতান্মৃতাদৌ ।
 পশ্যানিশং জগদিদং ক্ষণভঙ্গনিষ্ঠং,
 জ্ঞানী বিরাগরসিকো ভব ভক্তিনিষ্ঠঃ ॥

মাংস-অস্থি-নিকর ও শোণিত-সঙ্কুল এই শরীরে ও বনিতা-
সুতাদিতে আশু মমতা পরিত্যাগ করিয়া, জগৎ অনিশ ক্ষণভঙ্গুর
অবলোকন কর এবং ভক্তিনিষ্ঠ ও বিরাগ-রসিক হইয়া জ্ঞানী হও।
তাহা হইলে আর কোনই ভয় থাকিবে না ; আবার বলি শুন,—

ভবজলধিমগাধং ছুস্তরং নিস্তরেয়ং,

কথমহমিতি চেতো মা স্ম গাঃ কাতরং ।

সরসিজদৃশি দেবে তাবকী ভক্তিরেকা,

নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়য়্যত্যবশম্ ॥

এইরূপে মনকে বুঝাইয়া, আবার নিমলিত-নয়নে ভগবদ্ব্যানে
নিরন্ত করিলাম ;—একবার ভগবানের চরণারবিন্দ, একবার তাঁহার
নাভিচন্দ্র, একবার তাঁহার বদনারবিন্দ, একাগ্রতার সহিত চিন্তা
করিতে করিতে, যেমনই ভাবময় ভগবান্ মনোময় হইবার উপক্রম
হইল, অমনি চঞ্চল মন আবার অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া, অলীক চিন্তার
বশবর্তী হইয়া, কামিনী-কাঞ্চন লাভের চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িল।
অহো, কাহার চিন্তা করিতে বসিয়া, কাহার চিন্তায় মগ্ন হইয়াছি।
নিবাত-নিষ্কম্প দীপ-শিখার ত্রায় অচঞ্চল অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছি
বটে ;—ওদিকে কিন্তু,—“মনো ভ্রমতি হে চক্রে কাস্তানু কাঞ্চনেষু চ।”
রে চিন্ত ! কেন আর ভ্রান্তভাবে পিশাচের ত্রায় কামিনী-কাঞ্চন
লাভে ভ্রমণ করিয়া, ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইতেছ ? কুৎসিৎ বিষ্ঠাভোজী
কাকই মৃত্রাগার নরকের প্রতি ধাবমান হয়। ভগবদংশাবতার অবধূত
দত্তাত্রেয় কহিয়াছেন,—“আত্মানং চামৃতং হিত্বা অভিন্নং মোক্ষমবায়ম্।
গতো হি কুৎসিতো কাকো বর্ততে নরকং প্রতি ॥” অভিন্ন অব্যয়
মোক্ষ-স্বরূপ অমৃত-রস-সাগর ভগবান্কে পরিত্যাগ করিয়া, কাকই
কুৎসিত নরকের প্রতি ধাবিত হয়। বিষয়-লোলুপ মন ! আর,
লাবণ্যময়ী ললনার প্রতি ও অন্তরুত খাতু-নির্মিত অমল-ধবল-উজ্জল

কান্তিময়ী মনঃ—প্রাণ-শ্রবণ-বিমোহন মধুর-নিিনাদী ক্ষুদ্র গোলাকার মুদ্রা বা কাঞ্চনের প্রতি দাবিত হইও না। উহাতে সুখ বা আনন্দ নাই,—একবার স্থির হইয়া, সেই চিন্তামণির চরণ চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, সুখ-শান্তি পাও কি না? এইরূপে মনকে বুঝাইয়া, বহিস্মুখী মনকে অন্তস্মুখী করিয়া, আবার ভগবদ্ধানে নিরত হইলাম। মন বৈরাগ্যের ক্লগিক উচ্ছ্বাসে কথঞ্চিৎ স্থির হইল, মুদিত-নয়নে ভগবদ্ধানে মগ্ন হইলাম; এবারে মন একাগ্র হইয়া, ভগবানের সৰ্ব্বাবয়ব চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াছে,—ভগবৎ-কল্পক্রমের প্রসূনজাত মালদার-কুশুমা-মোদযুত সুধাস্বাদোপম মধুর ধ্যানে আনন্দ উপভোগের অধিকারী হইয়াছে,—ইত্যবসরে মন আবার চঞ্চল হইয়া, অমৃতাস্বাদনে বাধা জন্মাইল, অমৃত পানের অন্তরায় হইল। অমনি সঙ্গে সঙ্গেই কত কি চিন্তা আসিয়া, হৃচ্চিন্তার সৃষ্টি করিল। মনকে বুঝাইয়া কহিলাম,—

এতদ্বামহমর্থয়ামি সততঃ রে চিত্ত চিন্তাতুর,

যা চিন্তা কুরু চঞ্চলেষু বিষয়েধ্বাগারদারাদিষু।

গায়ন্তং যমুনাতটক্রমতলে নীলাম্বুদং শ্রামলং,

গোপালং বনমালিনং কমলিনং নন্দাত্মজং চিন্তয় ॥

হৃচ্চিন্তা কালামুখি! তুই ত যত নষ্টের গোড়া! তুই ত আমার অমৃতপানের প্রধান অন্তরায়! তুই ত আমাকে কখন মজাইতেছিস্, কখন রাগাইতেছিস্, কখনও জ্বলাইতেছিস্!—তুই ত আমাকে মজাইয়া, রাগাইয়া, জ্বলাইয়া জ্বলাইয়া পথভ্রষ্ট করিয়া, আমার সৰ্ব্বনাশ সাধন করিবি, এই তোরে একান্ত বাসনা;—যা তুই অধঃপাতে যা। এই বলিবামাত্রই কালামুখী ও জ্বলামুখী হৃচ্চিন্তা ধাপের পর ধাপ নামিতে নামিতে অধঃপাতে চলিল;—খেদে, অভিমানে, অহঙ্কারে, রাগে, কোপে, বুক ফুলাইয়া, হাত নাড়িয়া, মুখ গঁজড়াইয়া ঘুরিতে-ঘুরিতে, ফুলিতে-ফুলিতে, কাঁদিতে-কাঁদিতে, গাড়িতে-গাড়িতে, পড়িতে-পড়িতে, দেখিতে-দেখিতে কোথায় কোন্ পাহাড়ের অতল

গর্ভে—নিম্নতলে নিক্ষিপ্ত হইল !—আর, দেখা গেল না ; এবারে নিশ্চিত হইলাম, আশা করি, এবারে বোধহয় নির্বিররে নিশ্চিত-চিত্তে চিন্তামণির চরণ চিন্তা করিতে পারিব। অতএব, নিশ্চিত্তে !—“কং চিরং জীব ।” নিশ্চিত্ত হইয়া, সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া, ষড়রিপু সংবত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, অন্ধকারময় হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করিয়া, হৃদয়-গুহাশায়ী ভাবময় ভগবান্কে তন্ন-তন্ন অনুসন্ধান করিয়া, শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম ; কিন্তু, কোথাও তাঁহার নিদর্শন পাইতেছি না, হতাশ হইয়া, করযোড়ে ভক্তিভরে কহিলাম ;—কোথায় হে দয়াময় ! দীনবন্ধো ! একবার দেখা দিয়া, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর প্রভু ! তোমার নাম যে বাঞ্ছাকল্পতরু ! আজ তোমার অন্বেষণে বড়ই ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি !—আজ তোমাকে পাইয়াও বুঝি ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। তোমাকে দেখিয়াও বুঝি চিনিতে পারিতেছি না ;—তোমায় ধরিতে পারিতেছি না বলিয়াই কি তুমি আমা হইতে—“দূরাং সূদূরে” সরিয়া পড়িতেছ !—কিন্তু, দেব ! তুমি দূরে সরিয়া গিয়াই কি লুকাইয়া থাকিতে পারিবে ? তুমি জ্যোতিরিন্দের ত্রায় অতি ক্ষুদ্র আলোক-বিন্দু নও। তুমি যে,—“কোটিসূর্য্যপ্রতিকাশং বিদ্যুৎকোটি সমপ্রভম্” উজ্জ্বল-সন্মোহন জ্যোতিঃ-সাগর ; আরও গুনিয়াছি, শাস্ত্র বলেন,—“বৃহচ্চ তদ্বিব্যঅচিন্ত্যরূপম্” তবে কি প্রকারে তুমি এই ক্ষুদ্র হৃদয়-কক্ষে লুকাইয়া থাকিবে ? তবে কি প্রভু ! তোমায় কেহ না দেখিয়া থাকিতে পারে ? শাস্তিময় কোথা তুমি শান্তি দাও ! জানি না, তুমি এখনও কতদূরে—বিশ্বতির অতীতের কোন্ পথে—পিছাইয়া পড়িয়াছ ! জানি না, তুমি এখনও কতদূরে—ভবিষ্যতের কোন্ দূরপথে—অপেক্ষা করিতেছ ! তোমায় কাতর-কণ্ঠে কত ডাকিতেছি ; কিন্তু, কোথাও তোমার সন্ধান মিলিতেছে না। সময় কি এখনও হয় নাই প্রভু ! তাই বুঝি,—এই

বিড়ম্বনা ! আমার অপরাধ কি প্রভু ! কি দোষে আমার ত্যাগ করিতেছ ? আমি তোমায় ভালবাসিনা ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা যে আমি জানি না । কিরূপে তোমায় ভালবাসিতে হয়, তাহা আমায় শিখাইয়া দাও । কেমন করিয়া, তোমাকে ভালবাসিতে হয়, কেমন করিয়া তোমায় ভালবাসিলে, তুমি তৃপ্ত হও, আমায় শিখাইয়া দাও । আমি জ্ঞানহীন, অতি দীন, ইন্দ্রিয়ের দাস, কাম-কিন্দর, তুমি না শিখাইলে, কে আর আমায় শিখাইবে দেবতা ! আমায় শিখাও, কেমন করিয়া, দেবতাকে ভালবাসিতে হয়, কেমন করিয়া, দেবতার পূজা করিতে হয়, কেমন করিয়া প্রাণের দেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে হয় । আমি ত তোমায় চিরকালের নিমিত্ত আমার করিতে চাহি না ;— আমি চাই, তোমার পূজা করিতে, তোমার ক্রীচরণে আমার যথাসর্বস্ব ঢালিয়া দিতে । তবে আর কেন আমার প্রতি নিদয় হও প্রভু ! আমি চরণাশ্রিত ক্রীতদাস, আমায় ছাড়িয়া, এমন বিজ্ঞান গঠনে ফেলিয়া, যাইও না ; একবার হৃদয়ে এস, হৃদয়েশ্বর ! এস, আমার প্রাণের দেবতা, এস আমার জীবনের আরাধা, এস আমার সাধনার ধন । বুঝাইয়া দাও প্রভু ! তোমাকে কি দিয়া পূজা করিলে, তুমি আমার পূজা গ্রহণ করিবে ? আমায় এ দুর্দিনে ফেলিয়া যাইও না,—তুমি আমায় ত্যাগ করিলে, আমি আর কাহার কাছে দাঁড়াইব ? আর ইহ-সংসারে আমার বলিয়া কে আছে প্রভু ! তুমিই যে আমার । অতএব, এস প্রভু ! এস গুরু, এস শিক্ষাদাতা শিক্ষা দান আমায়, কি করিলে, দাস তোমার প্রকৃত দাস হইতে পারিবে । প্রভু ! —“নাশং বদামি ন ভজ্যামি ন চিন্তয়ামি, স্বপাদপদ্যযুগলং সততং নম্যামি ।” আমি যে তুমি ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না, অঙ্গ কাহারও ভজনা করি না ; কেবল তোমারই পাদপদ্মে সতত নমস্কার করিতেছি । দেব ! আমি তোমার ক্রীতদাস, নিত্য-কিন্দর ; আমাকে

৪র্থ খণ্ড

গুরোঃ কৃপা

২৩৭

ত্যাগ করিয়া, হেয় ভাবিয়া, লুকাইও না। এইরূপে সর্বাস্তর্যামী প্রভুকে প্রার্থনা করিয়া, হৃদয়ের ভাব জানাইয়া, মুজ্বিত নয়নে একাগ্রমনে হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করিয়া, —“গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং মুহুৎ” ভগবান্ ত্রীহরিকে খুঁজিতে লাগিলাম, খুঁজিতে খুঁজিতে, হৃদয় কমলের রক্তিম-দলে দেখিতে পাইলাম, প্রভু আমার,—

লসচ্ছন্দকোটি প্রকাশাদি পীঠে,

সমাসীহমঙ্কে সমাধায় সীতাম্।

স্মুরন্ধেমবর্ণাং তড়িৎপুঞ্জভাসং,

ভজে রামচন্দ্রং নিবৃত্তান্তিত্তদম্ ॥

শারদীয় পূর্ণমাসীর কোটিচন্দ্রপ্রকাশবৎ শোভমান, নানারত্ন-খচিত বিচিত্র সিংহাসনোপরি,—কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্শ্ময় উজ্জ্বল-সম্মোহন ত্রীভগবান্, তড়িৎপুঞ্জভাস কমনীয় কোমল কনক-কলেবরা হেমবর্ণা চপলা চাক্রকান্তি জ্যোতির্শ্ময়ী লক্ষ্মীকে অঙ্কে করিয়া, সমাসীন রহিয়াছেন। উভয়ের উজ্জ্বল-সম্মোহন জ্যোতির্শ্ময় কোমল কলেবর হইতে কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি চন্দ্রোৎফুল্ল আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে! প্রভুর জ্যোতির্শ্ময় কলেবরের—“ভেজোরাশিঃ সর্ব্বতো-দীপ্তমন্তম্” দ্রুত-বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইয়া, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে! ইহার আদি, অন্ত ও মধ্য কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। যেন ভুলোক হইতে—“নভঃস্পৃশঃ দীপ্তমনেকবর্ণাং” ছল্যক পর্য্যন্ত নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া, প্রভু বিরাজ করিতেছেন! তাঁহার অতি প্রদীপ্ত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, কোনক্রমেই ধৈর্য্য ও শান্তি অবলম্বন করিতে পারিলাম না। আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। অমনি সুযোগ পাইয়া, চঞ্চল চিত্ত, বিষয়-ভোগের লোভে লোলুপ হইয়া বিষয়ান্তরে ধাবতি হইল। বুঝিলাম, অজন্ম-সঞ্চিত চাঞ্চল্য একদিনে স্থির হয় না; যে পাপ জন্ম-সংস্কার

-লব্ধ-সম্পত্তি, তাহাও একদিনে ফুরায় না ; যে সুখ অনন্ত অক্ষয়, তাহাও একদিনে লাভ হয় না ;—“অনেকজন্মসংসিদ্ধান্ততো যাতি পরাং গতিম্।” কত কোটি-জন্ম-সঞ্জাত ভূয়োদর্শন-লব্ধ জ্ঞানের ক্রম-বিকাশে, কত উত্থান-পতন-বিবর্তনের মধ্যে পড়িয়া, সাধক একটু একটু করিয়া উন্নত হইতেছে। সুতরাং আমি একদিনে তাহা লাভ করিতে চাহিলে, পাইব কেমনে ? তবে পতিতপাবনী গঙ্গার কুপাতেই হউক অথবা পরমারাধ্য শ্রীগুরু-কুপালেশবশতঃই হউক, পূর্বাপেক্ষা চিত্ত অনেকটা সংযত হইয়া আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে এবং স্থির হইয়া, আপন প্রকোষ্ঠে স্থিত হইতে শিখিয়াছে ; আশা করি, উত্তরোত্তর উন্নতিলাভে কৃতকার্য হইতে পারিবে, আবার চেষ্টা করিয়া, মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করা যাউক।

অহো চিত্ত কথং ভ্রান্তঃ প্রধাবসি পিশাচবৎ।

অভিন্নং পশু চাত্মানং রাগত্যাগাৎ সুখী ভব ॥

রে চিত্ত ! কেন ভ্রান্তভাবে পিশাচের তায় অমৃত পরিত্যাগ করিয়া, বিষোদগারী বিষয়-সুখে ধাবিত হইতেছ ? স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয় সর্বজীবের জীবাধার-রূপ পাঞ্চভৌমিক দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মার সহিত আপন দেহের আত্মাকে অভিন্নভাবে দেখ এবং অনলে, অনিলে, মলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,—অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে,—জল-স্থল-মরুভ্যোম-বিশ্বচরাচরে সর্বত্র, এমন কি—পৃথিবীর আসন্ন হিমালয়ের বালুকণাটির ভিতরেও—সর্বগ সচ্চিদানন্দ ভগবান্কে অন্বেষণ কর এবং বিষোদগারী বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও। এইরূপে চিত্তকে বুঝাইয়া, আবার ধ্যানে বসিলাম ; কিন্তু, কি দুর্ভাগ্য ! পূর্বের তায় আর হৃদয়কমলে ভগবানের জ্যোতির্ময়ী প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম, চঞ্চল চিত্তের দোষেই এবারে ভগবানের কুপালাভে—বিমলানন্দভোগে বঞ্চিত হইলাম। হৃদয়ে আর সে আনন্দ, সে শান্তি

নাই, অশান্তি-বিক্ষোভিত সংশয়-সাগরালোড়িত-হৃদয়ে কত কি ভাবিয়া,
 মর্শ্ববেদনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম ;—হে অনাথের নাথ !
 হে চির-মধুর ! হে চির-নূতন ! আমি অভক্ত অভাজন, যতপি
 তোমার ঐকান্ত ভক্ত হইতে এখনও পারি নাই ; কিন্তু, তথাপি প্রভু !
 আমি আর্ত,—অতি দীন, অতি হীন; আর তুমি—“আর্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্”
 স্মতরাং তুমি আমার গতি, যুক্তি ও আশ্রয়। প্রভু ! যদিও আমি
 দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে, অভাব-অনটনের তীব্র তাড়নায় অষ্ট-
 প্রহর রুধিরাক্ত,—দুঃখ-দৈত্বেয় নির্ম্মম কশাঘাতে অষ্টপ্রহর ক্লিষ্ট এবং
 মথিত, দারিদ্র্যের দাবানলে দক্ষীভূত ; কিন্তু, তথাপি প্রভু ! আমি
 তোমার নিকট সুখৈশ্বর্য—ধন-সম্পদের প্রার্থী নহি। হে প্রাণনাথ !
 আমার হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে, তোমার ঐ যোগিবৃন্দ—যুনিবৃন্দবন্দ্য
 পদারবিন্দের সন্নিধানই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়। প্রভু ! শুনিয়াছি,
 তুমি ধার্মিকের প্রতি, ভক্তিমান ভক্তের প্রতি বিরাগরসিক, বিবেকীর
 প্রতি, সতত দয়ালু এবং অধার্মিক অভাজনের প্রতি, ভক্তি-বহির্ষুখ
 অভক্তের প্রতি, সংসারাসক্ত অবিবেকীর প্রতি তুমি নির্দয় ; তাই
 কি প্রভু ! এই অভাজনের প্রতি নির্দয় হইলে ?—

ন মেহস্তি ধর্ম্মো ন চ মেহস্তি ভক্তি—

নাহং বিবেকী করুণাং কুতো মে।

দাতাসি তেনাপ্য শরণ্যচিত্তে,

নিধেহি তে দেব পদং মদীয়ে ॥

হে দেব ! হে দয়ালো ! আমার ধর্ম্ম নাই, ভক্তি নাই, বিবেক নাই,
 আমার তেমন পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত নাই, তেমন ঐকান্তিকী ভক্তি নাই, তেমন
 পবিত্র আত্মজ্ঞান নাট ; তোমার ধার্মিক ভক্তগণ, তোমাকে পাইবার
 জন্য সংকীর্ত্তি-স্থাপনার্থ তোমার বিহার-মানসে অত্রভেদী মন্দির-চূড়া
 স্থাপন করে,—যাগ-যজ্ঞ যাজন করিয়া, ব্যোম-ব্যাপী যজ্ঞধূমে আকাশ

সমাচ্ছন্ন করে,—তোমার ঐকান্ত ভক্তিমান্ ভক্তগণ দিগন্তবিস্তৃত নাম-কীর্তন করে এবং দাতাকর্ণোচিত দান-শৌণ্ডিকতায় যথা সর্বস্ব দান করিয়া, বিরাগ রসিক বিবেকী হয় । কিন্তু, প্রভু ! আমাতে ঐ সকলের একটিও নাই ; কারণ, আমি অতি দীন হীনাতিহীন । আমি দীন-হীন ; আর, তুমি সর্ব-সম্পদের অধীশ্বর—দাতা । অতএব, হে শরণ্য ! আমি তোমার নিকট আর কিছুই প্রার্থী নহি ; আমার হৃদয়-কমলে তোমার ঐ—“ধ্বজবজ্রাক্ষুশাক্ত পাদযুগং” তোমার ঐ রাতুল চরণযুগল অর্পণ কর, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা । তুমি আমার এই প্রার্থনার বিষয় বিবেচনা করিয়া, তাহা পূরণ কর । আমি ভিখারী, ভিক্ষাই আমার সম্বল । এতকাল ধরিয়া লীলাময়ী প্রকৃতির নিকট ভিক্ষা করিয়াছি,—এখন দয়াময় তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি, ভিক্ষা দিবে না কি ? মায়াবিনী প্রকৃতি এখনও আমার সাদরে ভিক্ষা দিতে চায় ; কিন্তু, সে ভিক্ষায় ত এযাবৎ আশা মিটে নাই—পরিতৃপ্তি ঘটে নাই । অধিকন্তু, অপূর্ণ আর অরুচিদ পীড়ন ভোগ করিয়াছি । অন্ন মুষ্টিমেয় ; কিন্তু, ক্ষুধার সীমা নাই । বল দেখি প্রভু ! ইহাতে কি ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতে পারে ? যে খাণ্ডবানলে পুঞ্জ পুঞ্জ কাষ্ঠরাশি দিলেও ভস্মীভূত হইয়া যায়, তুচ্ছ তৃণ-মুষ্টি তাহার কি করিবে ! প্রকৃতির দ্বারে ভিক্ষা করিয়া, ক্ষুধা-পিপাসা মিটে না । পথে যত পথিক দেখিয়াছি, সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, সকলেই ঐকমুপ অতৃপ্ত-প্রাণে হতাশ-মনে কাল কাটাইতেছে । কত প্রলোভনের বস্তু দেখিয়াছি, ভোগও করিয়াছি ; কিন্তু কখন আশা পূরে নাই ; ক্ষুধাও মিটে নাই । তাহার কারণ এতদিনে বুঝিয়াছি,—“নাগ্নে সুখমস্তি” অগ্নে সুখ নাই ; সুতরাং একগতে চিরদিন আশা অপূর্ণই থাকিবে । কিন্তু শ্রুতি কহিয়াছেন,—“যো বৈ ভূমা তৎসুখম্” তুমিই ভূমা, অতএব, তোমাতে সুখ অনন্ত ও আনন্দ অসীম । আর, এই

জগতের যাবতীয় ভোগ্যবস্তু সসীম, সুতরাং অনিত্য ও অলীক। সুতরাং জানা গেল যে, জগতের মধ্যে একমাত্র তুমিই অসীম অনন্ত ও আনন্দ-স্বরূপ। তাই, আজ তোমার নিকট ভিক্ষার্থী। কবিকুল-তিলক ভট্টহরি কহিয়াছেন,—

“নাথে শ্রীপুরুষোত্তমে ত্রিজগতামেকাধিপে চেতসা,
সেব্যে স্বস্য পদস্ত দাতরি সুরে নারায়ণে তিষ্ঠতি ।
যং কিঞ্চিৎ পুরুষাধমং কতিপয় গ্রামেশমল্লার্থদং,
সেবায়ৈ যুগয়ামহে পরমহো মৃতা বরাকা বয়ম্ ॥”

‘অহো, আমরা কি মুখ’! ভগবান্ নারায়ণ পুরোষোত্তম, ত্রিজগতের একমাত্র অধিপতি, কেবল চিন্তা দ্বারা সেবিত হইলে, আপনার পদ পর্য্যন্ত প্রদান করেন, তিনি দেদীপ্যমান থাকিতে আমরা কোন্ এক পুরুষাধম, কয়েকটি গ্রামমাত্রেয় অধিপতি এবং অত্যল্প দাতা, এমন ব্যক্তির সেবার নিমিত্ত অশ্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছি।’ অতএব, প্রভু! আমায় তাড়াইয়া দাও, সেও ভাল, ভিক্ষা দাও, পরম লাভ; কিন্তু, আমি তোমাকে ছাড়িয়া, আর অত্যল্পদতার শরণাগত হইব না। কারণ, অল্পে আশা মিটে না,—মিটিল না। শুনিয়াছি, তুমি বিরাট; তাই তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। সাধারণ ধনী, ভিখারীকে যে কিছু দান করে, প্রয়োজন-নির্বাহে তাহা ছুদিনেই ফুরাইয়া যায়, শেষ হয়; পুনরায় ভিক্ষা ভিন্ন—“নাস্ত্যেব গতিরনুথা।” কোন ধনীই চিরতরে অভাবের নিবৃত্তি করিতে সমর্থ নহে। শুনিয়াছি, তুমি কিন্তু, তাহা পার; তাই—তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। শুনিয়াছি, তোমার নিকট ভিক্ষার্থী হইলে, “যং লব্ধা চাপরং লাভং নাশিকং মনুতে ততঃ” এই আশায় আজ তোমার করুণাপূর্ণ দ্বারে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

বাঞ্ছামি নাহমপি সর্ব্বধনাধিপত্যং
 ন স্বর্গভূমিগচলাং ন পদং বিধাতু ।
 ভূয়ো ভবামি যদি জন্মনি জন্মনি সাং,
 ত্বৎপাদপঙ্কজলসন্মকরন্দ্ভঙ্গী ॥

আমি ধনাধিপত্যও প্রার্থনা করি না, স্বর্গ-ভূমি কামনা করিনা, বিধাতার পদ প্রার্থনা করি না, প্রার্থনা করি এই যে, আমাকে যদি জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন আমি আপনার পাদার-বিন্দের মকরন্দ-ভঙ্গী হই। অতএব, সাধারণ ধনীর মত তুচ্ছ ধন দিয়া ফিরাইয়া দিও না। যে ধন ফুরাইয়া যায়, তাহা আমি চাহি না। চিরদিন যাহা ভোগ করিতে পারি, তাহাই আমায় দাও; অকিঞ্চন—অভাজনে আর প্রবঞ্চনা করিও না। আমি দীন, গুনিয়াছি,—তুমি দীনবন্ধু; সেই আশাতেই আজ তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। দিলে তুমি অনেক দিতে পার; কেন না, তুমি ভৃগু, মহান্, যুকুন্দ। অপুত্র-বৃদ্ধি-রূপ মুক্তি, সেই তোমার ইচ্ছাধীন। না না—তাহা চাহি না; চিনি। চিনির আশ্বাদ পায় না, সেজন্ত চিনি হইতে চাহি না। আমি চাহি। তোমার প্রেমাস্বাদ দিবে কি প্রভু? যদি বল, ‘ভিখারীর যোগাতা কি? অযোগ্য ভিখারীকে, তাহা প্রদান করি না।’ কেন, তুমি নিজেই বলিয়াছ,—‘ময়ি নিবদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ। বশে কুর্ষ্বন্তি মাং ভক্ত্যা সংশ্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।’ ‘যাঁহারা সমদর্শী ও সাধু এবং আমার প্রতি আসক্তচিত্ত, তাঁহারা সাধবী-স্ত্রী যেমন সৎপতিকে আয়ত্ত করেন, সেইরূপ আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন।’ এ কথায় বুঝা যায়, তোমার কৃপালাভ করিতে চাহিলে, যোগত্যাগ আবশ্যক। প্রেমিক হওয়া চাই; আর, সমদর্শী হওয়া চাই। আমি কিন্তু, সে যোগ্যতার অধিকারী নহি, তাহা জানি। আমার চিত্ত তোমার চরণ-সরোজে মধুপের ত্রায় মধুপানে নিবদ্ধ নয়। আমিও সাধু নহি; কেন না।

আমি আজিও ঈষ্টানিষ্ঠ-সম্পর্কে সুখ-দুঃখ অনুভব করি। অভাব-
 অভিযোগের তাড়নায় মুহমান হই ; সুতরাং সমদর্শী নহি।
 কিন্তু, প্রভু ! তোমার ওকথা শুনিতে চাহি না ; কারণ,
 আমি জানি ও মানি, তুমি কাল্পালের ঠাকুর, অগতির গতি। হে অনাথের
 নাথ ! তুমি সর্বজ্ঞ ; আর, আমি অজ্ঞ। তুমি পথ-প্রদর্শক ; আর,
 আমি পথিক। তুমি প্রভু ; আর আমি দাস,—চির-ভৃত্য,—নিত্য-কিঙ্কর।
 তুমি পিতা ; আর, আমি তোমার সন্তান ; সুতরাং—“অমৃতস্ত পুত্রা
 অমৃত্য ভবন্তি।” তুমি যদ্বী ; আর, আমি যন্ত। তুমি দয়ানিধি ; আর,
 আমি দয়াপ্রার্থী। তুমি সর্বদ ; আর, আমি ভিখারী। তুমি দয়া
 না করিলে, আর কে করিবে ?—তুমি ষড়ৈশ্বর্যশালী, তুমি ভিক্ষা না
 দিলে, আর কে দিবে ? শুনিয়াছি,—সর্বভ্যাগী না হইলে,—ভিখারী
 না হইলে, তুমি দয়া কর না, তাই ভিখারী সাক্ষিয়াছি। যদি বল,—
 ‘যুগ-যুগান্ত,—ধ্যান-ধারণা, যোগ-যোগ, দান-তপস্তা প্রভৃতি দ্বারা ভক্ত
 সাধক আমার দর্শন পায় না ; কেন না, আমি বাক্য-মনের অতীত,
 তর্কের অগম্য, বিনা সাধনায় তুমি সহজে কেমনে পাইবে ?’ সত্য
 কথা ; কিন্তু নাথ ! তুমি পরম দয়ালু, আমিও পরম ভিখারী !
 প্রকৃত দাতা, প্রকৃত দরিদ্রকেই দান করেন। যাহারা যোগে-যোগে,
 ধ্যানে-জ্ঞানে, দানে-তপস্তায় ধনী, তাহারাও যোগ-যোগ, জ্ঞান-ধ্যান,
 দান-তপস্তার বিনিময়ে তোমার কৃপা ক্রয় করিবে ; সুতরাং, তাহা-
 দিগকে ত তুমি ভিক্ষা দিবে না। আমার মত দরিদ্র ভিখারীই,
 তোমার দয়া-দানের পাত্র। তুমি না কি ভক্তপ্রধান কর্মবীর অর্জুনকে
 কহিয়াছ,—“অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্য-
 ভিষ্কানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥” যাহারা অনন্তচিত্তে সতত আমার
 উপাসনা করে, আমি স্বয়ং তাহাদিগের যোগক্ষেম বহন করি,—ইহা আবার
 আমার ভাল লাগে না।” কেননা অনন্তচিত্ত নিত্যভিষুক্ত ভক্তের প্রতি

কৃপা করিয়া তুমি নিজের দয়াময় নামের প্রচার কর না, ভক্তির জয়ই ঘোষণা কর । যে ভক্ত, সে ত ভক্তিগুণে তোমাকে বাঁধিবেই বাঁধিবে; কিন্তু, আমার মত অভক্ত অভাজনকে দয়া না করিলে তোমার দয়াময় নাম অনর্থক । আর, তোমার কৃপা ভিন্ন ভক্তও হওয়া যায় না,--“যমেবৈষ বৃণুতে ন লভ্যঃ ।” তুমি নিজে ভক্তি না দিলে, কেহ ভক্ত হইতে পারে না ; তুমি ধরা না দিলে, কেহ তোমাকে ধরিতেও পারে না । তোমাকে ধরিয়া বাঁধিবার একমাত্র সুদৃঢ় রজ্জু ভক্তি, ভক্তি দ্বারাই ভক্ত তোমাকে অনায়াসেই বাঁধিরা রাখিতে পারে এবং তুমিও ভক্তি দ্বারা সহজে বাঁধা পড় ।

তৃষাণতোয়ে মদনপবনোদ্ধূত-মোহোন্মিমালে,

দারাবর্তে তনয়সহজগ্রাহসঙ্খ্যাকূলে চ ।

সংসারাত্ম্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং নস্ত্রিধামনু,

পাদান্তোজ্ঞে বরদ ভবতো ভক্তিভাবং প্রদেহি ॥

কেন না, তুমি ভক্তিপ্রিয় ; ভক্তি না করিলে, ভক্তি না থাকিলে, তোমাকে কেহই বাধ্য করিতে পারে না । একথা সত্য ; কিন্তু, প্রভু ! সেই ভক্তিরও দাতা যে তুমি ! তুমিই সেই ভক্তিকে ভক্তকে দান করিয়া ভক্তকে চরিতার্থ করিয়া থাক ; সুতরাং এই দীন-হীন ভিখারীর প্রতি কৃপা করিয়া, দয়া করিয়া, করুণা করিয়া, আগেই সেই ভক্তিই আমাকে প্রদান কর । শুনিয়াছি,—তোমারই কৃপায় অতিমূখ জনেও তোমার প্রাণপ্রিয়া মুক্তিময়ী ভক্তিকে লাভ করিয়া, চরিতার্থ হইয়া থাকে । বিবিধ-জ্ঞান, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ধ্যান, হোম প্রভৃতি যত কিছু মহাফলপ্রদ কার্য আছে, কোন কিছুতে কেহই সেই সর্বফল-প্রদা ভক্তিকে লাভ করিতে পারেনা ; কিন্তু, তুমি যাহার প্রতি কৃপা কর, তোমার কৃপায় সেই ভাগ্যবানই ভক্তি লাভ করিতে পারে এবং ভক্তি

দ্বারা আস্তে তোমার মূর্তিময়ী মূর্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব, অহর্নিশ তোমাতে যে ভক্তি, তাহাই উত্তম ফল।

স্বর্গস্থ মোক্ষস্থ জগন্নিবাস,

সোপানপঙ্ক্তিস্তব ভক্তিরেখা।

ত্বৎপাদসংপ্রাপ্তি ফলাশুয়ে তু,

সোপানপঙ্ক্তিং ন বদন্তি ধীরাঃ ॥

হে জগন্নিবাস ! স্থাবর-জঙ্গমাশ্রক সর্ববিধ জীবের সতত প্রার্থনীয় দৃষ্ট ও শ্রুত যত কিছু ফল আছে, স্বর্গ-মোক্ষাশ্রক সেই ফল প্রাপ্তি-বিষয়ে তোমার প্রতি ভক্তিই সোপান-পঙ্ক্তি-স্বরূপিনী ; কিন্তু, স্মৃতি সুবিজ্ঞ ধীর ব্যক্তির তোমার শ্রীচরণাশ্রয়-রূপ প্রাপ্তি বিষয়ে কোনরূপ সোপান-পঙ্ক্তিরই নির্দেশ করিতে পারেন না।

নাস্থা ধর্ম্মে ন বস্তুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে,

যদ্যন্তবাং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্মানুরূপম্।

এতৎ প্রার্থ্যং মম বহু মতং জন্মজন্মান্তরেহপি,

ত্বৎপাদান্তোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরন্ত ॥

অতএব, হে প্রভো ! আর একটি প্রার্থনা, তোমার প্রতি ভক্তি লাভের পথে কতকগুলি অন্তরায় বিद्यমান ; সেগুলি আমার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া, একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। তাহার তোমার পরমপ্রিয়া ভক্তিদেবীকে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দেয় না ; সুতরাং কৃপা করিয়া, আগেই সেইগুলির উচ্ছেদ বিধান করিয়া দাও, ইন্দ্রিয়রাজি আমার পক্ষে দুর্জয়, আমার ক্ষীণ শক্তি তাহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারে না। তুমি হৃষীকেশ—ইন্দ্রিয়াধিপতি, তুমি তাহাদিগকে সুপথে না ফিরাইলে, কে আর ফিরাইবে ? আমার কি সাধ্য যে ইন্দ্রিয়কে আয়ত্ত করিব, মনকে অধীন করিব, আমি জানি—আমি অক্ষম, তোমার ইচ্ছা ব্যতীত আমার উচ্ছাস—নিঃশ্বাসেও অধিকার নাই।

আমার হাত ধরিয়া, আমাকে প্রকৃতপথে লইয়া চল ; দুর্জয় রিপুচয়ের হাত হইতে উদ্ধার কর, রক্ষা কর। তুমি ভিন্ন অত্ন আর কেহ পারে না, পারিবেও না। মাত্র তুমিই পার, তাই তোমার কাছে করুণা ভিক্ষা করিতেছি। অজ্ঞামিলের বেলায় পারিয়াছ, রত্নাকরের বেলায় পারিয়াছ, জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়াছ ; আর, আমার বেলায় তোমার দয়ার সাগর শুষ্ক হইবে ? অসম্ভব। তাই,—তোমার কাছে ভিক্ষা চাই। আমি ভিখারী ; আর, তুমি দাতা। কিসে আমার মঙ্গল হইবে, কি করিলে আমি ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়া, ভক্তিমান হইতে পারিব, তাহাও তুমিই জান। অধুনা যাহা তোমার উচিত হয়, তাহাই কর। প্রার্থনা করা ভিখারীর স্বধর্ম। তুমি 'পরম কারুণিক' শুনিয়াই, তোমার দ্বারে ছুটিয়া আসিয়াছি,—দেখি, তুমি কেমন দয়ালু। ভিখারীর আশা পূর্ণ না কর, ক্ষতি নাই, ফিরিয়া যাইব,—আর বলিব,—'তুমি দয়ালু নহ, অতি নিষ্ঠুর—নির্দয়—নির্মম।' যদি বল,—'তোমার ভাগ্যে নাই, যাহা ভাগ্যে নাই, তাহা পাইবে কি ?' প্রভো ! সে ভাগ্যের নিয়ন্তা কে ? যদি বল,—'তোমার ভাগ্য, তুমি গড়িয়াছ,—নিজ কৰ্ম্মফলে নিজে মজিয়াছ' ; তবে তুমি শক্তিমান কিসে ? তুমি সর্বশক্তিমান হইয়াও কি তাহার অত্না করিতে পারিবে না ? আমি কে ? তুমি ছাড়া 'আমি'র কার্য্যকারিতা কোথায় ? তুমি 'আমি'র চালক নহ ? যদি তুমি আমার-ভাগ্যে এ দুর্ভাগ্যের বিধান করিয়া থাক, তবে তুমি হয় পক্ষপাতী, নয় অতি নিষ্ঠুর। তুমি পক্ষপাত করিতেই পার না ; তুমি দয়াময়, তুমি পক্ষপাতী হইতে পার না। যদিও আমার কৰ্ম্মফলে, আমি পতিত হই, যদি তোমার ভক্তিলাভে আমি অশক্ত ; তবে অল্পপায় অপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রকাশই মহতের মহত্ব। তুমি মহত্তম, তোমার অপার করুণা ! তাহা না হইলে, বিপদে পড়িয়া,

লোকে তোমাকে—‘বিপদ-ভঞ্জন’ বলিয়া, ডাকিবে কেন? ভয়ে অভয়, বিপদে ভ্রাণ, নিরাশায় আশ্বাস, বিপদে উদ্ধার, আর্ত্রে করুণা,—এ সকল তোমারই গুণ এবং তোমাতেই বিद्यমান; অত্রে থাকিতে পারে না। তাই—জগদ্বাসী বিপদে, সম্পদে প্রাণ খুলিয়া তোমায় ডাকে। তুমি প্রত্যক্ষভাবে হউক বা অপ্ৰত্যক্ষভাবে হউক, তাহাদিগের প্রার্থনা পূরণ কর। যাচক, তোমার দ্বারদেশ হইতে পরাভুখ হইয়া ফিরিয়া যায় না, যায় নাই, যাইবেও না। তুমি বরদ, তুমি সর্বদ, তুমি মুকুন্দ, তুমি কৃপা-কল্লভরু। তোমার চরণোপান্তে—তোমার পদ-পঙ্কজ-পঙ্ক-রাস্তে দীনাতীতীন-মনোভূজ, মকরন্দ-নিঃশ্রুন্দ-পানের ছরাশা লইয়া বিচরণ করে। ভিখারী বড় আশা লইয়া, তোমার দ্বারে আসিয়াছে। আশা আছে, অবশুই ভিখারীর আশা পূর্ণ হইবে। অতএব,—

কামেন কোপেন চ মৎসরেণ,

দন্তেন দর্পাদিভিরপানেকৈঃ ।

একৈকশঃ কৃচ্ছুগতোহস্মি বিদ্ধ—

স্বনাথ মদ্বারয় নাথ শত্ৰু ॥

আমার একান্ত আশা ভক্তি-কণ্টক শত্রু-নিচয়কে বিনাশ করিয়া, আমার হৃদয়-রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবে; কেন না, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ, মদ-মাৎসর্য্য, দন্ত-দর্প, অভিমান-অহঙ্কারাদি দ্বারা আমি বহুবার কৃচ্ছুগত ও মর্দ্যাহত হইয়াছি। হে অনাথের নাথ! তুমি কৃপা করিয়া, ঐ সকল শত্রুকে অগ্রেই নিবারণ কর। তুমি চরাচরের আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা,—কর্তা, হর্তা ও বিধাতা অর্থাৎ পরিপোষক। অতএব, হে দয়ালো! আমার ভক্তি থাকুক, আর নাই থাকুক, তোমার শরণাগতি ব্যতীত আর আমার অন্য কোনও উপায়ান্তর নাই। হে অনুপায়ের উপায়! হে অনাথের নাথ! হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! হে অসহায়ের সহায়! তুমি আপন মহত্বের প্রতি দৃষ্টি করিয়া,

মাদৃশ দীন-হীনজনের প্রতি অনুগ্রহ কর । কেন না,—

নজাতিধর্ম্মাণি ন বেদশাস্ত্রং,

ন ধ্যানযোগো ন সমাধিধর্ম্ম ।

কৃষ্ণ হরিং কেশবং শান্তচিন্তং,

ভক্ত্যা দেবং বাসুদেবং নমস্তু ॥

না আছে আমার জাত্যচিত ধর্ম্ম, না আছে আমার বেদাশাস্ত্র-জ্ঞান, না আছে আমার ধ্যান-যোগাভ্যাস, না জানি আমি সমাধি-ধর্ম্ম । কিন্তু, প্রভু! এ সকলের কোনটিই না জানিয়া বরং আমার বিশ্বাস আছে যে, তোমাকে কোন দিন না কোন দিন পাইবই পাইব; কেন না, এ সকলের কোনটির দ্বারাও তোমাকে পাওয়া যায় না, সেই জন্ত এই সকলের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া, এক্ষণে জগতের সর্বমঙ্গলের নিদান যে তুমি শান্তমূর্ত্তি কৃষ্ণ, হরি, কেশব নামধারী ভগবান্ বাসুদেব, সেই তোমাকে ভক্তি-সহকারে নমস্কার করিতেছি ।

এইরূপে ভগবানের নিকট কৃপাভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া, আবার ধ্যান করিতে বসিলাম । স্তিমিত-নয়নে মুদিত-মনে ভগবদ্ব্যানে নিরত হইলাম; কিন্তু, পূর্বের মত জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইতেছি না, বড় ক্ষোভে হতাশ-চিন্তে জানাইলাম,—হে প্রভু! হে কালালের ঠাকুর! হে অনাথের নাথ! তুমি নিজধাম বৈকুণ্ঠের কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্ম্ময় শান্তি-নিকেতন, কোটি-চন্দ্র-প্রকাশক শোভামান নানারত্নখচিত বিচিত্র রত্নময় সিংহাসনোপরি সমাসীন; কিন্তু প্রভো! আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বর নহি,—আমি কালাল, অনাথ, অতিদীন এবং ঐশ্বর্য্যহীন; সুতরাং তোমার জন্য অমন নানারত্ন-খচিত, অমূল্য-রতন-বিচিত্র, বিবিধালঙ্কার-সুশোভিত সিংহাসন কোথায় পাইব?—কিন্তু, দেব! তোমায় সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিতে বড় সাধ হয় । হে দয়াময়! হে করুণাসিন্ধো! হে দীনবন্ধো!

হে অনাথের নাথ ! এই দীনাতিদীনের,—এই অনাথের ত্রিতাপদহনে দক্ষীভূত, আলাময় গোড়া হৃদয়-সিংহাসনখানি ভক্তি-গঙ্গাজলে ধোত করিয়া, তাহার উপর অমুরাগের ছেঁড়া আঁচলখানি পাতিয়া, তোমার অধিষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছি, তুমি আসিয়া তাহাতে উপবেশন কর । তাপদঙ্ক ভগ্ন হৃদয়-সিংহাসনে তোমাকে বসাইয়া, অশ্রু-ধারায় তোমার ঐ—“মণি-রঞ্জিত-গঞ্জিত-ভৃঙ্গমদঃ ” বিশ্ববিজয়ী রাতুল চরণ দুখানি অভিষিক্ত করিয়া, এই আলোক-আঁধার-মিশ্রিত জীবন-সন্ধ্যায় একবার প্রাণ ভরিয়া, তোমার জ্যোতির্ময়ী মূর্তির দর্শন করিয়া, সমস্ত জীবনের কার্য্যাকার্য্য তোমার শ্রীচরণে ঢালিয়া দিয়া, মহাকালের হস্তে আত্মসমর্পণ করি । হৃদয়েশ্বর ! প্রাণের দেবতা ! আজ প্রাণের আলায়, বড় আশায় তাপদঙ্ক হৃদয়ে ভগ্নসিংহাসনে তোমার জন্ম আসন পাতিয়া, তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি । এক্ষণে আমার একান্ত বাসনা—দেহ, মন, প্রাণ যথাসর্ব্বশ্ব পণ করিয়া, তোমার পূজা করিব ; কিন্তু দেব ! ইহা ভিন্ন আর আমার কোন শক্তি-সামর্থ্য নাই,—আমার শরীরে যে শক্তি আছে,—মনে যে উৎসাহ আছে, তাহা তোমারই সেবায় নিয়োগ করিব । তুমি আমার হৃদয়ে আসিয়া হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজিত হও ; আমি তোমার রাতুল চরণ দুখানি অশ্রু-প্রবাহে অভিষিক্ত করিয়া, পূজার আয়োজন করি । আমি সকল ভাবেই কান্দাল, আমি সর্ব্বপ্রকারে অশক্ত, আমার কোন গুণ নাই যে, সেই গুণে তোমার পূজা করিব, এমন কোন বস্তু নাই, যাচা তোমায় উপহার দিব ! যদি আমার মন বশে থাকিত, পবিত্র ও নিষ্পল হইত, তাহা হইলে, তাহা তোমায় উপহার দিয়া, তোমার তুষ্টি লাভ করিতে পারিতাম,—নিরবধি তোমার চরণে ফেলিয়া দিয়া, প্রাণ খুলিয়া কাদিতাম । এইরূপে, ভগবানের শ্রীচরণে মনোবেদনা,—একান্ত প্রার্থনা জানাইয়া, আবার মুদিত-নয়নে ভগদ্ব্যানে বসিলাম ;

কিন্তু, এবারে দেখিলাম, মন কিছুক্ষণ ধ্যানে মগ্ন হইয়াছে, কিছুক্ষণ বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। পরন্তু, শীতের প্রাবল্যে চিত্ত ব্যথিত হইয়া, আবার, বিক্ষিপ্ত হইয়া যে—ই কে সে—ই হইল। রে চিন্তাতুর চিত্ত ! তোমায় বিনয় করি, সুযোগ পাইয়া, আর বিষয়-চিন্তায় নিরত হইও না ! একবার স্থির হইয়া, সেই “পরিপূর্ণ-মৃগাক্ষসুচারুমুখং” ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিরত হও, শান্তি পাইবে, সকল দুঃখ অন্তর্হিত হইবে। একবার বিষোদগারী বিষয়-চিন্তার অবসর ভুলিয়া ভগবানের চিন্তা করিয়া দেখ, তাঁহার চরণ-কোকনদে কত আনন্দ ! —কত সুখ ! একবার স্থিরভাবে একাগ্র হইয়া, ভগবানের “কলনুপুরহংস-বিলাসগতিং” চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, আনন্দ পাও কি না। একবার স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে, —“মণিনির্মিতপঙ্কজমধ্যগতং” করিয়া, তাঁহার কমনীয়-কান্তি উজ্জল-সম্মোহন মূর্তিকে—“মণিকৌন্তভভূষিতহারযুতং” করিয়া, চিন্তা কর দেখি, আনন্দ পাও কিনা। এইরূপে মনকে বুঝাইতে বুঝাইতে, আর একটি নূতন বিঘ্ন উপস্থিত হইল,—শত-শিখায় উদ্দীপ্ত হইয়া, জঠরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ভাবিলাম, —“শ্রেয়ান্দি বহবো বিঘ্নাঃ”; সুতরাং—“ক্ষুধিতানাং তুর্গতানাং কুতো যোগসমাধয়ঃ”। ক্ষুধিত ও তুর্গত জীবের যোগ-সমাধি কোথায় ? জঠর-কলসী কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না, ইহা কতবারে—কত প্রকারে আমায় বিড়ম্বনা করিয়াছে ! —ইহা অভিলষিত অসীম-মাননার গ্রন্থিচ্ছেদন পূর্বক তদ্বিষয়ে নিজের নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। চন্দ্রোদয়ে নলিনী নিমীলিত হয়, উহাও সেই প্রকার সমুদিত হইয়া, গুরুতর গুণগ্রাম-রূপ কমলকে সঙ্কুচিত করিয়া দেয় এবং তুর্দ্বিধ কুঠার-স্বরূপ হইয়া, পরম লীলাময়ী লজ্জাবতীলতাকেও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। ক্ষুধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, আমার ভগবচ্চিন্তায় বাধা জন্মাইল,—

বীভৎসাঃ প্রতিভাস্তি কিং ন বিষয়াঃ কিন্তু স্পৃহা যুস্মতী,

দেহস্থাপচয়োমূর্তৌ নিবিশতে গাঢ়ো গৃহেষু গ্রহঃ ।

ব্রহ্মোপাস্তমিতি ক্ষুরতাপি হৃদি বাবর্তিকা বাসনা,

কা নামেয়মতর্কাহেতুগহনা দৈবী সতাং যাতনা ॥

আহা ! সাধুদিগের এ কিরূপ দৈবী যাতনা, ইহা অতর্ক্য হেতুতে
অতিশয় গহনা ! বিষয় সকল জঘন্য থাকে ; কিন্তু স্পৃহা দীর্ঘজীবিনী।
তাহার বিনাশ হইতেছে না, অপর দেহ বিনশ্বর, তাহার ধ্বংস আছে,
বুদ্ধিতে এমত প্রবিষ্ট হইতেছে । অথচ, গৃহের প্রতি গাঢ় অনুরাগ,
তাহার স্বর্ক্বতামাত্র হয় না ; আর, পরাংপর পরব্রহ্ম পরমেশ্বরই সকলের
হৃদয়মধ্যে ক্ষুণ্ণি পাইয়া থাকে ; কিন্তু, বাসনা তাহার প্রতিবন্ধক
হইতেছে । বাসনা—উন্মাদিনী ! তুমি সং হইয়া, শুদ্ধ হইয়া, পবিত্র
ও নির্ম্মল হইয়া, ক্ষুধাগ্নি সকল নির্ব্বাণ করিয়া, সমাক-রূপে উদয়
হইয়া, সেই—“যমুনাতটক্রমতলে নীলাম্বুদশ্যামলম্” ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের
পদ-পঙ্কজ-পঞ্জরান্তে একবার প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহার পদ-পাথোরুহ-
নিঃসরন্মকরন্দ পানে মত্ত হও, বুঝিতে পারিবে, তাঁহাতে কত মধু কত
সুখা আছে; তুমি সে মধু—সে সুখা পান করিলে, তাঁহার আনন্দ-
লাভে নিবৃত্ত হইয়া, আর কদাপি বিষয়-বিরসে মজিবে না । অতএব
এস, একবার ভক্তি-ডোরে তাঁহাকে হৃদয়-মন্দিরে বাঁধিতে চেষ্টা করি,
যে রূপে অন্ধ বিশ্বয়ঙ্গল অন্ধ হইয়া, বিপদে পড়িয়া, কাতরো-উদ্বেলিত-
প্রাণে—“হা প্রাণসর্ব্বস্ব ! হা হৃদয়রঞ্জন ; হা করুণানিধে ! হা দীন-
বন্ধো ! আমাকে তোমায় দান করিলাম, তুমি এক্ষণে আমাকে
‘তোমার’ বলিয়া, গ্রহণ কর—আমি কৃতার্থ হই । প্রাণনাথ ! হৃদয়েশ্বর !
তোমার অশ্বেষণে চরণে কণ্টকাঘাত, মরমে বজ্রাঘাত, দুর্নয়নে অশ্রু-
পাত,—আর উদরে জঠরাগ্নির উৎপাত, তাই, দেব—! তোমায়
নিদারুণ ব্যথা জানাইতেছি, তাহা কি তুমি জানিতেছ না ? তুমি

আমায় আকর্ষণ করিয়া, কাছে টানিয়া লও, আমায় সংসার ভুলাইয়া,
ছার সংসারে অমানিশা আনিয়া দাও ; আর, আমার বাসনা-বহি
নিভাইয়া, আমাকে ভুমি ভোমার করিয়া লও, আমার আমিষ
ঘুটিয়া যাউক ।

“হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো,

হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো ।

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম,

হাহা কদাভুভবিতাসি পদং দৃশোমে’ ॥”

এই বলিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ভগবান্কে ডাকিতে ডাকিতে,
বৃন্দাবনে বনে বনে খুঁজিয়া ধরিয়া বাঁধিয়াছিলেন ; বাসনা ! তুমিও
সেইরূপ বাসনা করিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া ধরিয়া হৃদয়ে বাঁধিতে পারিবে
না কি ? বীর সাধক প্রেমিক ভক্ত বিশ্বমঙ্গলের ত্রায় তাঁহাকে
বাঁধিতে পারিলে, তিনি আর যাইবেন কোথায় ? চিন্তকে সঙ্গে
লইয়া এস, আজ যে প্রকারে হউক, তাঁহাকে খুঁজিয়া, হৃদয়ে ধরিয়া,
বাঁধিয়া রাখিব । কিন্তু, বাসনা ! এ আবার কে ? সহসা এমন গহন গভীর
করাল বদন ব্যাদান করিয়া, রক্ত-চক্ষে আশ্বালন করিতে করিতে,
যেন বিকট হুহুকার-রবে ছুটিয়া আসিতেছে !—কি ভয়ঙ্কর মূর্তি !
—যেন কৃষ্ণরেখা-বেষ্টিত দিগ্‌দাহী,—বিশ্বদাহী জ্বলন্ত সৌরমূর্তি !
আদি নাই, অন্ত নাই,—চন্দ্র উপাড়িয়া, নক্ষত্র গিলিয়া, অঘোর নৃত্যে,
রুদ্র-তাণ্ডবে, বেগবান্ গতিতে, পৃথিবী কম্পন করিয়া, জীব-জগৎ
টলায়মান করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে ! অহো,—দংষ্ট্রাকরালানি চ তে
মুখানি, দৃষ্টেব কালানলসম্মিভানি ।” বাসনা ! একবার স্থিরদৃষ্টিতে
উকি মারিয়া দেখ ত !—সাহস করিয়া চাহিয়া দেখ মরিবার ভয়
করিও না,—তুমি মরিলেই ঘুটিবে জঞ্জাল ;—হতাশ হইও না, ধৈর্য্য
ধর । অহো ! কি শব্দুত মুচ্কি হাঁসিয়া, আড়নয়নে চাহিয়া, আধঘমটা

৪র্থ খণ্ড

গুরো: কৃপা

২৫৩

নাচিয়া নাচিয়া, নিকটে আসিয়া, আমার সাধনার ধন,—“নবনীরদ-
নিদিতনীলতরুং” নন্দাত্মজ শ্রীকৃষ্ণকে আড়াল করিয়া দিল!—ঐ যে
আমাকেও গ্রাস করিতে, অনন্ত বাহু বিস্তার করিতেছে! উহাকে
দেখিয়াই—“দিশো ন জানে ন লভে চ শর্যু” আমার পায়ের নখ হইতে
মাথার চুল পর্য্যন্ত কাঁটা দিয়া উঠিল,—যেন চৈতন্য হারাইবার ঠিক
শেষধাপে পা পড়িয়াছে! যদি শরীর স্পর্শ করিয়া ফেলে, তবে
আমাতে আর ‘আমিত্ব’ বা আমার জ্ঞান থাকিবে না, আমার
‘আমিত্ব’ জ্ঞান লোপ পাইয়া যাইবে। দেখ, বিশ্ব-বিমোহিনী নিদ্রা!
তুমি দূরে থাক, আমায় গ্রাস করিও না, তুমি গ্রাস করিলে, আমাতে
আর আমার জ্ঞান থাকিবে না; তোমায় বিনয় করি, দূরে সরিয়া
যাও। এ আবার কে? অবসর পাইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া, সজ্জীভূত
হইয়া, প্রকৃটি-ভঙ্গি দেখাইয়া, আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে!
কে তুমি? আলস্য! তুমি আমার সাধন-পথের মহাশত্রু! সাধ-
নায় বিঘ্ন জন্মাইবে বলিয়া, অনন্ত বাহু প্রসারিয়া, নিকটে আসিতেছে?
তোমাকে দেখিয়া, আমার অন্তরাগ্না নিদান-চমকে চমকিয়া, সর্বশরীর
রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল!—“প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।” এবারে
তোমরা উভয়েই রসাতলে যাও; নিদ্রা ও আলস্য,—এই দুইটি
সাধনের মহা অন্তরায়, দুইটিই সাধনের মহাশত্রু, ইহারা দূরীভূত না
হইলে, সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। শাস্ত্র বলেন,—

নিদ্রালস্যং মহাবিঘ্নং জিহ্বা শত্রুং প্রযত্নতঃ।

সুখাসনে স্থিতৌ নিত্যং ধ্যানযোগাভ্যাসেন্নিশি ॥

নিদ্রা ও আলস্য সাধনার মহা বিঘ্ন, এই দুই মহাশত্রুকে যত্ন-
সহকারে জয় করিয়া, অতঃপর সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া, অহর্নিশ
ধ্যান-যোগাভ্যাস করিবে। যাহাই হউক, এক্ষণে নিদ্রা ও আলস্য
সরিয়া গিয়াছে, একবার সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ভাবময় ভগবান্কে

মনোময় করিয়া, ধ্যান করা যাউক। কিন্তু চিন্তকে শান্ত করিয়া, একাগ্র হইয়া, হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে—“পরিপূর্ণমুগাঙ্কসুচারুযুগং” ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতেছি, মনে কি জানি কি এক অক্ষুট স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। অমনি সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের একটা ছুর্ভাবনা আসিয়া, জোর টান দিল। ছুর্ভাবনা ! তুই আবার আসিয়া, হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, সাধনায় বাদ সাধিলি ? আবার কেন স্মৃতির বাবধান বিস্তার করিয়া, সেই “পরিপূর্ণমুগাঙ্কসুচারুযুগং” শাস্তিময়কে আচ্ছাদন করিলি ? আনন্দময়কে ভুলিয়া, তোর কুহকে পড়িয়া, আবার কেন চিন্তা-স্রোতে ভাসিয়া, এমন—“কোটিসূর্য্যপ্রতিকাশং” এমন—“চন্দ্রকোটি-সুশীতলং” বিশ্ব-বিমোহন আলোক-রশ্মিকে স্তূপীভূত তমোরাশিতে আচ্ছাদিত করিয়া, ধ্যানযোগের অন্তরালে—দূরে অনন্ত দূরে সরিয়া পড়িলাম ? তুই না এমন করিলে, আজ এমন ভাবে সংসার-সাগরের অগাধ-জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতাম না,—শয়তান ! আমা হইতে দূরে সরিয়া যা !—তুই ত আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্ !—বাসনা ! বলিতে কি, তোমাকে দেখিয়া হুঃখও হয়, আর হাসিও পায় !—হয়ত তুমি জিজ্ঞাসিবে,—‘তবে কি রাগও হয় ?’—না, তাহা হইলে সংসারে বিরাগ হইবে কি প্রকারে ? তুমি না থাকিলে, না জানি,—এ ছরন্ত কাল-তরঙ্গে কে আমায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইত ; না জানি তোমার অভাবে, সে তরঙ্গের কোন্ অন্ধতম গুহায় বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম। তুমি আমার এমন অমূল্য রত্ন ; অতএব, তোমায় আশীর্ব্বাদ কর,—“চিরঞ্জীব।” কিন্তু, বাসনা ! তোমার ঐ যে কালামুখী মলিনা-নগ্নী সতীনটি, উহার স্বভাব কুটীলা, ঐ মলিনা বাসনা, আমাকে কতবার বিপদ-রাক্ষসীর করাল-কবলে নিক্ষেপ করিয়াছে,—কতবার আমার সর্ব্বনাশ সাধনায় চেষ্টা পাইয়াছে, উহাকে আমি বিশ্বাস করি না,—বড় ভয় করি, উহা হইতে অনেক দূরেও থাকি। তোমার

নামটি যেমন ‘শুদ্ধাবাসনা’ কর্তব্যও তেমন,—বুঝিয়াছি; সর্বপ্রকার
 সমৃদ্ধির মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। অন্য আর বক্তব্য কি? —তোমার
 অনুকম্পা ঘটিলে, আমার মনোভঙ্গ প্রাণ-পবনের সহিত উড়িয়া গিয়া,
 একদমে সেই কারুণ্যামৃত কারুণ্যামৃত লাবণ্যামৃত মধুসূদন মধুচক্রে, যাহার
 —“অধরং মধুরং বদনং মধুরং হাসিতং মধুরং চলিতং মধুরম্” “তাহার
 —“মণিরঞ্জিতগঞ্জিতভঙ্গমদং” শ্রীচরণ—কোকনদে বসিয়া, মধুপানে মত্ত
 হইতে পারে। স্বতরাং তোমার যে অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ
 ক্ষমতা আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানিয়াছি। তোমার সহিত যদি
 ধৃতি, ক্ষমা, অলোভ ও সত্য প্রভৃতি সম্মিলিত হয়, তবে ইহলোকে—
 কেবল ইহলোকে নহে, পরলোকেও তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।
 তবে তোমার গোলকে পৌছাইবার সাধ্য নাই বটে; কিন্তু, এবার তুমি
 আমার পরলোকে মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা ভাল বোঝ,—তাহাই কর!
 কিন্তু, তোমাকে, যুক্তিমিচ্ছু যুগ্মকুরা বড় ভয় করে; কেন না, তুমিই
 আবার সংসারের মূল কারণ, তুমিই জীবকে সংসারী করিয়া, তাহার
 চির-সঙ্গিনী হইয়া, স্বর্গ-মর্ত্য—উত্থান-পতনের বিবর্তনে চালাইয়া, তাহা-
 দের মুক্তির পথ অরোধ করিয়া থাক; দেখিও—আমার এমন
 সর্বনাশ করিও না! তবে তুমি একা নহে, যখন তোমারও কালামুখী
 সতীনের সহিত সম্মিলিত হও, তখনই তাহার সংসর্গে তোমারও কুমতি
 উপস্থিত হয়। তোমরা উভয়ে সম্মিলিত হইলে, জীবকে ভগবচ্চরণার-
 বিন্দু হইতে দূরে সরাইয়া দাও। অতএব, উহার সহিত সম্মিলিত
 হইও না, উহার সহিত মিলিত হইলে, তোমরা জীবকে জন্ম-জন্মান্তর
 ঘুরাইয়া, মোক্ষপথভ্রষ্ট করিয়া সংসার-গর্ভে মোহ-পঙ্কে নিক্ষেপ করিয়া
 দাও। অতএব আর, তোমার আমি সহায়তাপ্রার্থী নহি, এবারে
 তুমি যাও, তোমাকেও আমার ভয় হইতেছে। ঐ দেখ, তোমার
 পশ্চাতে পোড়ামুখী কুমতি থাকিয়া, কেমনভাবে উকিঝুঁকি মারিতেছে!

—সে আমাকে ভুলাইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছে ! কুমতি !
আর সে দিন নাই, তুমি তোমার যথেষ্ট স্থানে গমন কর, নতুবা
আমার নিকট আসিলে, তোমার আর ছুংখের পরিসীমা থাকিবে না।
যদি সুখী হইতে চাও, শান্তি পাইতে চাও, তবে আমার উপদেশ
শিরোধার্য্য কর, তুমি মূখের সেবায় নিযুক্ত হও, সুখী হইবে—
শান্তি পাইবে এবং চিরকাল নিরাপদে থাকিবে। অতএব,—

মূখং শুলভং ভজস্ব কুমতে মূখস্য চাষ্টৌ গুণা—

নিশ্চিন্তো বহুভোজনোহতিমুখরো রাত্রিং দিবং স্বপ্নভাক্ ।

কার্য্যাকার্য্যবিচারণাক্ষবধিরো মানাপমানে সমঃ,

প্রয়োগময়বর্জিতো দৃঢ়বপুমূখঃ সুখং জীবতি ॥

হে কুমতি ! তুমি মূখের ভজনায় মিরত হও, মূখের—আর
অন্য কিছু গুণ নাই থাকুক, বক্ষ্যমাণ আটটি গুণ সততই তাহাতে
বিद्यমাণ ; —নিশ্চিন্ত-চিন্ত বহুভোজনশীল, বাক্পটুতা, দিবারাত্রি
নিদ্রাশীল, কার্য্যাকার্য্য-বিচারহীন, অস্ত্রানাক্ষ, মানাপমান গুনিয়াও
বধির এবং রোগবর্জিত দৃঢ় শরীর,—প্রায়ই এই সকল গুণ মূখলোকের
শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কুমতি ! তুমি মূখের নিকট
যাও, আমার হৃদয়ে আর তোমার স্থান নাই, থাকিবারও উপায় নাই।

এইরূপে, যুক্তি-সহকারে সাধন-পন্থের অন্তরায়সকল একে একে
অপমৃত্ত করিয়া, সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া,
ষড়রিপু সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপুচিন্ত হইয়া,
হৃদয়ে-কমলের রক্তিমদলে—“জগদাদিগুরুং ব্রজরাজসুতং” ভগবান
শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করিয়া, একাগ্রমনে ধ্যানে নিবিষ্ট হইলাম। আহা !
প্রভুর কি সুন্দর রূপ ! দেখিতেছি—“দিবিস্মর্য্যমহশ্রম্য ভবেদ্যুগপ-
দুখিতা । যদি ভাঃ সদৃশী সা স্রাদ্ভাসন্তশ্চ মহাত্মনঃ ॥” তাঁহার
উজ্জ্বল-সম্মোহন জ্যোতির্ময় কলেবর হইতে যে আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ

হইতেছে, সহস্র সহস্র সমবেত যুগপৎস্থিত জ্যোতিষ্কজীবন মধ্যাহ্ন-
তপনের প্রাণ-বিমোহন প্রভাও নিতান্ত মলিন ও নিম্প্রভ বলিয়া
প্রতীয়মান হইতেছে। শরৎঋতুর সুনির্মল নীলাকাশে, শারদীয় পৌর্ণ-
মাসীয় সহস্র মুখাকরের সমবেত উজ্জল, মধুর, সিদ্ধ ও সুবিমল কোমুদীর
নয়ন-মনোরঞ্জন শুভ্র দীপ্তিও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কলেবরস্থ লাবণ্য-
প্রভা—রূপ-প্রভার সহিত উপমিত হইতে পারে না। সেই নিখিল
সৌন্দর্যের সারভূত, তরুণ যৌবন তরঙ্গায়িত কমনীয় কোমল কলেবর
হইতে যেন, অপরিমিত রূপ-সিন্ধু উচ্ছসিত হইতেছে! —এবস্থি
কমনীয় কোমল ও অসাধারণ লাবণ্যময় অলোকসামান্য-সুন্দর রূপ,
—“ন পৃথিব্যাং তিষ্ঠতি নাস্তরীক্ষে” পৃথিবীতে নাই, অন্তরীক্ষে
দেবতাতেও বিद्यমান নাই। তাঁহার বিশ্ব-বিমোহন রূপ দর্শনে পৌরা-
ণিক মূর্তি সকল একের পর একটি করিয়া, উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল।
কখন মনে হইতেছে, পুরাণ-ইতিহাস সকলে মুনি-ঋষি যোগী-তপস্বীর
ভগবৎ সাক্ষাৎকারের এমন শত শত কাহিনী বহুদিন হইতে পরিজ্ঞাত
হইয়া আসিতেছি। ক্ষুদ্র জীবনে, বিস্মৃতি-বিহ্বল-প্রাণে, তাহার
রশ্মিমাাত্র অবশিষ্ট আছে। জানি না,—সেই রশ্মি পূর্বস্মৃতি কি না।
আবার কখনও বা মনে হইতেছে, ইহা ত আমার মস্তিষ্ক নহে!
এই কি, সেই—“জগদাদিগুরুঃ ব্রজরাজমুতঃ” বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ!
আহা, কি সুন্দর—কি মনোহর রূপ! আহা, মরি মরি! কি রূপ-
মাধুরী—কি অপূর্ব মুরতি! চিত্ত! এবারে আবেগভরে ভক্তিরসে
সিক্ত হইয়া অনুতাপের অশ্রুধারায় প্রভুর “ধ্বজবজ্রকুশাঙ্কিতপাদযুগং”
অভিষিক্ত করিয়া, অনুরাগের শুভ্র বস্ত্রে প্রভুর পদযুগল মুছিয়া, চির-
অগ্নান প্রেম-পুষ্পে গুঞ্জা করি। ইহা ভিন্ন আমার আর কি আছে?
জগতে এমন উপাদেয় কি বস্তু আছে যে, যাহা দিয়া তাঁহার পূজা
করিব? পার্থিব জগতের পার্থিব বস্তু সকলই ত তাঁহার সৃষ্ট;

সৃষ্ট পদার্থ স্রষ্টাকে অর্পণ করিলে, স্রষ্টার মনস্তৃষ্টি হইতে পারে কি ?
বিশেষতঃ,—

বাসো যশ্র সমস্ত জীবননিধৌ রত্নাকরে ভূষণং,
যশ্রাস্তে হৃদি কৌস্তুভং সুবিমলং যশ্রাস্তি লক্ষ্মীর্বশে ॥
বাণী যশ্র মুখারবিন্দবসিতা নন্দ সদা নন্দতে,
তস্মৈ ত্রীহরয়ে কিমন্যদধিকং যন্তং প্রযোজ্যামহে ॥

পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, মর-অমর, ঈশ্বর-কিন্নর,
দানব-মানব সর্বপ্রাণীর হৃদয়-কন্দর এবং অনল-অনিল-সলিল,—
পাদপ-প্রান্তর-প্রস্তর,—অনন্ত-আকাশ-অবনীমণ্ডল — জল-হল-মরুদ্রোম
বিশ্ব-চরাচরের অভ্যন্তর যাঁহার আবাস স্থান অকৃত্রিম মন্দির-স্বরূপ ;
অনন্ত রত্নপূর্ণ রত্নাকর যাঁহার ভূষণ ; যাঁহার সুবিশাল বক্ষঃস্থলে
সুবিমল জ্যোতিষ্মান কৌস্তুভমণি বিরাজমান ; ত্রিলোকেশ্বরী
ত্রিলোক-পালয়িত্রী লক্ষ্মীদেবী যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী বাগীশ্বরী
বাগ্বাদিনী বাণী যাঁহার মুখারবিন্দু বসিতা ; আর, সনকাদি ঋষিগণ
যাঁহার স্তব-গানে নিরত হইয়া, নিরন্তর নৃত্য করিতেছেন ; অতএব,
ইহাপেক্ষা আমার আর কি এমন উপাদেয় বস্তু আছে যে, তাহা দিয়া
তাঁহার পূজা করিতে সমর্থ হইব ? অতএব,—

“পুষ্পাণি সন্ত তব দেব মমেন্দ্রিয়াণি,
ধূপোহগুরুর্ব্বপুর্দিদং হৃদয় প্রদীপঃ ।
প্রাণা হবীংষি করণাণি তথাক্ষতাশ্চ,
পূজাফলং ব্রজতু সাম্প্রতমেব জীবঃ ॥

হে দেব ! আমার ইন্দ্রিয়রাজি তোমার পূজার পুষ্প হউক,
আমার বিনশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ তোমার পূজার উপকরণ, অগুরু-
চন্দন ও সুবাসিত ধূপ হউক, আমার হৃদয় পূজার প্রদীপ হউক, আমার
প্রাণ, তোমার পূজার হোমে ঘৃত হউক ; আর, আমার পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়

তোমার পূজার অক্ষত হউক,—এইরূপে তোমাতে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া, আমার এই পাঞ্চভৌতিক শরীরস্থ জীবাত্মা তোমার পূজাফল মোক্ষলাভ করুক। সুতরাং—

ওদ্বার্তা প্রিয়তো ব্রবীমি যদহং সান্তু স্তুতি তে প্রভো,
যদ্ভুঞ্জে তব তন্নিবেদনমথো যদ্ যামি সা প্রেযাতা ।
যচ্ছ্রান্তঃ স্বপিমি হৃদজ্জি যুগলে দণ্ডপ্রণামোহন্ত নঃ,
স্বামিন্ যচ্চ করোমি তেন স ভবান্ বিশ্বেশ্বর প্রীয়তাম্ ॥

হে প্রভো ! প্রিয়জ্ঞানে আমি যে তোমার বৃত্তান্ত বলি, তাহা তোমার স্তুতি হউক, যে চতুর্বিধান্ন ভোজন করি, তাহা তোমার নৈবেদ্য হউক, আমার গতি তোমার প্রেযাতা হউক ; আর, আমি যে শাস্ত্র-ভাবে নিদ্রা যাই, তাহা তোমার অঙ্ঘ্রিযুগলে দণ্ডবৎ প্রণাম হউক । হে স্বামিন্ ! আমি যাহা করি, তাহাতে তুমি সেই বিশ্বেশ্বর—বিশ্বরূপ—বিরাট-পুরুষ জীবিস্থ প্রীত হও । অতএব,—

লজ্জে হং মজ্জ সিন্ধৌ গিরিবরশিখরে হং চ তিষ্ঠ প্রতিষ্ঠে,
শান্তে প্রান্তে দিশান্তে কুরু বসতিমহো গর্ব খর্বো ভবাণ্ড ।
তেজঃ পাতালমূলং ভজ ভুবি ভগবন্ মান মা নাম স্তেহস্ত ,
প্রোমৈ কামাশ্রয়ন্তীং সততমহিমমাং পূর্ণমাশাং শ্রিয়িষ্যে ॥

হে লজ্জে ! তুমি অধুনা গঙ্গা-সলিলে নিমগ্ন হও ;—হে প্রতিষ্ঠে ! তুমি গিরিবর হিমালয়ের উত্তুল্ল খবল শৃঙ্গে অবস্থান কর ; হে শান্তে ! তুমি আমার পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ—ঈশান-অগ্নি নৈঋত-বায়ু দিক্ ও দিগন্তরাল সকলে এবং উদ্ধ ও অধস্তলে বাস কর ; অহো, গর্ব ! তুমি শীঘ্রই খর্ব হও ; হে তেজঃ ! তুমি পাতাল-মূলে রসাতলে গমন কর ; হে মান ! তোমার ন লোপ হইয়া, তোমার

নাম 'মা' হউক অর্থাৎ তুমি আর আমার নিকট আসিও না,
—আমি এক্ষণে তোমাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র
প্রেমকে আশ্রয়পূর্বক শীঘ্রই সংসারের অন্তরালে বসিব, এই আশা
হৃদয়ে বলবতী হইতেছে ! অতএব,—

বুদ্ধে সদ্ধুদ্ধিরেবং ভবতু তব সখে মানস স্বস্তি তেহস্ত,

আস্তাং পাদৌ পদস্থে সততমিহযুগং সাধুদৃষ্টী চ দৃষ্টী ।

বাণী প্রাণা প্রিয়েধি প্রকটতত্ত্বগবপু প্রাপ্নুহি প্রাণপুষ্টিং,

যস্মাৎ সর্বৈর্ ভবন্তিঃ সুখমতুলমহং প্রাপ্নুং তীর্থ পুণ্যম্ ॥

হে বুদ্ধে ! তুমি সদ্ধুদ্ধি হও, মানস ! তোমার স্বস্তি হউক ;
পদদ্বয় ! তুমি সদা পদস্থ হও ; দৃষ্টিযুগল ! তোমাদের সাধু দৃষ্টি হউক ;
বাণী ! তুমি প্রাণপ্রিয়া হও ! আর, হে গুণযুক্ত বপু ! তুমি প্রাণপুষ্টি
প্রাপ্ত হও ; যে হেতু, তোমাদের সকলের নিকট হইতে আমি অতল
স্বখের পুণ্যতীর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি ।

স্বস্তি ভবতু বিশ্রোভ্যঃ স্বস্তি রাজোহস্ত নিত্যশঃ ।

গোভ্যঃ স্বস্তি প্রজাভ্যস্ত জগতঃ শান্তিরস্ত বৈ ॥

স্বস্ত্যস্ত দ্বিপদে নিত্যং শান্তিরস্ত চতুষ্পদে ।

শং প্রভাভ্যস্তথৈবাস্ত শং তথাত্মনি চাস্ত নঃ ॥

শান্তিরস্ত চ দেবস্য ভূর্ভুবঃ স্বঃ শিবং তথা ।

শান্তিরস্ত শিবঞ্চাস্ত সর্বতঃ স্বস্তিরস্ত নঃ ।

ব্রাহ্মণদিগের মঙ্গল হউক, সর্বদা রাজার শুভ হউক, স্বজাতির
মঙ্গল হউক, প্রজাবর্গের মঙ্গল হউক, জগতের শান্তি হউক, দ্বিপদ
অর্থাৎ মনুষ্যের মঙ্গল হউক, চতুষ্পদ জন্তু নিত্য শান্তিলাভ করুক,
প্রজাবর্গের এবং আমাদের কুশল হউক । দেবতার শান্তি, ভুলোঁক,

৪র্থ খণ্ড

গুরো: কৃপা

২৬১

ভুবলোক এবং স্বর্গলোকের শুভ হউক। সর্বত্রই শান্তি ও মঙ্গল
বিরাজমান থাকুক, চতুর্দিকেই মঙ্গল হইয়া উঠুক।

অস্মিন্ স্বরব্যাঞ্জন বিন্দুরেফঃ,

মাত্রাবিহীনং লিখিতং ময়া যং।

তৎসর্বমার্থ্যঃ পরিশোধনীয়ং,

প্রায়েণ মুহুন্তি হি যে লিখন্তি।



গঙ্গোত্তরী নিবাসী

শ্রী ১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ দণ্ডিশ্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ
প্রণীত গ্রন্থমালা ।

১। স্নগম সাধন-পন্থা—১ম খণ্ড মূল্য ৩।

২। ঐ —২য় খণ্ড মূল্য ১।০

৩। ঐ —৩য় খণ্ড মূল্য ৩।

৪। পূর্ণব্রহ্ম রাম ও রামনাম-মহিমা—১ম খণ্ড মূল্য ১।০ এই পুস্তকের প্রা.
বনায় শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
মহারাজ লিখিয়াছেন,—“সেই হিমালয় গঙ্গোত্তরী নিবাসী মহাপুরুষ তাদি
জীবকুলের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া স্নগম সাধন-পন্থা, বেদান্ত-সিদ্ধান্ত সূত্রম্, ভগবত
শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা হা
না। তাঁহার সাধন যেমন অলৌকিক শাস্ত্রজ্ঞানও তদ্রূপ অসাধারণ, গঙ্গাস্রোতে
মত ভাষার প্রবাহ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ...এই গ্রন্থ পাঠ করিতে
নাস্তিক আস্তিক হইবেন, আস্তিক ব্যক্তিও দৃঢ় শ্রদ্ধা লাভ করত জীবনকে ভজন
করিয়া ফেলিবেন। এ অপূর্ব গ্রন্থরত্ন যে জগদ্বাসীর অশেষ কল্যাণ সাধ
করিবে ইহা আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি।” ঐ ২য় খণ্ড—১।০, তৃতীয় খণ্ড—১।০

৫। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—মূল্য ১।০ ৬। স্বধর্ম—মূল্য ১।০

৭। পরলোক বা জন্মান্তর—মূল্য ১।০ ৮। চৌরাষ্টিকম্—মূল্য ১।০

৯। বেদসার বিষ্ণুসূত্রম্—মূল্য ১।০ ১০। গুরুশ্রোত্রাষ্টিকম্—মূল্য ১।০

১১। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত সূত্রম্—মূল্য ১।০ ১২। তপস্তা—১।০

১৩। ভগবতুষ্টি-লাভে উপায় ও উপাসনা—১।০ ১৪। সংসার ধর্ম—১।০

১৫। মহারাজের জীবনী—যন্ত্রস্থ।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রী শ্রীপতি চরণ দাস পাহাড়ীপুর, মেদিনীপুর।

২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্রীমাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

— :: :: —

